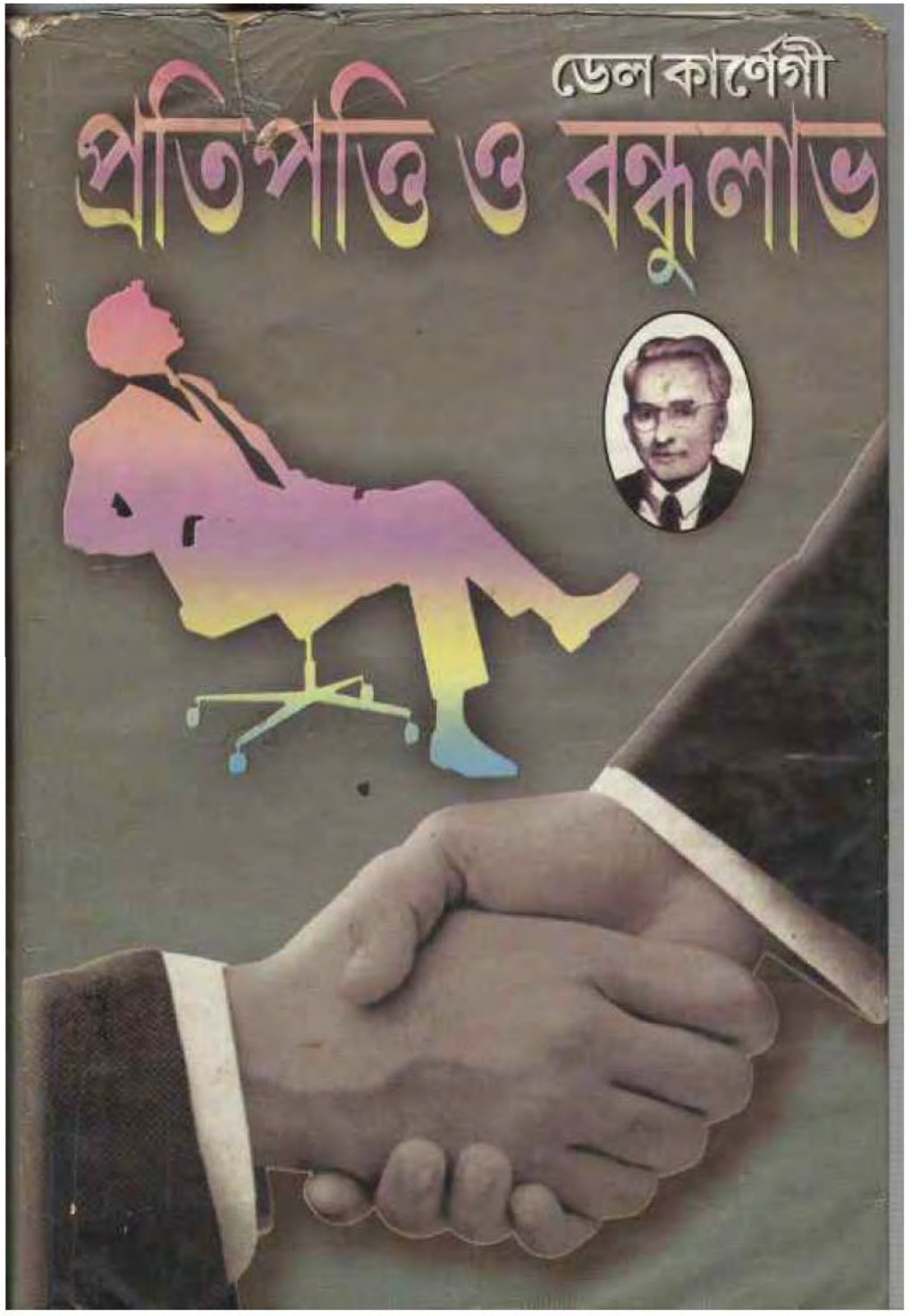

ডেল কার্নেগী

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

পৃথ্বীরাজ সেন

P.O. Kankuria
Dt. Murshidabad
ESTD-1961

কামিনী প্রকাশালয় : ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কল-৯

Pratipatti O Bandhulabh
Written by Del Karnegi
Translated & Edited By Prithviraj Sen
Price : Rupees Sixty only

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ ঃ
কলকাতা বইমেলা ২০০৫

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ঃ
হিন্দুস্থান আর্ট
এনঃ কোঃ প্রাঃ লিঃ
২৪, ডাঃ কার্তিক বোস
ষ্ট্রীট, কলি - ৯

মূল্য ঃ ষাট টাকা

3530/82

ভূমিকা

পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীতে মানুষ কি চায়?

এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর হয়তো আমরা দিতে পারবো না। আসলে একজন মানুষের চাহিদার সাথে অন্য একজন মানুষের চাহিদার মিল কোন ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। কেউ হয়তো অপরিমাপ্য অর্থ চায়। কেউ যশ চায়। কেউ সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করতে চায়।

তবে একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হবেন। তাহলো, কিভাবে আমরা প্রতিপত্তি অর্জন করবো, এটা আজ সকলের চিন্তা-ভাবনার বিষয়। প্রতিপত্তি বলতে কি বোঝায়? প্রতিপত্তি বলতে বোঝায় সামাজিক স্বীকৃতি। যে স্বীকৃতি আপনাকে সকলের থেকে আলাদা করে দেবে। আপনি অন্যকে প্রভাবিত করার মতো অবস্থানে পৌছতে পারবেন।

এই প্রতিপত্তি কিভাবে অর্জন করতে হবে? একি আমাদের জন্মগত অধিকার নাকি আমরা আমাদের আচরণের দ্বারা একে আত্মস্থ করি?

যুগে যুগান্তরে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এগিয়ে এসেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, প্রতিপত্তি বিস্তার করার একটি কৌশল আছে। আমরা যদি সুদীর্ঘ দিন ধরে সেই কৌশলটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাহলে একদিন যথেষ্ট প্রভাবশালী মানুষ হয়ে উঠতে পারবো।

ডেল কার্নেগী এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত বইতে বলেছেন—প্রতিপত্তিকে মুঠোবন্দী করতে হলে দীর্ঘ দিনের কৃৎকুশলতার প্রয়োজন। আজ বললেই কাল এই ব্যাপারটি আমাদের মধ্যে চরম রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।

এবার বন্ধুলাভের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই পৃথিবীর চলার পথে অনেক সময় আমরা বন্ধুত্বের কাঙাল হয়ে উঠি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব।

সে কখনও একা বাঁচতে পারে না। তাকে সঠিক বন্ধু চয়ন করতেই হবে। কিন্তু কাজটি খুব একটা সহজ নয়।

এই প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগী তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে—তিনি বলেছেন—বন্ধুত্ব ভোরের বাতাসের মতো পবিত্র। আবার খারাপ বন্ধুত্বে মানুষের মুখে বিষ ঢেলে দেয়। অতএব হে পাঠক-পাঠিকা বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেবেন। হঠাৎ কাউকে বন্ধুর আসনে আসীন করবেন না। মনে রাখবেন, ভাল বন্ধু আপনার যত উপকার করতে পারে, খারাপ বন্ধু তার থেকে দশ গুণ বেশি অপকার করতে পারে।

গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার ডেল কার্নেগীর সুচিন্তিত মতামত সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হল 'প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ'। পৃথিবীর নানা দেশের ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে। প্রতিদিন এর চাহিদা বেড়েই চলেছে। বদলে যাওয়া সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এই বইটি নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যতা দেখা দিয়েছে। এই বইটির বঙ্গানুবাদ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হল—শারদ উপহার হিসেবে। আশা করি বইটি পড়তে আপনাদের ভালই লাগবে। এর থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আপনারা জীবনকে আরও সুন্দর এবং সুচারুভাবে গড়ে তুলতে পারবেন।

বিজ্ঞাপন জগতের উদীয়মান তারকা-বিশিষ্ট পরিচিত গৌতম দে-কে এই বইটি উৎসর্গ করা হল।

পৃথ্বীরাজ সেন

সূচীপত্র

কেমন করে এই বইটি আমি লিখেছিলাম? ... ১১
জনসংযোগের প্রাথমিক কৌশল ... ২৪
কখনো অন্যের সমালোচনা করবেন না ... ২৪
জনগণের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে ... ৩৮
অন্যকে চলার পথে সাথী করতে হবে—তা না হলে
এ জীবনে আপনাকে একলা পথ চলতে হবে ... ৪৯
একাজ করলে সবাই আপনাকে ভালবাসবে ... ৬৪
ভালো লাগানোর সহজ পথের সন্ধানে ... ৭৩
ঝামেলা এড়ানোর সহজ পথ ... ৭৯
কীভাবে ভালো বক্তা হবেন? ... ৮৫
কীভাবে অন্যদের উৎসাহী করা যেতে পারে ... ৯৩
কী করে চট করে ভালো লাগানো যায় ... ৯৫
কখনোই আপনি তর্কে জিততে পারবেন না ... ১০৬
কীভাবে আমরা শত্রুতাকে এড়িয়ে যাবো ... ১১১
যদি কখনো ভুল করে থাকেন তাহলে অকপটে
তা স্বীকার করবেন ... ১১৯
শুভবুদ্ধির পথ ধরে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাবো? ... ১২৪
সক্রেটিসের রহস্য ... ১৩২
অভিযোগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন ... ১৩৬
কীভাবে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে ... ১৪১
এমন কিছু নিয়ম আছে যা আপনাকে অবাক করে দেবে ... ১৪৬
সবাই যা করতে চায় ... ১৪৯
সকলের পছন্দসই আবেদন করার নিয়ম ... ১৫৪
চলচ্চিত্রে যা হয়ে থাকে, রেডিওতে যা শোনানো
হয়ে থাকে—আপনি তা করবেন না কেন। ... ১৫৮
যখন অন্য কিছুতে কাজ হবে না, তখন একবার
শেষ চেষ্টা করাই যাক ... ১৫৯
যদি কখনো অন্যের দোষ ধরতে চান তাহলে
এইভাবে শুরু করতে হবে ... ১৬২

ঘৃণার সৃষ্টি না করে কীভাবে সমালোচনা করা যায় ... ১৬৫
আগে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করুন ... ১৬৬
কেউ হুকুম পছন্দ করে না ... ১৬৮
অপরকে মুখরক্ষা করতে দিতে হবে ... ১৬৯
মানুষ কীভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে ... ১৭১
আবার প্রশংসা করুন ... ১৭৩
ভুল সংশোধনের পন্থা সহজ করুন ... ১৭৫
আনন্দে যা চান অন্যকে দিয়ে তাই কীভাবে করাবেন ... ১৭৭
চিঠির রহস্য ... ১৭৯
দাম্পত্য জীবনে সুখ অন্বেষণের সাতটি পথ ... ১৮২
নিজে ভালোবাসুন এবং অপরকে ভালোবাসতে শেখান ... ১৮৫
কখনো অকারণে কাউকে সমালোচনা করবেন না ... ১৮৭
কীভাবে সকলকে সুখী করবেন? ... ১৮৮
মেয়েরা কী কী ভালোবাসে? ... ১৮৯
সুখী হতে গেলে এটাকে কখনো অবহেলা করবেন না ... ১৯০

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ

3535/86

এক

কেমন করে এই বইটি আমি লিখেছিলাম?

আমেরিকার প্রকাশন জগৎ এখন হাজার আলোর রোশনাইতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

শুনলে হয়তো আপনারা অবাক হবেন, গত পঁয়ত্রিশ বছরে প্রায় দু'লাখের ওপর বই বেরিয়েছে।

সংখ্যাটা হয়তো অবিশ্বাস্য। কিন্তু, এটা একেবারে সত্যি।

তবে আর একটা দুঃখজনক তথ্য আপনাদের সামনে পেশ করছি।

তা হলো, এর মধ্যে বেশির ভাগই হলো অপাঠ্য বই। বেশির ভাগ প্রকাশনা অর্থকরী দিক থেকে সফলতার মুখ দেখতে পায় নি।

এতো কথা কেন বললাম বলুন তো?

নামজাদা এক প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি আমাকে কথায় কথায় অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধরে তাঁর প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশন জগতের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আটটির মধ্যে সাতটি বইতেই লোকসান দিতে হয়েছে। একটি বইতে যা লাভ হয়েছে, তাতেই কোনো রকমে কষ্টে সৃষ্টে চলে গেছে।

তাহলে? আপনারা বলছেন, জেনেশুনে আপনি এতো বোকামি কেন করছেন? কেন আবার আর একটি বই লিখছেন? লোকসানের বহরটা আর একটু বেশি করার জন্যে কি?

আরো একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আপনাদের মনকে নাড়া দেবে।

তাহলে, আমরা কেন একাই পড়বো?

তাহলে আমাদের আবার সেই প্রাথমিক স্তরে ফিরে আসতে হবে।

একজন পাঠক বা পাঠিকা কেন বই পড়ে?

সে বই পড়ে প্রধানত তিনটি কারণে—(১) পাঠ্যবই—এগুলো অনেকটা কুইনাইন খাবার মতো। মুখ ব্যাজার করেও গিলে ফেলতে হয়।

(২) বিনোদন সাহিত্য—সারাদিনের খাটা-খাটনির পর যখন মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে, যখন স্নায়ুপুঞ্জ আর কাজ করতে চায় না, মনটাকে আবার উদ্দীপক করে তুলতে হয়। তখন এই জাতীয় বই পড়া উচিৎ।

এটা হয়তো মনোবিজ্ঞানীদের কথা।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীতে আছে কাজে লাগবে এমন কিছু জানা-অজানার বই। যে বই পড়লে আমরা আমাদের জীবনের এখানে সেখানে জমে ওঠা নানা সমস্যার সমাধান করতে পারি। মন আকাশে যদি কালো মেঘের ঘন ঘটা দেখা দেয়, তাহলে, সেই মেঘরাশিকে দূরে পাঠিয়ে দিতে পারি। আবার সব জায়গায় সূর্যের আলো পড়তে পারে, তার ব্যবস্থা করতে পারি।

হে পাঠক-পাঠিকারা, আমার এই বইটি ঐ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

যদি এই বইটি পড়ে একজনেরও মনের মধ্যে অন্য কিছুর সঞ্চার হয়, তাহলে লেখক হিসাবে নিজেকে আমি দারুণ সৌভাগ্যবান বলে মনে করবো।

গোড়ার কথা এখানেই শেষ হওয়া উচিত। এবার আমি আস্তে আস্তে মূল বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছি।

বই লেখার উদ্যম শুরু হয়েছিল ১৯১২ সালে।

তখন আমি কি করতাম বলুন তো? তখন আমি শিক্ষাদানের কাজ করতাম।

তবে, পাঠশালে ছাত্র ঠ্যাঙানো নয়। স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা করানো নয়।

আমি পড়াতাম ব্যবসায়ীদের। আর পড়াতাম, জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত সেই সব বিশিষ্ট মানুষদের। তাদের কী শেখাতাম?

তাদের শেখাতাম জনসংযোগের নানা কৌশল। আমি দেখতাম প্রথম দিকে তারা মন দিতে পারতো না। দেবেই বা কেমন করে? তারা এতো ব্যস্ত, নেহাত কারো চাপে পড়ে এই ক্লাসে যোগ দিয়েছে। মনটা পড়ে আছে পেশার মধ্যে।

আমি ভাবতে শুরু করলাম—কীভাবে এই প্রতিকূল অবস্থাকে টপকানো যেতে পারে।

আমি ভাবতাম, আমার শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে আরো বেশি আকর্ষক করে তুলতে হবে। আরো বেশি কৌতূহলের মালমশলা জোটাতে হবে। যাতে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারা শুনবে। বাড়ি গিয়ে ভাববে, কবে আবার আমার ক্লাসে আসবে তার জন্যে ছটফট করবে।

প্রথম প্রথম এই কাজে আমি সফল হতে পারিনি। আসলে আমাকে অনেকগুলো অনুশীলন করতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে তো কোনো হিসেব নেই। যেটা ধরে আমরা এগিয়ে চলবো।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সেখানে আমিই ছিলাম পথপ্রদর্শক। এর অনুকূলে সুবিধা আছে, পাশাপাশি বেশ কিছু অসুবিধা আছে।

সুবিধা হলো, তুমি যাই বলবে, কাল সেটাই বেদবাক্য হয়ে যাবে।

অসুবিধা হলো, তোমার নির্দিষ্ট কোনো চলার পথ নেই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তুমি যদি হাঁটতে থাকো, কাঁটায় রক্ত ঝরবে, কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে একটা পথ তৈরি হবে।

এভাবে আমি আমার আসল কাজটা করতে পেরেছিলাম।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মানুষকে আকর্ষণ করতে গেলে প্রথমেই সুন্দর সুন্দর কথা বলতে হবে। কথার মাধ্যমে লোককে বশ করতে হবে। তাই আমি প্রথমেই আমার ছাত্রছাত্রীদের শেখাতাম, কীভাবে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে।

আমি তাদের বলেছিলাম, জনসংযোগই একজন মানুষের সাফল্যের প্রথম সোপান। যে যত ভালোভাবে লোকজনের সাথে কথা বলতে পারে, লোকজনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, জীবনে তত তাড়াতাড়ি সে তরতরিয়ে উন্নতির সোপানে পৌঁছে যাবে।

দেখলাম, আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আস্তে আস্তে এই কথার আসল মানে বুঝতে পারছে।

যখন আমি পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করি, তখন ভাবি, যদি আমি আরো বেশি অনুশীলন নিতে পারতাম, তাহলে বোধহয় জীবনে সফলতা আরো তাড়াতাড়ি আসতো।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা যাক। আমার হাতে তেমন কোনো বই ছিল না যা পড়ে আমি উজ্জীবিত হতে পারি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, পাঠক-পাঠিকাও এমন একটি বইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। যদি সত্যি সত্যি এমন একটি বই লিখে তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, যে বইটি পাঠ করলে তারা নিজেদের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বুঝতে পারবে, কীভাবে সেইসব ত্রুটিগুলি কাটানো যেতে পারে, সে সব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাহলে সেই বইটি তাদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে বাস্তব ত্রুটিগুলিকে কীভাবে ত্রুটিমুক্ত করা যায় সে কথা চিন্তা করতে করতেই এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমি নিজেকে তৈরি করেছিলাম।

তাহলে, নান্দিমুখ শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা বিষয়ের ভেতর ঢুকে পড়ছি।

প্রথমেই একটা কথা বলা যাক, যদি আপনি একজন ব্যবসাদার হন, তাহলে জনসংযোগ হবে আপনার কাছে সবথেকে বড়ো সমস্যা।

আপনি যে কোনো ব্যবসাদারকে গিয়ে প্রশ্ন করুন। তিনি যদি এই কাজে সফলতা অর্জন করে থাকেন, যদি তাঁর দোকানে মৌমাছির মতো গুণ গুণ করতে থাকে খদ্দেররা, তাহলে আপনি সুনিশ্চিত জানবেন ঐ ভদ্রলোক জনসংযোগকে সবথেকে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধিমান, চালাক এবং বাস্তববোধ আছে তাঁর মনের মধ্যে।

তিনি জানেন, কীভাবে কথার মাধ্যমে লোককে আকৃষ্ট করতে হয়। কীভাবে এমন আচরণ করতে হয় যাতে সকলে ভাববেন, উনি আমার কত আপনজন।

এভাবেই ব্যবসাদাররা অভাবনীয় উন্নতি করেন।

যে কথাটা একজন ব্যবসাদারের ক্ষেত্রে একশো ভাগ সত্যি, সেটাই যদি আমরা একটু পাল্টে কোনো স্থপতি অথবা প্রযুক্তিবিদের ওপর প্রয়োগ করি, তাহলে একই উত্তর পাবো।

একজন গৃহকর্ত্রীর বেলাতেও এটি সব থেকে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

আসুন, আমরা এই সংক্রান্ত কয়েকটি গবেষণার কথা বলি। কয়েক বছর আগে কার্নেগী ফাউন্ডেশনের আনুকূল্যে একটি অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, কোন কোন কারণে শিক্ষকেরা কাঙ্খিত উন্নতি করতে পারছেন না।

তাতে কতগুলি সরল সত্য প্রকাশিত হয়েছিল। এই সত্যগুলি সম্পর্কে আমরা সবাই অবহিত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

তাহলো, শিক্ষকেরা জনসংযোগের ব্যাপারে আদিম স্তরে রয়ে গেছেন। তাঁদের কিছুতেই বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না, পরিবর্তিত পৃথিবীতে জনসংযোগ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ শৈলী। ধীরে সুস্থে এই প্রয়োগ কুশলতাকে রপ্ত করতে হয়। তা না হলে শিক্ষক হিসাবে আপনি যতই গুরু গম্ভীর হোন না কেন, আপনার মাথায় যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন, ছাত্রদের কাছে আপনি কখনোই গ্রহণযোগ্য হবেন না।

পরবর্তীকালে কার্নেগী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে আর একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা চালানো হয়েছিল। এই গবেষণাতে আর একটা আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল।

যে সমস্ত প্রযুক্তিবিদরা কারিগরী বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন, তাঁরা সরল সত্য স্বীকারোক্তি রেখেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—একজন মানুষের অর্থকরী সাফল্যের পনেরো ভাগ নির্ভর করে তাঁর কারিগরী জ্ঞানের ওপর। অর্থাৎ তাঁর অধীত বিদ্যার ওপর। আর পঁচাশি ভাগ নির্ভর করে মানবিক জ্ঞানের ওপর। এই মানবিক জ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

ছোট্ট করে বলতে গেলে বলা যায়, মানবিক জ্ঞান বলতে বোঝায় চারপাশের মানুষজনের সাথে সে কীভাবে মিশবে এবং কীভাবে কথার মাধ্যমে তাদের প্রভাবিত করবে।

তাহলেই বুঝতে পারছেন, জীবনে যে সব ইঞ্জিনীয়াররা সফল হয়েছেন, তারাও পঁচাশি ভাগ কৃতিত্ব দিচ্ছেন কথা বলার প্রবণতাকে। অর্থাৎ সারাজীবন ধরে বইয়ের পাতায় মুখ করে তাঁরা যে ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং তার থেকে যে কুশলতা পেয়েছেন, সেটিকে মাত্র পনেরো ভাগ দেওয়া হয়েছে।

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি, কথা বলার ধরনকে কেন আরো বিজ্ঞানসম্মত এবং অর্থকরী করে গড়ে তোলা উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যাক।

তখন আমি ফিলাডেলফিয়ার ইঞ্জিনীয়ারস ক্লাবে শিক্ষকতা করি। এরই পাশাপাশি নিউইয়র্কে আমেরিকান ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদেরও শিক্ষাদান করে থাকি।

প্রায় পনেরো শো জন ইঞ্জিনীয়ার আমার এই শিক্ষাক্রমে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তাঁরা ভেবেছিলেন, এই ডিগ্রি করে কী লাভ? কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি থাকলেই চলবে না—এর পাশাপাশি কথা বলার প্রবণতাকে আয়ত্ত করতে হবে।

এখানে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ইঞ্জিনীয়ারিং, হিসাবশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা অথবা অন্য কোনো পেশাতে সপ্তাহে অনায়াসে ৫০—৭৫ ডলার আয় করা যেতে পারে। বাজারে এই ধরনের মানুষ আমরা হাজার হাজার দেখতে পাবো। কিন্তু সেই লোকের সাথে আমাদের দেখা হবে কী—যে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাথে মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাকে এক করতে পেরেছে? যার মধ্যে নেতৃত্ব দেবার এক অলৌকিক শক্তির সমাবেশ ঘটে গেছে? যে নির্জীব মানুষকেও জাগিয়ে তুলতে পারে? যেখানে ছাই আছে, তা ঘেঁটে দেখতে পারো, অদৃশ্য অমূল্য রতন আছে কিনা।

আমার এইসব প্রশ্ন শুনে আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার কাটবেন এবং শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে বলবেন—না, আপনি যেমনটি চেয়েছেন, তেমন মানুষ এই পৃথিবীতে আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

জন ডি রকফেলারের কথা মনে আছে কি? যখন তিনি তাঁর কর্ম উদ্দীপনার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন তখন ম্যাথু সি ব্রাস নামে এক বিশিষ্ট প্রবন্ধকারকে বলেছিলেন—জনসংযোগের কাজে দক্ষতা চা বা কফি কেনার মতোই সহজ। কিন্তু আমি এই দক্ষতা কেনার জন্যে যে কোনো মূল্য খরচ করতে রাজী আছি।

রকফেলারের এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, জনসংযোগের দক্ষতাকে তিনি কীভাবে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আপনাদেরও মনে একই ধরনের প্রশ্ন থাকা উচিত। আপনারা হয়তো ভাববেন, এখন পরিবর্তিত পরিবেশে প্রতিটি কলেজের পাঠ্যক্রমে জনসংযোগকে অবশ্য পাঠ্য করা উচিত।

দেশের অন্তত একটি কলেজেও এই ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে ব্যবহারিক পেশায় যুক্ত লোকেরা সহজেই জনসংযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত, তেমন কোনো সঠিক উদ্যম আমার চোখে পড়েনি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

এবার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘটনার কথা বলি।

সেখানে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। ওয়াই এম সি-এর বিদ্যালয়গুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল।

এই সমীক্ষা চালাতে পঁচিশ হাজার ডলার খরচ করা হয়েছিল। সময় লেগেছিল প্রায় দু'বছর।

সমীক্ষার শেষ অংশটি চালানো হয় কানেকটিকটের মেরীল্যান্ড শহরে।

এই শহরটিকে কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল, এর একটি সহজ স্বাভাবিক উত্তর আছে।

এটি একটি বৈচিত্র্য সম্পন্ন আমেরিকান শহর।

মেরীল্যান্ডের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের ওপর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তাদের ১২৬টি প্রশ্নের জবাব দিতে অনুরোধ করা হয়।

প্রশ্নগুলো এইভাবে সাজানো হয়েছিল—

(১) আপনার পেশা কী?

(২) আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন?

(৩) অবসর সময় কীভাবে কাটান?

(৪) আপনি সপ্তাহে বা মাসে কত ডলার আয় করেন?

(৫) আপনার সখ কী?

(৬) আপনি কী স্বপ্ন দেখেন?

(৭) আপনার কী ধরনের সমস্যা?

(৮) আপনি কোন ধরনের বই পড়তে বেশি আগ্রহী?

(৯) আপনি কীভাবে বিনোদনের প্রহর কাটান?

(১০) ফেলে আসা দিনযাপনের কোন ঘটনা আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত বা উৎকণ্ঠিত করে?

(১১) আপনি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত—এই তিনটির মধ্যে কোনটির প্রতি সবথেকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন? ইত্যাদি।

এই সমীক্ষাতে একটা আশ্চর্য তথ্য আমাদের হাতে এসে পড়েছিল।

দেখা গেল, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান আগ্রহ হচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য। প্রত্যেকেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সামান্য কোনো অঘটন ঘটে গেলে তারা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটে যায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছোটে। সমুদ্রতীরে বেড়াতে যায়।

কিন্তু, দ্বিতীয় আগ্রহটি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ থাকার মধ্যে কোনো চমক নেই। প্রত্যেকেই তার স্বাস্থ্যকে নীরোগ রাখতে চাইবে। তা না হলে অর্থ উপার্জন করতে পারবে না।

দ্বিতীয় স্থানে ছিল মানুষ। অর্থাৎ চারপাশের মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ। কীভাবে এইসব মানুষকে আরো ভালোভাবে বোঝা যায় এবং জনসংযোগের মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করা যায় অধিকাংশ নাগরিক সেই বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

যে সমিতি ঐ সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, মেরীল্যান্ড শহরে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে একটি নৈশ পাঠ্যক্রম চালু করবেন।

তাঁরা অন্বেষণ করলেন। বিভিন্ন প্রকাশনার সাথে যুক্ত হলেন। কিন্তু কোথাও এই ধরনের বই খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর, তারা এক প্রথিতযশা বয়স্ক শিক্ষণ বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেন। তিনিও এই ধরনের উপযোগী কোনো বইয়ের সন্ধান দিতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কার ভাবে তাঁর অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বয়স্ক শিক্ষণের সাথে যুক্ত হয়ে আছি। আমি দেখেছি, এখন নানা দেশে এটি এক গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। কোনো মানুষই এখন আর নিরক্ষর হয়ে দিন কাটাতে রাজী নয়। তবে দুঃখের কথা, বয়স্কদের জন্যে যে ধরনের বই লেখা উচিত, সেই ধরনের লেখা এখনো চোখে পড়েনি আমার। এ ব্যাপারে আমি আমার অক্ষমতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি।

এটি হলো আমার এক অভিজ্ঞতা। আমিও দীর্ঘ দিন ধরে এই ব্যাপারে অন্বেষণ করেছিলাম। বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। তাঁরা তালিকা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে মাছ চাষ থেকে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে নানা বইয়ের নামা লেখা ছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, কীভাবে কথার জাল বুনে মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো বইয়ের হদিসই ছিল না।

অবশেষে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, যদি নিজেই আমি চেষ্টা করি তাহলে কেমন হয়। তাহলে হয়তো এমন একটি বই আমি লিখে ফেলতে পারবো।

আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসায় শেষ পর্যন্ত আমার এই স্বপ্ন সফল হয়েছে।

অনেকগুলি রাত্রি নিদ্রাবিহীন কাটাতে হয়েছে আমাকে। অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অসংখ্য মানুষের সাথে মিশতে হয়েছে। তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত আবেগ এবং বেদনা ভাগ করে নিতে হয়েছে।

অবশেষে, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আমি সত্যি সত্যি এমন একটি বিরল বইয়ের লেখক হিসাবে পরিচিতি অর্জন করেছি, যে বই আমাকে হয়তো আপনাদের কাছে নিয়ে যাবে। সর্বক্ষণ আপনাদের মনের মধ্যে আমি বাস করবো। লেখক হিসাবে এটাই আমার সবথেকে বড়ো প্রাপ্তি।

এই বই লিখতে গিয়ে আমি যে সমস্ত প্রতিবেদনের সাহায্য নিয়েছি, এখন সেগুলোর উল্লেখ করা উচিত।

প্রথমেই আমি ভরোথী ডিক্সের লেখার কথা বলবো। তিনি তাঁর অনুপম বর্ণনার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদকে চিহ্নিত করেছেন। কীভাবে এই ডিভোর্সের ঘটনাটি ঘটে যায় এবং এর ফলে নারী ও পুরুষের মনের জগতে কী কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়, সবই তাঁর লেখনীর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

এরই পাশাপাশি আমি গেরেন্টস ম্যাগাজিনের কথাও উল্লেখ করবো। এই পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যাতে এই সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যা আমার লেখার জগতকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

প্রফেসার ওভারস্ট্রীট, অ্যালফ্রেড অ্যাকলার এবং উইলিয়াম জেমস—এই তিনজন সমাজতত্ত্ববিদের লেখাও আমি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। তাঁরাও মানুষের জীবনকে সুপথে পরিচালিত করার নানা উপায় বাতলেছেন। সুতরাং এই বই লিখতে গিয়ে আমি তাঁদের লেখার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

এছাড়াও আমি একজন অভিজ্ঞ গবেষকের সাহায্য নিয়েছিলাম। সমস্ত পাঠাগারে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক প্রায় দেড় বছর ধরে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়েছেন। এই সমস্ত বইয়ের মধ্যে নানা পত্রিকা ছিল। ছিল অসংখ্য সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ। অনেক জীবনী গ্রন্থ তিনি পড়েছিলেন। তিনি এই খবর জানার চেষ্টা করেছিলেন যে যুগে যুগে মনীষীরা মানুষের সঙ্গে কী ভাবে মেলামেশা করতেন।

আমরা সব যুগের মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করি। জুলিয়াস সীজার থেকে শুরু করে টমাস এডিসন পর্যন্ত বিখ্যাত মানুষদের জীবনী আমরা পড়ি। আমার মনে পড়ছে, থিওডোর রুজভেল্টের প্রায় শ-খানেক জীবনী আমি পড়ে ফেলেছিলাম। এক-একজন লেখক এক-এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তাঁরা কেউই কিন্তু রুজভেল্টের জনসংযোগ ক্ষমতার অভিনবত্বের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করেননি। অবশ্য বিভিন্ন বই পড়তে পড়তে রুজভেল্ট সম্পর্কে আমার মনে একটা স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

অসংখ্য কৃতবিদ্য মানুষের জীবনী পাঠ করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁরা সকলেই চারপাশের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। আর এজন্যই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন। চরিত্রের এই দিকটিকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা জনসংযোগের ব্যাপারটা বুঝতে পারবো না।

শুধু বই পড়া নয়, এরই পাশাপাশি আমি অনেকের সাথেই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় মেতে উঠেছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে আমি মার্কনী ফ্রাঙ্কলিনড-রুজভেল্ট

ওয়েনডি ইয়ং, মেরি পিকফোর্ড, মার্টিন জনসন প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা এক-একজন নক্ষত্র বিশেষ। জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তাঁরা আজ এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছেন। কীভাবে তাঁরা প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করেছেন, কোন্ কোন্ চারিত্রিক গুণ তাঁদের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে, ইত্যাদি খবরও আমি খুব কৌতূহলের সাথে সংগ্রহ করেছিলাম। তারই পাশাপাশি আমি সকলকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম—তাঁরা কীভাবে চারপাশের মানুষজনের সাথে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং এই সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে তাঁদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি না।

অবশেষে আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার আমাকে বইয়ের আসল ভূমিকার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমি বেশ কয়েকদিন সমস্ত কর্মজগত থেকে মুক্তি নিয়েছিলাম। আমি মনের ভেতর একটির পর একটি শব্দ গাঁথার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ছোট্ট একটি পুস্তিকা তৈরি করলাম। আমি তাঁর নাম দিলাম প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ।

ছোট্ট বলার কারণ আছে। প্রথমে এটি ছোটোই ছিল। তবে বর্তমানে এটি বেড়ে উঠেও প্রায় দেড় ঘন্টার এক ভাষণে পরিণত হয়েছে। এবার আমার কাজ হলো নিউইয়র্কের কার্নেগী ইনস্টিটিউটে প্রাপ্ত বয়স্কদের সামনে বক্তৃতার মধ্যে এই পুস্তিকাটি উপস্থাপন করা। আমার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শ্রোতা বন্ধুকে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করা। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করলে যে কী তাৎক্ষণিক ফল হতে পারে, তা জানতে না পারলে, আমার বক্তৃতার আসল বিষয়টাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এই বক্তৃতা দিয়ে সকলকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করতাম। আমি বলতাম, তাঁরা যে পেশার সাথে যুক্ত আছেন, সেই পেশায় সকলের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

শুধু তাই নয়, তিনি ব্যবসাদার, তিনি যেন তাঁর সম্ভাব্য খদ্দেরদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে জীবন কাটান, যেমন, ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনীয়ার কিংবা লা-ইয়ার। তাঁরও উচিত, খদ্দেরদের সাথে ভালো যোগাযোগ রাখা।

আর, আমি আর একটি অনুরোধ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আমার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আপনি জীবনে কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারলেন, আমাকে সেই খবরটাও জানাবেন। আমাকে দেখতে হবে, সত্যি সত্যি আমার এ বক্তৃতা আপনাদের মনোজগতে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারলো কিনা।

অনেকেই ফিরে এসে তাঁদের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমি দেখতাম, তাঁরা জনসংযোগের নতুন একটি প্রশস্ত সরণীর পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এর পাশাপাশি আর একটি কথা বলা উচিত, তা হলো, এই পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রী আর পুরুষ আত্মোন্নতির জন্যে চেষ্টা করেন। তাঁরা নতুন কোনো গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটিকেও এইভাবে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে। এটি এখনো পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত একটি দিক। সুতরাং প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীরা এর প্রতি অনায়াসেই আকর্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তাতে আমার কৃতিত্ব যতখানি ছিল, তার থেকেও আরো বেশি ছিল তাদের মানবিক জগতের আন্দোলন। তাঁরা চাইতেন নতুন কোনো বিষয়ের সাথে নিজেদের আত্মীয়ভাবে জুড়ে দিতে।

দুই আর দুই মিলে যোগফল চারই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আমার ঐকান্তিক প্রয়াস এবং তাঁদের আন্তরিকতা—এর ফলে কী দেখা দিলো। দেখা দিল এক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যাকে বাইরে থেকে আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। অথচ, সেটি অন্তঃসলিলা ধারার মতো বহমান থাকে।

তাঁদের অনেকের মানসিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অনেকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অনেকে আমার কাছে এসে তাঁদের ধীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন এবং আমি দেখতাম, তাঁদের চোখের কোণ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। যে মানুষটিকে সকলে সভয়ে এড়িয়ে চলতেন, পল্লীতে যিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমার এই পদ্ধতি অনুসরণ করার পর দেখা গেল, সকলেই তাঁর সাথে সখ্যতার সম্পর্কে স্থাপন করতে চাইছেন। মানুষটির নৈঃশব্দের নিশিপ্রহর কেটে গেছে। এখন সেখানে শুধু শব্দের সীমাহীন উত্তরোল।

এই বই প্রসঙ্গে আর একটি সত্যি কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত।

অন্যান্য প্রবন্ধকারেরা যেভাবে প্রবন্ধের বই রচনা করে থাকেন এই বইটি কিন্তু ঠিক সেভাবে লেখা হয়নি। শিশু যেমন নিজের ইচ্ছাতে বেড়ে ওঠে, টালমাটাল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন সঠিক পথের ঠিকানা খুঁজে পায়, এই বইটিও ঠিক তেমনভাবে লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ একে একটি স্বতঃপ্রণোদিত উন্মাদনা বলা যেতে পারে। একটির পর একটি শব্দচয়ন করতে করতে এই বইটি তার বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণাগারে যদি কোনো শিশু লালিত পালিত হয় তাহলে তাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এই বইটির ক্ষেত্রে আমি তেমন কথা বলবো না। এটি যেন রাস্তার ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা এক চারাগাছ। সূর্য অকৃপণ আলো দিয়েছে। বৃষ্টি জীবনীশক্তি দিয়েছে। কেউ হয়তো দু'মুঠো সার দিয়েছে। এভাবেই সকলের সমবেত প্রয়াস ও উন্মাদনায় সেই ছোট্ট চারাগাছটি বিরাট মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। এই বইটি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

বেশ কয়েক বছর আগে পোস্টকার্ডের আকারে কয়েকটি কাগজে আমি কিছু নিয়ম ছাপিয়েছিলাম, পরের বছর আর একখানা কার্ড ছাপালাম। তারপর ভাবলাম, একটি পত্রিকা বের করলে কেমন হয়। পত্রিকার প্রকাশনাও শুরু হয়ে গেল। তখন থেকেই মনের মধ্যে আর একটি ভাবনার উত্তরোল। কয়েকটি ছোটো ছোটো পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে।

প্রতিটি পুস্তিকার মধ্যে কিছু বাক্য সন্নিবেশিত থাকবে। তবে তাদের উদ্দেশ্য হবে একই। মানুষকে কী করে সুপথে পরিচালিত করা যায়। আমি কোনো ধার্মিক উপদেশের কথা বলছি না। আমি বাস্তব মানুষ। বাস্তবতাবোধে উদ্দীপ্ত। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা জানি না, কিভাবে এই অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো, এবং আবার সুন্দর পবিত্র জীবনবোধের পথিক হতে পারবো।

প্রতিটি পুস্তিকাতে আমি সেই কথা বলার চেষ্টা করেছি। জীবন সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট একটি ধ্যান ধারণা আছে। সেই ধ্যান ধারণাতে যাতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, এটাই ছিল আমার প্রথম প্রয়াস।

যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন, আমি দেখেছি, এই নীতি কাজে লাগানোর ফলে অনেক পাঠক-পাঠিকার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

অনেক তত্ত্ব কথার কচকচানি শোনা হলো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনারা আলস্যের হাই তুলছেন। ভাবছেন লোকটা আবার কি বক্তৃতা দেবে।

আসুন, এবার একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক।

গত বছর একজন আমার এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। সেখানে ৩১৪ জন কর্মী কাজ করেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি কর্মীদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

ভদ্রলোক খিটখিটে স্বভাবের। কারোর ভালো দেখতে পারেন না। আমার সাথে আলাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় গড়ে তুললেন। তাঁর মুখ দিয়ে অদ্ভুত কিছু গালিগালাজ বেরিয়ে এলো। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সমস্ত কর্মীর সাথে তাঁর অত্যন্ত খারাপ সম্পর্ক।

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি কোনো কর্মীকেই কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন না। কেউ ভালো কাজ করলেও তার প্রশংসা করেন না।

এবার আমার আসল চিকিৎসা শুরু হলো। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, অর্থবান হলে কী হবে, উনি আসলে অসহায় এক মনোবিকলনের রোগী।

আমি একে একে আমার পুস্তিকাগুলি ওনাকে পড়তে দিলাম। আমার বইয়ের মধ্যে যেসব নীতি লেখা আছে, সেগুলি ওনার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন এনে দিলো। দেখলাম, ধীরে ধীরে ওনার বক্তব্যের মধ্যেও ঐ পরিবর্তনের ছাপ পড়েছে।

আমি রোজ কিছু সময় ওনার সাথে আলাদা করে কাটাতাম। আমারও একটা আত্মোপলব্ধির দরকার ছিল। এই যে আমি রাতের পর রাত জেগে খেটে খেটে এতোগুলো বই লিখেছি বাস্তবিক পক্ষে তারা সমাজের কোনো উপকার সাধন করতে পারছে কি? নাকি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগাড়ম্বরের মধ্যে দিয়েই কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে?

ক'দিন বাদেই আমি দেখতে পেলাম, উনি ৩১৬ জন কর্মীর মধ্যেই কিছু না কিছু গুণ খুঁজে পেয়েছেন।

আগে যে লম্বা ঢ্যাঙা করণিককে বাক্যবাগীশ বলে মনে হতো, এখন ওনার মনে হলো, মাইকেল তো সারাদিন মন দিয়ে কাজ করে। তবে হ্যাঁ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে অলীক কিছু কথাবার্তা বলে। এটা তো আমরা সকলেই বলে থাকি। তার জন্যে ওকে দোষ দেওয়া যায় কি?

তার মানে কী হলো? ওনার জীবনের দর্শন একেবারে পাল্টে গেল। ওনার প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে সুন্দর, সুগঠিত হয়ে উঠলো। নতুন উদ্দীপনা দেখা দিলো কর্মের মধ্যে। কর্মচারীরা সকলে নতুন প্রেরণার আদর্শে নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করলেন। নতুন নিষ্ঠার চারাগাছ পুঁতলেন। সকলের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার আদর্শ গড়ে উঠলো।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ৩১৬ জনই ছিলেন তাঁর পরমতম শত্রু। নেহাৎ মাসের সাত তারিখে তিনি প্রত্যেককে মাইনে দেন। সেই মাইনের টাকায় ওদের সংসার প্রতিপালিত হয়। তাই কেউ সামনে বিক্ষোভ দেখাতে পারেন না। কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁর ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। এখন দেখা গেল, পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্টে গেছে। আকাশের কোণে কোথাও কালো মেঘের ঘনঘটা নেই। সর্বত্র সূর্যের আলোর ঝিলিক চোখে পড়ছে।

তিনি একবার আমাকে বললেন—আমার প্রতিষ্ঠানে আগে আমি যখন পায়ে হেঁটে ঢুকতাম, কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতো না। বরং আমাকে দেখে কর্মচারীরা মুখ ঘুরিয়ে নিতো। ব্যাপারটাকে তখন আমি মোটেই আমল দিইনি। তখন আমি আত্মদাম্ভিকতার এক লাজানো পাহাড় চূড়ায় একা একা বাস করতাম। এখন ব্যাপারটা একেবারে পাল্টে গেছে। এখন আমি যখন হেঁটে যাই, তারা দু'পাশ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ ছুঁড়ে দেয়। অনেকে এগিয়ে এসে আমাকে সুপ্রভাত জানায়, অনেকে করমর্দন করে। এমনকি দারোয়ানরাও আমার নাম ধরে ডাকে।

এই যে পরিবর্তন এর আসল অর্থ কী? এর আসল রহস্য কী? আমাকে কেউ যদি

প্রশ্ন করো, তাহলে আমি সবিনয়ে বলবো, ভদ্রলোক সবই জানতেন, কীভাবে টাকা আয় করতে হয়, কীভাবে মুনাফাকে আকাশচুম্বী করতে হয়, কিভাবে আইনগত দিকগুলি বজায় রাখতে হয়, কীভাবে সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষা করতে হয়। তিনি শুধু একটি বিষয় জানতেন না, তা হলো, কীভাবে জনসংযোগের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করতে হয় এবং সকলের চোখে এক আদর্শ সফল পুরুষ উদ্যোগপতি হিসাবে চিহ্নিত হতে হয়।

আমি শুধু এইটুকুই করেছি মাত্র। আধার তৈরি ছিল, আমি সেখানে আগুন জ্বেলে দিয়েছি। আজ তিনি নিজের চরিত্রগুণে সকলের কাছে প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছেন।

আজ তিনি ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করছেন। অনেকটা সময় অবসরের মধ্যে কাটাতে পারছেন। এছাড়া আর একটি কথা এখানে বলার আছে। আগে প্রায়ই সহধর্মিণীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক বেঁধে যেতো। তিনি মনে করতেন, তিনি যা বলেছেন তাঁর স্ত্রী সেটাই মুখ বুজে পালন করবেন। কেননা, এটাই হলো সামাজিক নিয়ম। তিনি ঐ ভদ্রমহিলার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং তাঁর ওপরে নিজস্ব ন্যায়-নীতি চাপিয়ে দেবেন।

এইসব পুস্তিকা পড়ে এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ভুল বোঝাটা প্রবহমান তরঙ্গের মতো। একটি জায়গাতে যদি সে নির্দিষ্ট সুরে বাজাতে আরম্ভ করে, তাহলে অন্যত্র একই সুর ধ্বনিত হবে।

আজ তিনি সহধর্মিণীকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর কর্মের মধ্যে তাঁর সহধর্মিণীর মতামতও গুরুত্ব পাচ্ছে। সংসারের মধ্যে শান্তি নেমে এসেছে। বিতর্কের শব্দগুলো আর শোনা যায় না। পাড়া প্রতিবেশীরা খুশী হয়েছেন। তাঁরা এমনই একটি আদর্শ দম্পতির সাথে দিন কাটাতে ভালবাসেন।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ঘটে গেছে অদ্ভুত পরিবর্তন। নিত্য নতুন বিক্রয় প্রতিনিধিকে নিয়োগ করেছেন তিনি। অনেককে দিয়েছেন জীবিকার নতুন পথের সন্ধান। সে পথ আগে তিনি খুঁজে পাননি।

এভাবেই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু নিজের নয়। প্রতিটি কর্মচারীর জীবনেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একজন উদ্যোগপতির কথা বলি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মাইনে গত বছর পাঁচ হাজারের মতো বেড়ে গেছে। তিনি আমার বইগুলো পড়েন। প্রতিটি বাক্যকে বেদবাক্য বলে মনে করেন। জীবনে চলার পথে এগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

এবার আমি ফিলাডেলফিয়ার গ্যাস ওয়ার্কস কোম্পানীর এক উদ্যোগপতির কথা বলি। তাঁর চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যের ছাপ ছিল। তিনি কর্মীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। মাঝে মধ্যেই তাঁকে শ্রমিক অসন্তোষের মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল।

আমার বই উনি পড়তে শুরু করলেন। অবশ্য ওনার সাথে তখন আমার যোগাযোগ ছিল না। উনি বইগুলি পড়লেন। বইতে লিখিত বিষয়গুলি থেকে শিক্ষা নিলেন। তাই দেখা গেল, পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ওনার জীবনে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। আগে সব সময় ওনাকে খিটখিটে তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ বলে মনে হতো। এখন অবস্থাটা একেবারে পাল্টে গেল। উনি পঁচিশ বছরের যুবকের উৎসাহ ফিরে পেলেন। উনি নতুন করে আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অচিরেই ওনার পদোন্নতি হলো। ওনার বস অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! ঐ রুক্ষ মেজাজের বুড়োটির মনে এই পরিবর্তন কে এনে দিলো।

উনি এতো বেশি খুশী হয়েছিলেন, খুঁজে খুঁজে আমার ঠিকানা বের করে একদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে ওনার কৃতজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন।

উনি চলে যাবার পর আমি মনে মনে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। যাক বাবা, তাহলে আমার নিশি জাগরণ একেবারে বৃথা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। বিয়ের পর একজন মানুষের জীবনে সবথেকে বড়ো সাক্ষী হলেন তাঁর স্ত্রী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, তাঁরা এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেন না।

তার ফলে নানা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যায়। কেননা একজন সফল অথবা বিফল স্বামীকে সবচেয়ে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন ঐ স্ত্রী। তিনি বুঝতে পারেন, পুরুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিনা।

এই প্রসঙ্গেও আমি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে পারি। কেননা, একাধিকবার কয়েকজন বিশিষ্ট উদ্যোগপতির স্ত্রী আমার কাছে এসে ব্যক্তিগত আনন্দ, খুশী এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন—আপনি কি এক যাদুকর নাকি মশাই? আপনার ঐ ছোটো ছোটো বইগুলি পড়ে আমাদের স্বামীরা এতোখানি পাল্টে গেল কী করে? আগে তো কাজের শেষে বাড়ি মুখে বসে থাকতো। টাইয়ের নটটা পর্যন্ত আলগা করতে চাইতো না। আমাকেই এগিয়ে গিয়ে পা থেকে মোজা খুলে দিতে হতো। সব সময় বকরবকর করতো। সারাদিন কি বিশ্রী অবস্থার মধ্যে কেটে গেছে। তারই ফিরিস্তি দিতো। এখন দেখছি, বাড়ি ফিরে এসেই জোরে জোরে আমার নাম ধরে ডাকতে থাকে। সঙ্গে কিছু একটা কিনে আনে। ছোটো করে বলতে গেলে, সংসারের বাতাবরণটা একেবারে পাল্টে গেছে। আপনার ঐ বইগুলোর এতো শক্তি আছে!

অনেকেই এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। এই শিক্ষা তাঁদের জীবনধারাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তাঁরা নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন। সবই যেন এক যাদুবিদ্যার মতো। অনেক সময় উৎসাহের আতিশয্যে তারা আমাকে টেলিফোন করেছেন। আবার অনেকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন। অনেক দূর থেকে।

আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, আনন্দের উত্তেজনায় তাঁরা টগবগ করে ফুটছেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই অতি খুশীর খবরটা স্বয়ং লেখককে শোনাতে হবে—এমনই একটা উন্মাদ ইচ্ছে জেগেছিল তাঁদের মনের মধ্যে।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা বলি। তিনি আমার বইগুলো পড়ে এতো বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে রাতে বসে অনেকের সাথে আলোচনা শুরু করেন।

আলোচনার সময়সীমা রাত তিনটে পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল। তখনো পর্যন্ত তিনি বকর বকর করে বলেছেন। সকলে হাঁ করে তাঁর কথা গিলছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত অতিক্রম করে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সকলের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন এসে আমার কাছে আন্তরিক স্বীকারোক্তি রেখেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—লেখক, বাকি রাতটুকু আমি ঘুমোতে পারিনি।

শুধু সেই রাতই নয়, পর পর তিনরাত তিনি জেগে কাটিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমার নিস্তরঙ্গ মন সমুদ্রে কে যেন গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এ আমার কী হলো লেখক? এখন থেকে জীবনের প্রতিটি রাত আমাকে কি এভাবে জেগে কাটাতে হবে নাকি?

আমি অভয়বাণী শুনিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, না, এবার আপনি নিশ্চিন্ত ঘুমের সাগরে তলিয়ে যাবেন। এমন ঘুম যা আপনার ক্লান্ত শরীর এবং মনকে নতুন ভাবে শান্তি ও সুখ দেবে।

সত্যি তাই হয়েছিল। চতুর্থ রাত থেকে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। আগে তাঁকে রাত জাগতে হতো অন্য কারণে। দুশ্চিন্তার পোকারা কিলবিল করতো। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন। ওষুধ খেয়েছিলেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। এখন সামান্য কয়েকটা বই তাঁর জীবনের ভারধারাকে একেবারে পাল্টে দিলো। এখন সারাদিন কাজ এবং রাতে ঘুমের সাথে মিতালী। এই সহজ সরল নিয়মটা উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি।

লেখক হিসাবে এটাও আমার একটা বড়ো পাওনা। কেননা এর সাথে একজন পাঠকের শারীরিক সন্তুষ্টি যুক্ত হয়ে আছে। রাতে ঘুম হলে কী হয়? রাতে ঘুম হলে আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমরা নতুন একটি দিনের জন্যে আবার নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।

এটাই বোধহয় এই বইটির সবথেকে ইতিবাচক দিক।

এবার ঐ ভদ্রলোকের আসল পরিচয় বলে দেওয়া উচিত। উনি কিন্তু খামখেয়ালী স্বভাবের মানুষ নন। উনি একজন সাদাসিধে অশিক্ষিত মানুষ নন। নতুন কিছুর প্রতি অজানা অচেনা আকর্ষণ বোধ করেন। তিনি মার্জিত রুচির। রাশভারী প্রকৃতির। এক শিল্পী ব্যবসায়ী শহরের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর নাম একবার বললে আপনারা সবাই অবাক হয়ে যাবেন। দু-দুটি বিদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ইংরাজী ছাড়াও জার্মান এবং ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। এ হেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এক বুদ্ধিজীবী আমার লেখা পড়ে এতোখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সেকথা অকপটে আমাকে ও ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের জানাতে উদগ্রীব ছিলেন—এটাই আমার জীবনের পরম পাওনা হয়ে থাকবে।

এই পরিচ্ছেদ লেখার সময় এক প্রাচীনপন্থী অভিজাত জার্মান ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম।

ভদ্রলোকের পূর্বপুরুষেরা বংশানুক্রমে হোহেনজোলার্নদের হয়ে সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন। একটি আস্ত আটলান্টিক যাত্রীবাহী স্টিমার থেকে তিনি এই চিঠিখানা লিখেছিলেন। তাঁর চিঠি পড়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার বইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছেন এবং এই বইয়ের মধ্যে যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে সেগুলিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখার মধ্যে ধর্মীয় শ্রদ্ধা এবং আত্মিক উপলব্ধির পরশ লেগেছিল।

আর একজন ভদ্রলোকের কথা বলি। তিনি নিউইয়র্কের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন। সামাজিক স্তরে যথেষ্ট উঁচুতে তাঁর নাম স্থাপিত হয়েছে। ভদ্রলোক অনন্ত অর্থের অধিকারী। মস্ত একটি কার্পেট তৈরীর কারখানার মালিক।

তিনি জানিয়েছিলেন, আমার বইতে যে ধরনের বিচার পদ্ধতির কথা লেখা আছে, তিনি সেটি জনগণের ওপর প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। চার বছর ধরে কলেজে তিনি যা শিখেছিলেন, তার সবই ছিল তত্ত্বগত আলোচনা। ব্যবহারিক জীবনের সাথে কোনো যোগসূত্র ছিল না। কিন্তু আমার বইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি অসম্ভব সফল হয়েছেন।

আর ভেবেছেন, এটা কি হাস্যকর? নাকি অকল্পনীয়?

আমি তাঁর চিঠি পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, কীভাবে তাঁর মতো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক আমার লেখা পড়ে এতোখানি উপকৃত হলেন।

পরবর্তীকালে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ইয়েল ক্লাবে ছশো শ্রোতার সামনে তাঁর এই ভাষণ তুলে ধরেছিলেন। ভাষণের মধ্যে বারবার তিনি আমার বইয়ের প্রশংসা করেছিলেন।

এক্ষেত্রে একটি কথা বলা উচিত, আমি যে বারবার আমার বইয়ের কথা বলছি, তার মানে আমি কিন্তু নিজেকে মহান হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাইছি না। পাঠক-পাঠিকারা দোহাই,

আমাকে ভুল বুঝবেন না। একজন স্রষ্টা বেঁচে থাকেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। সৃষ্টি থেকে যায়। কিন্তু স্রষ্টা দূর আকাশের তারা হয়ে যান। আমি বিশ্বাস করি, একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু আমার এই সৃষ্টি তখনো থেকে যাবে। তখনো আপনারা এর থেকে অনেক রস আস্বাদন করতে পারবেন। জীবনের চলার পথের প্রতিটি মুহূর্তকে আলোকিত করতে পারবেন। লেখক হিসাবে সেটাই আমার পরম পাওনা হয়ে থাকবে।

হার্ভার্ডর বিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস একবার বলেছিলেন, আমাদের যা হওয়া উচিত তার সঙ্গে তুলনা করলে আমরা যা হয়েছি সেটা অনায়াসেই হেরে যাবে। আসলে আমরা আধো ঘুম, আধো তন্দ্রার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের মধ্যে অসম্ভব উদ্দীপনা আছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারছি না। আমরা ভাবছি, আজ দিনটা কোনো মতে কাটাতে পারলেই ভালো। কাল কী হবে, কাল দেখা যাবে। কেন এমন হবে? কেন এখন থেকে আমরা আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হবো না...

আমরা শুধু আমাদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার একটা ছোট্ট অংশকে আমাদের কাজে লাগাচ্ছি। তা নিয়ে যেটুকু সফলতা অর্জন করছি, সেটাকেই আকাশচুম্বী বলে মনে করছি। আরো ব্যাখ্যা করে বলতে হয়—একজন মানুষের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে, তার থেকে অনেক বেশি অক্ষমতা নিয়ে সে সুখে শান্তিতে দিন কাটায়। তার মধ্যে জমে থাকা নানা ধরনের শক্তিকে কাজে লাগাতে সে ব্যর্থ হয়। আর তার ফলেই জীবনে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে। নিরাশার ঘন মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়। হতাশার অন্ধকার জমে ওঠে। যে সব পুরুষেরা সত্যিকারের সফল, তারা কিন্তু ঐ অক্ষমতাকে ক্ষমতায় পরিণত করার চেষ্টা করেছে। এটাই মানুষের জীবনের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ভদ্রলোকের কথা আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। সত্যিই তো, এই যে হাজার হাজার মানুষ পথ দিয়ে চলেছেন, কেউ কেরানী, কেউ উদ্যোগপতি, কেউ আইনজীবী, কেউ ছাত্র, কেউ গবেষক, কেউ প্রেমিক—তাঁদের সকলের কাছে একই প্রশ্ন করুন দেখবেন তাঁরা সকলে একই জবাব দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, যতটা সফল হবো বলে ভেবেছিলাম, সফলতা ততখানি হয়নি তো। হয়তো কোথাও স্খলন ঘটে গেছে।

এখানে ঐ ভদ্রলোকের কথাই মনে পড়ে যায়—যতটা আমরা ক্ষমতা জাহির করি, তার থেকে অনেক বেশি অক্ষমতা আমাদের মাথার ওপর বোঝা হয়ে চেপে থাকে। আসুন, এই মুহূর্তে আমার হাতে হাত রাখুন। একটা কঠিন শপথ উচ্চারণ করুন। আজ থেকে আমাদের জীবনের একমাত্র কাজ হবে, ঐ অক্ষমতাকে ক্ষমতায় পরিণত করা। তা না হলে এই জীবনের আসল উদ্দেশ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডঃ জন জি হিবেনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল শিক্ষা বলতে আপনি কী মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে নানা শিক্ষাবিদ নানা কথা বলেছেন। অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষা হলো আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করার পথ। অনেকে বলেন, শিক্ষা অর্থে তত্ত্বগত জ্ঞানার্জন করা। কিন্তু ডঃ হিবেন পরিষ্কার বলেছিলেন—শিক্ষা হলো জীবনের নানা অবস্থার মোকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন করা। এই বক্তব্যের প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে বিশ্লেষিত করলে আমরা তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা বুঝতে পারবো। সত্যিই তো, জীবন তো আর পদ্মফুলে ঢাকা সরণী নয়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপল ব্যথিত বাধার সামনে দাঁড়াতে হয়। এমন কিছু প্রাচীর চোখের সামনে রচিত হয়, যা অতিক্রম করা সহজ সরল নয়।

শিক্ষা আমাদের কী দেবে? শিক্ষা আমাদের সেই জ্ঞান দেবে, যার ফলে আমরা বিরুদ্ধ শক্তিকে অতিক্রম করতে পারি। শিক্ষা আমাদের সেই প্রজ্ঞা দেবে, যার ফলে আমরা অসময়ে

ধৈর্য ধারণ করতে পারি। শিক্ষা আমাদের সেই সামর্থ্য দেবে যা আমাদের স্বপ্নকে আকাশচুম্বী করতে পারবে। এককথায় বলতে গেলে শিক্ষা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করার দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তুলবে।

তাহলে এবার আমরা বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করবো। ভূমিকাই হয়তো একটু বেশি হয়ে গেল। কিন্তু এই বইতে কী লেখা আছে তা ঠিকমত বুঝতে গেলে এই ভূমিকার আলাদা গুরুত্ব আছে। এবার প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রবেশ করবো। পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা আরো একটু বেশি মনঃসংযোগী হয়ে উঠুন। তা না হলে, আমার প্রবন্ধের আসল অর্থগুলোর মানে বুঝতে পারবেন না।

প্রথম পর্ব

জনসংযোগের প্রাথমিক কৌশল

এক

কখনো অন্যের সমালোচনা করবেন না

শিরোনামটা পড়ে যেন চমকে উঠবেন না।

চারদিকে দৃকপাত করলে দেখা যাবে, প্রতি মুহূর্তেই আমরা অন্যের সমালোচনা করি।

অমুক লোকটা কী অলস, ঐ লোকটা সব সময় বকবক করে কথা বলে, অমুক লোকটার মাথায় গোবর পোরা আছে—এসব কথা সব সময় আমরা উচ্চারণ করি।

অথচ আমরা কেউ একবার ভেবে দেখি না, আমাদের কাজ কি সমালোচিত হওয়ার যোগ্য নয়?

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা যাক।

তার আগে আসুন, একটা রোমহর্ষক ঘটনার প্রতিবেদন লেখা যাক।

আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবছেন, এ আবার কী কথা? প্রবন্ধের বইতে গল্প? লেখক কি এভাবেই কিছু আজগুবি তথ্য তুলে দেবেন নাকি?

ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়? আসুন, আগে গল্পটা বলা যাক। তারপর, না হয় আমরা আমাদের আসল অধ্যায়ে প্রবেশ করবো।

গল্প হলে কী হবে, এটা একটা সত্যি ঘটনা। ঘটে গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে। জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান করে নিয়েছিল। বড্ড বেশি অতিরিক্ত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, তাই নয় কি? আসুন, আমরা মনে মনে ১৯৩১ সালের সেই দিনটিতে ফিরে যাই।

৭ মে। নিউইয়র্ক শহরে দেখা গেল উত্তেজনাপূর্ণ একটি দৃশ্য। প্রাচীন এই শহরটাতে এমন ঘটনা এর আগে ঘটেছে বলে কেউ মনে করতে পারছেন না।

কয়েক সপ্তাহ খোঁজ করার পরে ট্রেলিকে কব্জা করেছিল স্থানীয় পুলিশ।

ট্রেলি কে? আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে দিতে হবে না। তাকে বলা হতো দুঁদে বন্দুকবাজ। সে ধূমপান করতে ভালবাসতো না। সুরাতেও তার আসক্তি ছিল না। কিন্তু একের পর এক মানুষ খুন করে তখন সে সাধারণ নাগরিকদের কাছে ত্রাস এবং আতঙ্কের সঞ্চার করেছে।

ট্রেলি কোথায় ধরা পড়লো? ট্রেলি ধরা পড়লো ওয়েস্ট এন্ড এভিনিউতে তার

প্রেমিকার আবাসে।

প্রায় শ'দেড়েক পুলিশ আর গোয়েন্দা মিলে তার আবাস ঘিরে ফেলেছিল। এই জায়গাটি অনেক দিন ধরে সে জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। মাঝে মধ্যেই সে রাতের অন্ধকারে এখানে ঢুকে পড়তো। তার প্রেমিকার সাথে কথা বলতো, আবার ভোর হবার আগেই চলে যেতো।

পুলিশরা দীর্ঘদিন ধরে নজর রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের প্রয়াসে সফল হয়। তারা চেষ্টা করেছিল, ছাদ ফুটো করে কাঁদানে গ্যাস ছড়িয়ে ট্রেলিকে বের করে আনতে।

ট্রেলির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ ছিল। সে যে শুধু সাধারণ মানুষকেই হত্যা করেছিল, তা নয়, দু-দু'জন পুলিশকেও নৃশংসভাবে মৃত্যুর পথিক করে দেয়। দেখা গেল, প্রথম প্রচেষ্টাটা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। তারপর পুলিশ আশেপাশের বাড়ির ছাদ দখল করলো। সেখানে মেশিনগান বসালো। শোনা গেল পিস্তলের শব্দ। মেশিনগানের আওয়াজ। নিউইয়র্কের অত্যন্ত বিলাসবহুল আবাসন এলাকা বারবার কেঁপে উঠলো। সেখানকার মানুষজন ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না।

ট্রেলি তখনো লড়াই চালাচ্ছে। সে কী করেছিল জানেন? শুনলে হয়তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। অবশ্য অনেকেই এখন সেই ঘটনার কথা জানেন।

ট্রেলি মালপত্র বোঝাই একটা চেয়ারের পেছনে লুকিয়েছিল। সে একা পুলিশের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। তখনো একদম ভেঙে পড়েনি।

দশ হাজার মানুষ উদগ্রীব হয়ে এই লড়াই দেখেছিল। প্রতি মুহূর্তে তারা উৎকণ্ঠার সমুদ্রে স্নান করছিল। আতঙ্কের মেঘে তাদের মনের আকাশে ছেয়ে গিয়েছিল। নিউইয়র্কের রাস্তায় এ দৃশ্য কখনো কারো চোখে পড়েনি। আগামী দিনে পড়বে এমন নিশ্চয়তা কোথায়?

সুতরাং দলে দলে আরো বেশি মানুষ এসে জমতে শুরু করে দিলো। পুলিশ তখন মানুষ সরাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুলিশ ট্রেলিকে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা গেল, সে তখন জনগণকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখেছিল। সেই চিঠির মধ্যে সে কী লিখেছিল?

সে লিখেছিল—আমার কোটের নিচে ঢাকা আছে একটি ক্লান্ত অথচ দয়াপূর্ণ হৃদয়, যে হৃদয় কখনো কারো ক্ষতি করবে না!

অথচ, ট্রেলি ধরা পড়ার পর পুলিশ কমিশনের মালদুনি বলেছিলেন—দুঁদে বন্দুকবাজ লোকটাকে আমরা নিউইয়র্কের ইতিহাসে সবথেকে সাঙ্ঘাতিক অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। হাসতে হাসতে সে যেভাবে মানুষ খুন করতে পারে তাতেই তাঁর নৃশংসতা প্রমাণিত হয়েছে।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ট্রেলিকে হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করলেও নিজের সম্পর্কে তার ধারণা ছিল একেবারে অন্য রকম, অর্থাৎ আমরা সকলেই নিজেকে সাধুপুরুষ বলে ভাবতে ভালোবাসি। তাই নয় কি?

এখানে আর একটি সাঙ্ঘাতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করি, এটাও খবরে কাগজের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং আপনাদের মধ্যে যারা বিচক্ষণ পাঠক, তারা নিশ্চয়ই পড়েছেন।

ঐ আরাম আয়াসনে প্রবেশ করার আগে ট্রেলি লঙ আইল্যান্ডের গ্রাম্য রাস্তাতে হৈ-হল্লোড়ে মেতে উঠেছিল। আচমকা একজন পুলিশ রাস্তায় রাখা ওর গাড়ির কাছে এসে বলেছিল—আপনার লাইসেন্সটা একবার দেখাবেন কি?

ট্রেলি হঠাৎ রেগে গিয়েছিল। সে বন্দুক বের করে পুলিশটির দিকে গুলি করতে শুরু করে। অফিসার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখনো ট্রেলির উন্মত্ত উন্মাদনা শেষ হয়নি।

সে পুলিশের রিভলবারটা বের করে নেয়। আবার তার দিকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে দেয়।

তাহলে দেখুন, এই খুনী কিনা শেষ পর্যন্ত বলছে—আমার কোটের নিচে এমন একটি হৃদয় আছে, যা সব সময় দয়াতে পরিপূর্ণ, যা ক্লান্ত রিজ। যা কোনোদিন কারো ক্ষতিসাধন করতে চায় না।

ট্রোলিকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাকে সিংসিং কারাগারে মরণ কুঠিতে হাজির করা হলো। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তোমার শেষতম বক্তব্য কী?

সকলে ভেবেছিল, ট্রোলির মনের মধ্যে হয়তো এবার বিবেকবোধ জাগরিত হয়েছে। সে হয়তো নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পেরেছে। সারাজীবন ধরে সে যে সব অন্যায় অপরাধ করে গেছে এবং তার ফলেই তাকে ঐ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—এটি বোধহয় ট্রোলি জানতে পেরেছে এখন।

সে হয়তো বলবে, আমি অনুতপ্ত, মানুষ খুন করার পুরস্কার হিসাবে আজ আমাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসতে হচ্ছে।

কিন্তু ট্রোলি তা বললো না। উপস্থিত সাংবাদিকদের অবাক করে সে ঘোষণা করলো, আত্মরক্ষার বদলে এটাই আমি পেলাম।

সে মনে মনে ভেবেছিল, তার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সমাজের চোখে সে নির্দোষ হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি? ট্রোলির রক্ষণে হয়তো কোনো ত্রুটি ছিল।

এই কাহিনীর সারমর্ম হলো খুঁজে বন্ধুকরাজ ট্রোলি কখনোই নিজেকে দোষী বলে মনে করেনি। এটা শুধু ট্রোলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এই পৃথিবীর সকল মানুষ নিজেকে নির্দোষ এবং অপরকে দোষী ভাবতে ভালোবাসে।

ট্রোলির কথা তো শুনলেন। এবার অলক্যাপনের কথা বলি। অলক্যাপন কে ছিল? সে ছিল আমেরিকার জনগণের এক নম্বর শত্রু। শিকাগোতে সে একটির পর একটি নৃশংস ডাকাতির নেতৃত্ব দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। যখন তার ইচ্ছে হতো হাতে কিছু টাকার দরকার, সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক বিজনান মানুষের বাড়িতে হানা দিতো। নৃশংসভাবে গৃহকর্তাকে হত্যা করতো। এমন কি মেয়ে শিশুদেরও ছাড়তো না। এই ক্যাপনও কিন্তু কখনো নিজের দোষ দেখতে পায় নি। সব সময় সে নিজেকে জনগণের এক উপকারী বন্ধু হিসাবে ভাবতো। সে ভাবতো নিজেকে জনগণের এক সেবক। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে সেবা করা।

নিজের প্রসঙ্গে সে বলেছিল—আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোকে আমি ব্যয় করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। এর বদলে আমি কী পেয়েছি? গভীর অনুতাপের সাথে আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে, আমি সকলের সমবেত নিন্দা পেয়েছি। সারাটা জীবন আমাকে এক পলাতক ইঁদুরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এই জীবন কি আমার কাম্য ছিল?

এবার ভাচসুলজের কথা বলি। নিউইয়র্কের দুদ্ধুতকারীর অন্যতম। গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। আমরা তাঁকে নিউইয়র্কের এক জঘন্য হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। খবরের কাগজে একটি সাক্ষাতকারে সে নিজেকে জনদরদী নেতা হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। ভাচসুলজ নিজে তাই বিশ্বাস করতো।

সিংসিং-এর কারাগারের ওয়ার্ডেন লয়েজের সাথে এবিষয়ে আমার বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন—সিংসিং-এর সব অপরাধীরাই নিজেদের নির্দোষ হিসাবে ভাবতে ভালোবাসে। তারা আমার আপনার মতো মানুষ। তাই তারা

নিজেদের এই সমস্ত খারাপ কাজের সপক্ষে কিছু অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করতে চায়। তাদের বুঝিয়ে দিলে তারা বুঝতে পারে না। তারা যে কেন অন্যের সিন্দুক ভাঙে বা গুলি চালায়—সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে নির্বিকার থাকে। তাদের যুক্তির মধ্যে কোনো চিন্তার ছাপ নেই। তারা বানানো কতগুলো শব্দ প্রয়োগ করে। তারা নিজেদের কাজকর্মের সাফাই দিতে চায়।

যারা অতিরিক্ত চালাক, তারা বলে, ওটা একটা দুর্ঘটনা। যদি একবার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাই, তাহলে ঐ ঘটনা আর কখনো ঘটবে না।

তারা বিশ্বাস করে, এই সামান্য অপরাধের জন্যে তাদের আটক করাটা মোটেই উচিত হয়নি।

তাহলে যদি আমরা খুঁজে বন্দুকরাজ ট্রোলি, ভাচসুলজ বা অলক্যাপনের কথা আলোচনা করি, তাহলে কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো? শুধু তারাই নয়, জেলখানার ঐ সাঙ্ঘাতিক লোকেরা নিজেদের দোষী বলে ভাবতে ভালোবাসে না। এর থেকে মানুষের জীবনের একটা গোপন আকাঙ্খার কথা ফুটে বেরোচ্ছে। তা হলো, পৃথিবীর সকলেই বোধহয় নিরপরাধী হিসাবে বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাকে অপরাধী সাজিয়ে দেয়।

পরলোকগত জন ওয়ানামেকার একবার স্বীকার করেছিলেন—তিরিশ বছর আগে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, কাউকে তিরস্কার করাটা বোকামি। কেননা যে দোষের জন্যে আমি তাকে তিরস্কার করছি, খুঁজলে হয়তো আমার চরিত্রের মধ্যে তার চেয়েও বেশি দোষ ধরা পড়ে যাবে। নিজের দুর্বলতাগুলোকে না ঢেকে আমরা অন্যের দুর্বলতার জন্যে তাকে বারে বারে অভিযুক্ত করি। এটা কখনোই করা উচিত নয়। এর পাশাপাশি আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তা হলো ঈশ্বর অথবা সৃষ্টিকর্তা সকলকে একইরকম বুদ্ধি দেন না। তাই জীবনের প্রথম প্রহর থেকে কেউ নির্বোধ কেউ অত্যধিক চালাক, কেউ যাশক্তি সম্পন্ন, কেউ বোকা হাঁদা গঙ্গারাম হয়ে পৃথিবীর বুকে পা রাখেন।

ওয়ানামেকার এ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বেশ আগেই। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ ঘুরে বেড়ানোর পর আমার উপলব্ধি হয়নি যে শতকরা নব্বই জন মানুষ আত্মসমালোচনা করতে চায় না।

সমালোচনা করা বৃথা। সমালোচনাতে মানুষ সাবধানী হয়ে পড়ে। নিজের কাজের সমর্থন খুঁজে বেড়ায়। সমালোচনা একটি মারাত্মক জিনিস। এতে মানুষের অহমিকা আহত হয়। মনুষের আত্মগর্বে ফাটল দেখা দেয়। সে সকলের দিকে ঘৃণার চোখে দৃকপাত করতে শুরু করে।

জার্মান সেনাবাহিনীতে একটি সুন্দর নিয়ম আছে। যদি সেখানে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে যায় তাহলে অভিযোগ পেশ করতে দেওয়া হয় না। সেই ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেওয়া হয় না। বলা হয়, ঠিক আছে, তোমার অভিযোগ আমি গ্রহণ করবো। কিন্তু এখন নয়। কেননা এখন তোমার মাথা গরম। সময় কেটে যাক। সময় হলে সবথেকে বড়ো শমনকারী বিষয়। তুমি বাহাত্তর ঘন্টা বাদে এসো। তখনো যদি তোমার মনে একই রকম রাগের অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে, তাহলে তোমার সমালোচনা আমি লিপিবদ্ধ করবো।

শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা যায় ঐ রেগে যাওয়া মানুষটি আর আসছে না। ইতিমধ্যে সে জীবনের অন্য কাজে মেতে উঠেছে। কখন কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করেছি, সে ব্যাপারটাও ভুলে গেছে।

এটিই হলো মানব মনস্তত্ত্ব। যদি এই ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ঠিকমতো না থাকে, তাহলে আমরা অকারণে সমালোচনার জালে জড়িয়ে পড়বো এবং জীবনটাকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ

করে দেবো।

ঈশ্বর জানেন, সাধারণ মানুষের জীবনে এমন কিছু শিক্ষা দরকার, ঐ জার্মান সময় বিদায় নিয়মের মতো, কখনোই আমরা হতাশাগ্রস্ত বাবা-মায়ের সমালোচনা করবো না। যে বৃত্তি সব সময় ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকে, তার চরিত্রের ভালো ভালো দিকগুলিকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করবো। সমালোচনা করলে, তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশ্য তাই উচিত। অচিরেই তার নির্গমনের পথ বন্ধ করে দেওয়া।

এবার আসুন আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইতিহাসের ছাত্র হয়ে যাই। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই ধরনের সমালোচনার অসারতার অনেক গল্প আছে। যা আমাদের নতুন ভাবে উজ্জীবিত করতে পারে।

আপনারা নিশ্চয়ই থিওডোর রুজভেল্ট এবং প্রেসিডেন্ট স্ট্যাফোর্ডের সেই বিখ্যাত বিতর্কের কথা শুনেছিলেন। সেই বিতর্কের ফলে রিপাবলিকান দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। উড্রো উইলসন হোয়াইট হাউসে ঢোকার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। যদি এই ঘটনা না ঘটতো, তাহলে বিশ্বযুদ্ধের আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়টি অন্যভাবে লেখা হতো।

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

১৯০৮ সাল। থিওডোর রুজভেল্ট যখন হোয়াইট হাউস ত্যাগ করলেন, তখন তিনি স্ট্যাফোর্ডকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর তিনি আফ্রিকায় চলে গেলেন সিংহ শিকার করতে। ফিরে এসেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন।

ইতিমধ্যেই স্ট্যাফোর্ড রক্ষণশীল পদক্ষেপে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেছেন। তিনি স্ট্যাফোর্ডকে ভর্ৎসনা করলেন। স্ট্যাফোর্ডের এই পদক্ষেপ তিনি মোটেই সমর্থন করতে পারেননি। এবার কী হলো? তিনি তৃতীয়বারের জন্যে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হলেন। নতুন একটি দল গঠন করলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিলেন।

ঝগড়াটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠলো। এবার নির্বাচন এলো, উইলিয়াম হাওয়ার্ড স্ট্যাফোর্ড হেরে গেলেন। শুধু তিনি নন, রিপাবলিকান দলের দারুণ পরাজয় ঘটলো। তারা মাত্র দুটি রাজ্য দখল করতে পেরেছিল। ভারমন্ট এবং ওটা। শতাব্দীর প্রাচীন এই দলটির এমন হতাশজনক ফল কেন হলো?

সকলেই ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলেন। থিওডোর রুজভেল্ট স্ট্যাফোর্ডকে দোষ দিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট স্ট্যাফোর্ড কি নিজের দোষ বুঝতে পেরেছিলেন? অবশ্যই পারেন নি।

তিনি অশ্রুসজল চোখে বলেছিলেন—আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। এই অবস্থায় আমি আর কী বা করতে পারতাম?

এতো বছর পরে আমার মনে হয়, আসলে কে দোষ করেছিলেন? থিওডোর রুজভেল্টের মতো এক মহান নেতা? নাকি স্ট্যাফোর্ডের মতো এক উদীয়মান নেতা?

আসল সত্যি কোথায় লুকিয়ে আছে, সে খবরটা এখনো আমি জানতে পারিনি। যে কথাটা আমি বোঝাতে চাই, তা হলো, থিওডোর রুজভেল্টের ঐ সমালোচনাতেও স্ট্যাফোর্ড অবিচলিত ছিলেন। তিনি নিজেকে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, থিওডোর রুজভেল্ট হয়তো আত্ম অহমিকাতে ভুগছেন। তাই স্ট্যাফোর্ডকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তিনি চাইছেন, স্ট্যাফোর্ডের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে। স্ট্যাফোর্ড যেন জনসাধারণের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের দোষ স্বীকার করেন, এমন একটা প্রতিকূল

পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে।

এরপর আমি টিপট ডোম তেল কেলেঙ্কারীর কথাটা তুলে ধরতে চাইছি।

পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা স্মৃতির খাতায় সেই ঘটনাটিকে লিখে রেখেছেন? বছরের পর বছর ধরে এই ঘটনাটা খবরের কাগজের পাতায় তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকারা নানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সারা দেশে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

আজকের দিনে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা জানেন, আমেরিকার জনজীবনে এত বেশি সাংঘাতিক প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

সংক্ষেপে সেই কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটা এখানে বলে দেওয়া হোক। তাহলে তরুণ প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধে হবে।

হার্ডিং-এর মন্ত্রীসভায় ইনটেরিয়ার সেক্রেটারী ছিলেন আলবার্ট ফল। তাঁর ওপর একটি গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হিল আর টিপট ডোমে সংরক্ষিত সরকারী তেল ভাণ্ডারগুলি দিতে হবে। এই তেল ভাণ্ডার রাখা ছিল নৌবাহিনীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যে।

তিনি কাজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি কী করলেন? প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে দর হাঁকবেন বলে ভাবলেন না। তিনি তাঁর বন্ধু এডওয়ার্ড এল কোহেনিকে এই লাভজনক চুক্তির ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন।

এবার কোহেনি কী করলেন? তিনি সেক্রেটারী ফলকে এক লক্ষ ডলার দিয়েছিলেন ধার হিসাবে। সেক্রেটারী ফল এবার স্বৈরতান্ত্রিক পথে কাজ করতে শুরু করলেন। তিনি প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্র নৌবহরকে নির্দেশনামা জারি করলেন। এলক হিল রিজার্ভে তাদের তৈল স্তূপ ব্যবহার করা যাবে না। এমনই একটি অদ্ভুত আদেশ দেওয়া হলো।

প্রতিযোগীরা বন্দুক আর বেয়নেটের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হলেন। আর এর ফলেই টিপট ডোমের দশ কোটি ডলারের কেলেঙ্কারীর কথাটা সকলের কানে পৌঁছে গেল।

এতে জনচিত্ত এতোই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল। পতন দেখা দিলো তাদের প্রশাসনিক যন্ত্রে। তাছাড়া সমস্ত দেশটা ঘৃণায় শিউরে উঠলো। রিপাবলিক দল ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ালো। আলবার্ট ডি ফলকে শেষ পর্যন্ত কারারুদ্ধ করে রাখা হলো।

সকলেই ফলকে দোষারোপ করলেন। জনজীবনে আর কোনো নায়ক এভাবে কখনো অভিযুক্ত হননি।

ফল কি অনুশোচনা করেছিলেন? ফল কি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন? ফল কি একবার ভেবেছিলেন তাঁর এই নিদারুণ ব্যর্থতার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে?

কখনো নয়। বেশ কয়েক বছর পরে, হার্বার্ট হুভার এক জনসমাবেশে বলেছিলেন—প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর মৃত্যুর কারণ ছিল মানসিক বিপর্যয়। তাঁর এক নিকট বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এই বিষয়কে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

মিসেস ফল বসে ছিলেন দর্শকদের মধ্যে। এই কথাটা শুনে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। তিনি সোজা স্টেজে উঠে যান। তিনি নিজের মাথাতে ঝিকার দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন—। ছিঃ! হার্ডিংকে ফল বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কখনো না। আমার স্বামী কোনোদিন কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। এ বাড়িটা সম্পূর্ণ সোনায় মুড়ে দিলেও আমার স্বামী কখনো লোভে পড়তেন না। আসলে আমার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তাঁকে মহামানব যীশুর মতো ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। শেষ

পর্যন্ত তাঁকে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এটিই হলো আমাদের স্বাভাবিক জীবনের সকরুণ বহিপ্রকাশ। আমি মিসেস ফলকে দোষারোপ করছি না। তাঁর চোখে শ্রীযুক্ত ফল ছিলেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। স্বামীর কোনো কাজকর্মের মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি তিনি খুঁজে পাননি।

শুধু শ্রীমতী ফল নন, আমি, আপনি, আমরা—সকলে এই দলের। অতএব আমি বা আপনি আজ অথবা আগামীকাল কেন অন্যকে সমালোচনা করবো? প্রতি মুহূর্তে আমরা সমালোচিত হবার মতো কাজ করেই চলেছি।

আমরা কেন অলঙ্কাপন, দুঁদে বন্ধুকবাজ ট্রেলি এবং অ্যালবার্ট ফলকে দোষারোপ করবো আর নিজেকে সাধুপুরুষ ভাববো?

আমাদের অনুভব করতে হবে, সমালোচনা হলো ঘরে ফেরা পায়রার মতো। সারাদিন যে পায়রারা আকাশে বকম বকম করে উড়ে বেড়ায়, আবার গোধূলি লগ্নে ঘরে ফিরে আসে। আমরা অন্যের সমালোচনা করলে, একদিন সেই সমালোচনা আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে।

আমাদের আর একটি উপলব্ধি করতে হবে। তা হলো, সমালোচনার মাধ্যমে কোনো মানুষের চরিত্রে ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। আর যদি আমি অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করি, তাহলে সেই লোকটিও আমার ত্রুটির দিকে নির্দেশ করবে। তার ফলে কী হবে? এর ফলে অনভিপ্রেত এক বিতর্কের সৃষ্টি হবে। আমরা কেউই সফলতার আসল সরণীটির সন্ধান করতে পারবো না।

এবার আসুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া একটি শোকস্তব্ধ ঘটনার ওপর আলোকপাত করা যাক।

আপনারা সকলেই জানেন গণতন্ত্রের মহান প্রবক্তা আব্রাহাম লিঙ্কনকে এক থিয়েটার হলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

১৮৬৫ সালের ১৫ এপ্রিল শনিবারের সকালবেলা।

লিঙ্কনের মৃত্যু পথযাত্রী দেহটি সাজানো ছিল শয়নঘরে।

এই ঘরটি ফোর্ডের নাট্যশালার সামনের রাস্তায় অবস্থিত। একটু আগেই ঐ নাট্যশালাতে ব্রুজ তাঁকে গুলি করেছিল। লিঙ্কনের দীর্ঘদেহ ছোট্ট খাটে ধরছে না। তাকে আড়াআড়ি ভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। মাথার দিকে টাঙানো ছিল রোসা বেনহর বিখ্যাত হর্সফায়ার ছবির একটি প্রতিলিপি। ঘরের মধ্যে অনুজ্জ্বল গ্যাসের আলো জ্বলছিল। তাতে পরিবেশটা আরো বেশি বিষণ্ণ হয়েউঠেছিল।

লিঙ্কনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সেক্রেটারী অফ স্টেটওয়ার্ক ট্যাভন। তিনি বললেন, ঐ যে শায়িত আছেন পৃথিবীর সবার থেকে যোগ্য একজন শাসক।

লিঙ্কনের উদ্দেশে প্রযুক্ত এই বিশেষণগুলির বিশেষত্ব কী?

সারা পৃথিবীতে অনেক সুদক্ষ প্রশাসকের জন্ম হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় লিঙ্কনকে পরাস্ত করতে পারবেন। কেউ কেউ সামরিক ক্ষমতার চূড়ান্ত শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। লিঙ্কনের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না। কেউ আবার আত্ম অহমিকার প্রতীক ছিলেন। অনন্ত অর্থের সন্ধান করেছিলেন। কিন্তু কেন লিঙ্কনকে অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ নেতার আসনে বসানো হয়েছে?

ছোট্ট কথায় বলতে হয়, জনসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছিল।

জনগণের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে লিঙ্কন যে কী আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর জীবনীগ্রন্থ পাঠ না করলে এই সরল সত্যটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না।

গত দশ বছর ধরে আমি বারবার আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী পাঠ করেছি। আবার তিন বছর ধরে তাঁর ওপর একটি বই লিখেছি। বইটা আমাকে অন্তত সতেরো বার লিখতে হয়েছে এবং কাটতে হয়েছিল। লিঙ্কনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে, এমন শব্দ আমি সন্ধান করতে পারছিলাম না।

অবশেষে আমার মধ্যে এই উপলব্ধি হয়েছে তা হলো, পৃথিবীর কোনো জীবনীকার বোধহয় লিঙ্কনের ব্যক্তিত্ব আর পারিবারিক জীবনের সার্থক প্রতিবিম্ব আঁকতে পারবেন না। কেননা তিনি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পরিবর্তিত করতেন। পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতেন। এটাই তাঁর ব্যক্তিত্বের সবথেকে উজ্জ্বল দিক।

আমি লিঙ্কন চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলাম। তা হলো, কীভাবে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে জনসংযোগ বজায় রেখে চলেন।

লিঙ্কন কি সমালোচনায় বিশ্বাস করতেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাকে অনেকগুলি বইয়ের পাতা ওল্টাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, হ্যাঁ, তিনিও মৃদুমন্দ সমালোচনায় বিশ্বাস করতেন।

ইন্ডিয়ানার পিজিয়ান ক্রিক উপত্যকায় তাঁর তরুণ বয়সের দিনগুলি কেটে গিয়েছিল। তখন তিনি বিভিন্ন মানুষের খুঁত ধরতেন। তাদের ত্রুটিগুলোর সমালোচনা করতেন। ছোটো ছোটো শ্লেষ পূর্ণ বাক্যের মধ্যে দিয়ে কবিতা লিখতেন। চিঠিও লিখতেন। চিঠিগুলি তিনি আবার গ্রাম্যপথের বুকে ছড়িয়ে দিতেন। যাতে সেগুলো অবধারিত ভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব চিঠির জন্যে আপত্তি উঠেছিল। সেটা সারাজীবন লিঙ্কনকে কালো ধোঁয়ার মতো তাড়া করেছিল। অনেকে ভেবেছিল, তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই এমন সমালোচনাপূর্ণ চিঠি লিখতেন। যাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, লিঙ্কনের চরিত্রের এটি এক গোপন বৈশিষ্ট্য। সমাজের কোথায় কোনো অন্যায় অবিচার দেখলে তিনি খুবই রেগে যেতেন। মনের উষ্মাটা এইভাবে প্রকাশ করতেন।

পরবর্তীকালে লিঙ্কন ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। তখন তিনি বিরোধীদের খোলাখুলি আক্রমণ করতেন। তাদের নির্মম ভাবে সমালোচনা করতেন। খবরের কাগজের পাতায় তাঁর একাধিক চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। এখন মনে হয়, এ কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তিনি স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে ফেলেছিলেন।

১৮৪২ সালের শরৎকাল। জেমস শীল্ড নামে এক গর্বিত কলহপ্রিয় আইরিস রাজনীতিবিদ লিঙ্কন ব্যঙ্গ করেছিলেন। লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ড জার্নালে একটি বেনামা চিঠিতে ঐ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঠাট্টা করে কিছু শব্দ লিখেছিলেন। সমস্ত শহরের মানুষ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। স্পর্শকাতর আর গর্বিত শীল্ড এতে ক্রোধে জ্বলতে থাকেন। তিনি খুঁজে খুঁজে চিঠির লেখককে বের করেন। তারপর তার ঘোড়ায় চড়ে লিঙ্কনের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন।

অবশেষে লিঙ্কনের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। জেমস শীল্ড এতোই রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্কনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। লিঙ্কন অবশ্য লড়াই করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সবসময় দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু এখানে তাঁর কিছুই করার নেই। শব্দ হলো তীরের মতো। হাত থেকে একবার ছুটে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। লিঙ্কনকে অস্ত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো। লিঙ্কনের হাত ছিলো বেশ বড়ো। তিনি অশ্বারোহীর উপযুক্ত চওড়া তলোয়ার বেছে নিলেন।

ওয়েস্ট মুস্টের কাছে তলোয়ার খেলা শেখা শুরু হলো। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই খেলাতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

এবার লড়াই হবে। মিসিসিপি নদীর তীরে বালুকাবেলায় রণাঙ্গন রচিত হয়েছে। লড়াইয়ের দিনে লিঙ্কন এবং শিল্ড দু'জনের হাতেই তলোয়ার। শেষ মুহূর্তে অবশ্য দু'জনের বন্ধুরা অকুস্থলে এসে পড়েছিলেন। লড়াই বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হলো।

লিঙ্কনের জীবনে এটিই হলো সব থেকে শিহরিত অভিজ্ঞতা। এই ঘটনা তাঁকে একেবারে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। এরপর তিনি কাউকে কখনো অপমানজনক চিঠি লেখেননি কারোর সমালোচনা করেননি। কারোর চারিত্রিক ত্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেননি। আবার, এরপর থেকেই তাঁকে আরো উদার ও প্রগতিপন্থী বলে মনে হয়েছিল।

এবার গৃহযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা বলা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে যা সবথেকে আতঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মার্কিন দেশ দু-টুকরো হয়ে যেতে বসেছিল। লিঙ্কন যদি তখন প্রেসিডেন্টের পদে না থাকতেন, তাহলে আমরা এই অখণ্ড দেশটিকে আর দেখতে পেতাম না।

তখন পটোম্যাকের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। লিঙ্কন একের পর এক নতুন সেনাপতি নিয়োগ করলেন। সেইসব সেনাপতিদের মধ্যে ছিলেন ম্যাকক্লেলান, পোপ, বার্নসাইড, হুকার প্রমুখ। সবশেষে এলেন মিড। তারা সকলেই ব্যর্থ হলেন। এক-একটি পরাজয়ের খবর আসছে আর লিঙ্কন হতাশায় ভেঙে পড়ছেন। দেশের অর্ধেক মানুষ এইসব অপদার্থ সেনাপতিদের ক্রমাগত দোষারোপ করে চলছিলেন। কিন্তু লিঙ্কন তাঁদের কাউকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। সকলের প্রতি ছিল তাঁর সহৃদয়তা। তিনি শান্তভাবেই এই অবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি সবসময় এই উক্তি করতেন—কারো সমালোচনা করো না, তাহলে নিজেও কখনো সমালোচিত হবে না।

মিসেস লিঙ্কন চাইতেন, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে স্বনামে এবং বেনামে বেশ কিছু অগ্নিগর্ভ চিঠি লিখতেন। লিঙ্কন কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—ওদের সমালোচনা করো না। সবসময় নিজেকে সমালোচকের অবস্থানে বসিয়ে রাখবে। তার পরিস্থিতির কথা বিচার বিবেচনা করবে। মনে রাখবে, তুমি যদি ঐ জায়গাতে থাকতে, তাহলে ওর থেকে আরো বেশি রেগে যেতে। এই কথা মনে হলেই তোমার মন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

তা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণে সমালোচনা করার দরকার হতো, তাহলে লিঙ্কন সেটি করতেন। কিন্তু ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পরিশীলনের ছাপ থাকতো। কখনোই তিনি উদগ্র আবেগকে প্রশ্রয় দিতেন না। এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করতেন না, যা বিকৃত মানুষটির মনে অকারণ দুঃখবোধের জন্ম দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাক। ঘটনাই তো মানুষের জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি।

১৮৬৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম তিনটি দিনে গেটিসবার্গের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ৪ জুলাই। শত্রু সেনাপতি লী দক্ষিণদিকে পালিয়ে যাচ্ছেন। তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে লী পটোম্যাক নদীর কাছে হাজির হয়েছেন। তিনি দেখতে পেলেন, নদী ভীষণ আকার ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে, সামনে এগোনোর কোনো পথ নেই। এই নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। পেছনে তাড়া করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ী বাহিনী।

তার মানে ইঁদুর কলে আটকা পড়েছিলেন লী। সামনে পেছনে পালাবার কোনো পথ

নেই।

অচিরেই এই শুভ সংবাদটা লিঙ্কনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। মনে রাখবেন ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ক্যাপ্টেন লী ছিলেন লিঙ্কনের সবথেকে বড়ো শত্রু। শত্রু ফাঁদে পড়েছে। অতএব এখুনি তাকে বিনাশ করতে হবে।

লিঙ্কন ভাবলেন, ঈশ্বর প্রেরিত এই সুবর্ণ সুযোগটা গ্রহণ করতেই হবে। এখন যদি লীর সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ করা যায়, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

লিঙ্কন সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি মীডকে আদেশ করলেন, কোনো সামরিক পরামর্শ সভা ডাকবেন না। তিনি বললেন, মীড যেন এখনই লীকে আক্রমণ করে। লিঙ্কন টেলিগ্রাফ করে এই আদেশ পাঠালেন, এর পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত দূত পাঠালেন মীডের কাছে।

জেনারেল মীড কী করলেন? অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে এই হুকুম তামিল করতেন। কিন্তু তিনি ঠিক উল্টো কাজ করেছিলেন। তিনি লিঙ্কনের হুকুম অগ্রাহ্য করলেন। সামরিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। তিনি চেয়েছিলেন আরো একটু বেশি সময় নষ্ট করতে। যাতে আটকে পড়া হতভাগ্য জেনারেল জীবন ফিরে পেতে পারেন।

লিঙ্কনকে টেলিগ্রাফ পাঠালেন। এই আক্রমণে যে তাঁর মত নেই সে কথা জানালেন। নানাধরনের ওজোর আপত্তি তুললেন। তিনি সরাসরি লীকে আক্রমণ করতে চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত কী হলো, প্রকৃতির রুদ্ররোষ কমে গেল। নদীর জল শান্ত হলো। লী তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে পটোম্যাক নদী পার হতে পারলেন।

ঠিক সময়ে খবর পৌঁছলো লিঙ্কনের কাছে। লিঙ্কন রেগে গেলেন। তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, এসবের উদ্দেশ্য কী? তাঁর ছেলে রবার্টের কাছে ফেটে ফেটে পড়লেন তিনি। হায় ঈশ্বর, এসবের মানে কী? আমরা শত্রুপক্ষকে হাতের মুঠোতে পেয়েছিলাম। অপদার্থ সেনাপতির জন্যে সেই সুযোগ মাঠে মারা গেল। একটু হাতবাড়ালেই ওদের আমরা বন্দী করতে পারতাম। সমস্ত দেশের জনমানসে আমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো। আমি ঠিকসময়ে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম। অথচ আমার সেনাপতি তাতে কর্ণপাত করলো না। যে কোনো সেনাপতি হলে এই সুযোগটা গ্রহণ করতো। আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তাহলে নিজেই দুর্বিনীত উদ্ধত লীকে চাবকাতে পারতাম।

তিক্ত হতাশায় পড়ে লিঙ্কন সঙ্গে সঙ্গে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কটুবাক্য ব্যবহার করেননি। ১৮৬৩ সালে লেখা এই চিঠির মধ্যে আছে তীব্র তিরস্কার।

লিঙ্কন লিখেছিলেন—প্রিয় জেনারেল, আপনি কি এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি? এইভাবে কেউ শত্রু সেনাপতিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেয়? আপনাকে এতো মহান হতে কে বলেছিল? ঐ পরিস্থিতিতে যদি আমরা লী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম, তাহলে তারা কোথাও পালাতে পারতো না । আমরা সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারতাম। কিন্তু আপনার অবিমৃশ্যকারিতা এই যুদ্ধকে অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিলো। এখনো কত বছর ধরে রণাঙ্গনে দামামা বাজবে। কত সৈনিকের মৃত্যু হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে ফাটল দেখা দেবে।

আপনি কেন এটা করলেন? আপনি যদি গত সোমবার লীকে নিরাপদে আক্রমণ না করে থাকতে পারেন, তাহলে আপনি নদীর দক্ষিণদিকে গিয়ে তার মোকাবিলা করতে পারতেন। আপনার হাতে যথেষ্ট সৈন্য ছিল। লীর হাতে তখন মোটেই বেশি সৈন্য ছিল না। এ সম্পর্কে আপনার কোনো যুক্তি তর্ক আমি কোনোভাবেই মানবো না। আশা করি আপনি আর চিঠি লিখে আমাকে বিরক্ত করবেন না। হাতের মুঠোয় সুবর্ণ সুযোগ এসে ধরা দিয়েছিল, আপনি যে কেন তাকে ছেড়ে দিলেন, সেই রহস্যটা আমি কিছুতেই বুঝতে

পারছি না।

এবার ভাবুন তো, লিঙ্কনের কাছ থেকে এই চিঠি যখন মীরের হাতে পৌঁছেছিল, তখন জেনারেলের মনের অবস্থা কী হয়েছিল।

এই কঠিন প্রশ্নের জবাব আপনাদের দিতে হবে না। কেননা শেষ পর্যন্ত লিঙ্কন এই চিঠিখানি আর পোস্ট করেননি। তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বশে তিনি কয়েকটি কটু কথা লিখেছিলেন, একথা সত্যি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের এই উষ্মতার কথা অধীনস্থ জেনারেলের কানে পৌঁছে দেননি। এখানেই লিঙ্কনের মহত্ত্ব। তাই আমরা তাঁকে বিশ্বের গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। লিঙ্কন তাই করতেন। কারো ওপর চিঠি লেখার দরকার পড়লে লিখতেন, তারপর চিঠিখানি ডেস্কের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিতেন। একদিন দু'দিন-তিনদিন অপেক্ষা করতেন। আবার ঐ বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতেন। যদি দেখতেন, এখনো তাঁর রাগ আগের মতোই রয়ে গেছে, তাহলে চিঠিখানি পোস্টে পাঠাতেন। আর যদি দেখতেন, রাগ অনেকখানি পড়ে গেছে, তাহলে চিঠিটা আর পাঠাতেন না। ওটি ঐখানেই পড়ে থাকতো।

এক্ষেত্রেও তিনি একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হয়তো চিঠি লেখার পর বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। স্বগত সম্ভাষণের মধ্যে বলেছিলেন—এক মিনিট অপেক্ষা করা যাক। মনে হয় আমার এতোটা তাড়াহুড়ো করা উচিত হয়নি। হোয়াইট হাউসের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বসে আমি অনায়াসে কাউকে আক্রমণ করে চিঠি লিখতে পারি। আমি যদি নিজে রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকতাম, আমায় যদি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আতঙ্ক এবং সন্ত্রাস তাড়া করে বেড়াতো, তাহলে আমি কি করতাম? তাহলে হয়তো আমি মীরের মতোই কাজ করতাম।

পেটিসবার্গে অবস্থানকালে মনটা আমার একেবারেই অন্য রকম হয়ে যেতো। প্রতি সপ্তাহে চোখের সামনে রক্তপাত দেখতে হতো। আহত এবং মৃতদের কাতর আর্তনাদ আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিতো। আমি হয়তো নতুন করে আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করার মতো উৎসাহ বোধ করতাম না।

যাই হোক, অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই। আমি যদি এখন এই চিঠি মীরের কাছে পাঠাই, তাহলে মানসিক শান্তি পাবো। আমার অশান্ত হৃদয় নিথর হবে। কিন্তু এর পরিণামে কী হবে, মীর হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। হয়তো তার মনের মধ্যে ক্ষোভ জন্মাবে। সে আর আগের মতো আনুগত্য প্রকাশ করতে পারবে না।

শুধু তাই নয় সে চেষ্টা করবে, কীভাবে আমার বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর তোলা যায়। আমাকে দোষারোপ করবে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। সেনাপতি হিসাবে মীর অত্যন্ত যোগ্য। সামান্য এই কারণে আমি তার যোগ্যতা ধ্বংস করে দেবো? হয়তো সে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাতে কী হবে? মীরকে তো আর বন্দী করা সম্ভব হবে না। তাহলে? ভালো আর মন্দকে বিচারের দাড়িপাল্লায় চাপাতে হবে। দেখতে হবে মীরকে বরখাস্ত করলে আমি কতটুকু লাভবান হতে পারবো।

অতএব, লিঙ্কন চিঠিখানা সরিয়ে রেখে দিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন তীব্র সমালোচনা আর নিন্দা ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়।

এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তিনি যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন যদি কোনো গভীর সমস্যার মুখোমুখি হতেন, তাহলে আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিতেন। ডেস্কের পেছনে টাঙানো লিঙ্কনের বিশাল ছবিটার

দিকে তাকাতেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতেন। স্যার, আমার মতো অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন।

রুজভেল্টের মনে হতো লিঙ্কনের ঠোঁট থেকে ঠিকরে আসা কৌতুক হাসির মধ্যেই বোধহয় ঐ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। তার মানে, ধীরে ধীরে শান্তভাবে প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করতে হবে। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আগে থেকেই সমালোচনা করে কী লাভ।

যখনই আমরা চাইবো কাউকে সমালোচনা করতে, তখন আমরা কী করবো? আমরা চট করে পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করবো। তার ওপর লিঙ্কনের মুখের ছবি ছাপা আছে। আমরা সেদিকে তাকিয়ে বলবো—লিঙ্কন সাহেব, আমার মতো আপনিও যদি এমন সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় প্রহর কাটাতে বাধ্য হতেন তাহলে কী করতেন?

আপনার কি এমন কাউকে জানা আছে, যে তার মনকে পরিবর্তিত করে উন্নতির শিখরে উঠে গেছে। চমৎকার, খুব ভালো কথা। তাহলে সেই মানুষটিকেই আপনি আপনার জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করুন এবং প্রতিক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন।

অবশ্য, এখানে অন্য একটি কথা বলা যেতে পারে। তা হলো, আপনি তো নিজেকে নিয়েই শুরু করতে পারেন। হয়তো ভাববেন, এর মধ্যে স্বার্থপরতার গন্ধ আছে। কিন্তু আমি মনে করি, যে কোনো কাজে নিজেকেই সবথেকে আগে প্রয়োগ করা উচিত। কেননা আমরা নিজের সম্পর্কে যতটা জানি, পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ সম্পর্কে এতোটা জানি কী? চেনা পথের পথিক হলে সফলতা সহজে হাতের মুঠোয় চলে আসে। অচেনা পথে অনেক বিপদ আপদ লুকিয়ে থাকে। আমরা আগে থেকে তার অনুসন্ধান করতে পারি না।

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ব্রাউনিং একবার বলেছিলেন, কোনো মানুষ যখন নিজের মধ্যেই সংগ্রাম শুরু করতে চায়, তখন মনে রাখতে হবে, তার এই ইচ্ছার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে। ঐকান্তিক প্রয়াস আছে। সে নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছে। এখন সেইভাবে তৈরি হতে চাইছে।

ব্রাউনিং-এর কথাগুলো সত্যি ভেবে দেখবার মতো। যদি এখন থেকেই কাজ শুরু করা যায় তাহলে আগামী বড়দিনের আগেই আপনি আপনার চরিত্রে ত্রুটিগুলিকে শোধরাতে পারবেন। হয়তো এরপর দীর্ঘ ছুটি করায়ত্ত হবে আপনার। নববর্ষের সকালে আপনি দেখবেন, ইতিমধ্যেই আপনি এক নতুন মানুষে পর্যবসিত হয়েছেন। এবার আপনি ভাববেন, বোকার মতো কেন যে আমি অন্যের সমালোচনা করতাম। এতে কী পেয়েছি? শুধু শুধু কিছু মানুষের সাথে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বন্ধুকে আমি অকারণে হারিয়েছি।

তার মানে আমার বক্তব্য ও উপদেশ হলো, আগে নিজেকে ঠিক করে নিন। নিজের সমস্ত ত্রুটির ছিদ্রগুলি বন্ধ করুন। তারপর না হয় অন্যের বাড়িতে গিয়ে হাঁড়ির খবর নেবেন।

চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন—আপনার পড়শীর ছাদের অবস্থা দেখে হেসে উঠবেন না। কেননা আপনার নিজের ঘরের সদর অপরিচ্ছন্ন আছে।

আমার বয়েস যখন খুবই অল্প ছিল, তখন আমি নানাভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতাম। ভালো ভালো কথা বলতাম, বিখ্যাত লোকদের কাছে চিঠি পাঠাতাম। এমন কিছু আচার-আচরণ করতাম যাতে সহজেই লোকের চোখে পড়ে যাই।

সেই সময়ে মার্কিন দেশের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো বিরাজ করতেন রিচার্ড হার্ডিঙ্গ ডেভিড। তাকে আমি একটি মুখের মতো চিঠি লিখেছিলাম। লেখকদের সম্পর্কে

সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ডেভিড যেন এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন।

এর কয়েক সপ্তাহ আগে আমি একজনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। তার তলায় ছোট্ট করে লেখা ছিল এটি শ্রুতি লিখিত। কিন্তু পঠিত হয়নি।

আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। আমি ভেবেছিলাম, ঐ চিঠির লেখক নিশ্চয়ই দারুণ ব্যস্ত মানুষ। তাই নিজে হাতে চিঠি লেখার মতো সময় তাঁর নেই।

নিজে কত ব্যস্ত সেটা প্রমাণ করার জন্যে আমি আমার চিঠির তলাতেও ঐ ধার করা শব্দগুলো বসিয়ে দিয়েছিলাম—শ্রুতি লিখিত কিন্তু পঠিত নয়।

আমি ভেবেছিলাম রিচার্ড ডেভিড যখন এই চিঠিটা হাতে পাবেন, তখন তিনি অবাক হয়ে যাবেন। তিনি ভাববেন, সমাজের কেউকেটা একজন তাঁকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছে।

আমার দুর্ভাগ্য, সেই চিঠির কোনো উত্তর তিনি দেননি। শুধু ঐ চিঠিখানা ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ক'টি বাক্য লিখে দিয়েছিলেন—ভদ্রতার কণামাত্র আপনার জানা নেই।

পরে আমি ভেবে দেখেছি, সত্যি কাজটা বোকার মতো করা হয়েছিল। অমন এক মহান সাহিত্যিককে আমি একটি শ্রুতিলিখিত চিঠি পাঠাচ্ছি, তাও আবার জাহির করে লিখে দিয়েছি—এর মধ্যে ভদ্রতা লুকিয়ে থাকতে পারে কি?

এসব গালাগাল আমার পাওনা ছিল। তবে আমি ছিলাম রক্তমাংসের মানুষ। এই সমালোচনা সহ্য করতে পারিনি। আমার বিতৃষ্ণা এমন একটা স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যখন দশ বছর বাদে রিচার্ড হার্ডিঞ্জ ডেভিডের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করি, তখনো সেই মানুষটি কে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল তিনি ঐ কথাগুলো লিখে আমার আত্মাকে আঘাত করেছিলেন। অবশ্য এটি আমার আত্মঅহমিকার প্রকাশ মাত্র। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ডেভিড কিন্তু আমাকে কষ্ট দেবেন বলে ঐ শব্দগুলি লেখেননি। আসলে তিনি হয়তো আমার ঘুমন্ত বিবেকবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

ধরুন, আগামীকাল আমার আর আপনার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলো। সেটি কয়েক দশক ধরে জিইয়ে থাকতে পারে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে আমার সদভাব আর নাও হতে পারে। তাই, ঝগড়া করার আগে তিনবার ভেবে দেখতে হবে—ঝগড়ার পরিণাম কতদূর যেতে পারে? সে কোনো সময়সীমা মানে না। প্রতিটি শুভ মুহূর্তকে অশুভ আতঙ্কে পরিণত করে দেয়।

কোনো মানুষের সাথে ব্যবহার করার সময় কতগুলি প্রাথমিক বিষয়ে ধ্যানধারণা দিতে হবে। দেখতে হবে, আমরা যুক্তিসহ কোনো প্রাণীর সাথে ব্যবহার করছি না। আমরা এমন এক প্রাণীর সাথে ব্যবহার করছি, যার মধ্যে অন্ধ ভাবাবেগ আছে। যারা পুরনো সংস্কারকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। নিজস্ব অহঙ্কারের পথে চলে। অহেতুক কিছু গর্বের বড়াই করে।

তাছাড়া এইসব প্রাণীর মধ্যে সমালোচনা নামক একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আছে। যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যদি একবার অহমিকার বারুদের মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে মুহূর্তের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এই বিস্ফোরণের কখনো কখনো মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। অনেকে আহত হতে পারে। তবুও ঐ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সদাসর্বদা ক্রিয়াশীল থাকবে।

এখানে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। জেনারেল লেনার্ড উডকে সমালোচনা করা হয়েছিল। তাঁকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ফ্রান্সে যেতে দেওয়া হয়নি। তার অহমিকাতে এই ঘটনাটি এতো বেশী আঘাত দিয়েছিল যে তার জীবনের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইংরাজী সাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন টমাস হার্ডি। তাঁর লেখা কিছু উপন্যাস এখনো আমরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে থাকি। টমাস হার্ডি সম্পর্কে

একটি গোপন খবর আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। টমাস হার্ডির সমালোচকেরা তাঁকে এতো নগ্ন নির্মম ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন যে হার্ডি জীবনের মতো লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের তরুণ কবি টমাস চ্যাটারটনের কথাও বলা যেতে পারে। সমালোচনার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি শেষ কৈশোর দিনে আত্মহত্যা করেছিলেন। অথচ চ্যাটারটনের লেখার মধ্যে একটা অন্য আবেদন ছিল। প্রাক কৈশোরিক প্রেমকে তিনি এতো সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করতে পারছেন, যা অনেক কবি পারেন না।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যৌবনে ছিলেন খুবই খোলা মনের। পরবর্তী কালে তিনি আবার অত্যন্ত কূশলী হয়ে ওঠেন। জনগণের সাথে কীভাবে মিশতে হবে সেই ব্যাপারটা তিনি সহজেই শিখে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের এই সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায় লুকিয়ে আছে? এই প্রসঙ্গে একবার ফ্রাঙ্কলিনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি খোলাখুলি জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি কাউকে নিন্দে করবো না। যার মধ্যে যতটুকু ভালো আছে, তার প্রশংসা করবো। এটিই হলো আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি শান্ত মনে এই লক্ষ্য পালন করে এসেছি বলে এমন সাফল্যের সরণীতে পা রাখতে পেরেছি।

অতি সহজেই আমরা মুখের মতো সমালোচনা করতে পারি। কারোর কোনো কাজে নিন্দা করতে পারি। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমার এই সমালোচনা নিন্দা বা অভিযোগ শেষ পর্যন্ত কোন হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

অপরকে বুঝতে পারার মধ্যেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। ক্ষমাশীলতা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমাশীলতা না থাকলে আমরা কখনোই চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারবো না।

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার কারলাইল বলেছিলেন, কোনো মহান মানুষের মহত্বের প্রকাশ ঘটে এই ব্যাপারটির মধ্যে দিয়ে, তা হলো, তিনি সাধারণ মানুষদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করছেন। তিনি যদি সাধারণ মানুষকে অকারণে নিন্দা করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তাঁর মধ্যে একধরনের আত্মঅহমিকা বোধ আছে। যে মানুষের এই বোধটি বেশি থাকে তাকে কখনো আমরা মহান মানুষ বলবো না।

আর যাঁরা সাধারণ মানুষের সাথে মিলেমিশে জীবন কাটাতে পারেন, এরাই সত্যিকারের মহত্বের অধিকারী।

এই ব্যাপারটা বিচার করেই আমরা মহামনীষীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করবো।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? তাহলে একটা কথা আমরা কী বলতে পারি না, সমালোচনা করা কখনোই উচিত নয়। সহানুভূতির দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করুন। চরিত্রের মধ্যে ধৈর্য আনুন। দয়ালু ভাবাপন্ন হয়ে উঠুন। সবচেয়ে জানার আসল অর্থই হলো তাদের ছোটোখাটো ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করা। দেখতে হবে, যতক্ষণ তাদের আচরণ আপনার কোনো ক্ষতি করতে না পারছে, ততক্ষণ নিস্পৃহ থাকা উচিত।

ডঃ জনসন যেমন বলেছিলেন—স্বয়ং ভগবানও মানুষের শেষ বিচারের দিনে এমন নির্মোহ দৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করেন। মানুষের জীবনের ছোটোখাটো ত্রুটিগুলিকে তিনি ক্ষমা ঘেন্না করে দেন। তা না হলে আমাদের সকলের স্থান হতো নরকের অভ্যন্তরে।

ঈশ্বর যদি এমন দয়ালু হতে পারেন, তাহলে আমি আপনি কেন তার পথ অনুসরণ করতে পারবো না?

দুই

জনগণের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে

এবার আমরা মানুষের সফলতার আর একটি সোপানে পা রাখতে চলেছি। তা হলো, বিভিন্ন চরিত্র সম্পন্ন জনগণের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটা দারুণ দামী কথা উচ্চারণ করা যায়। আপনি যখনই অন্যকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে গেছেন, তখন দেখেছেন, সেই লোকটি আপনার মনোমতো কাজ করতে পারছে না। হয় সে অকাজে মন দিচ্ছে অথবা অনেকটা বেশি সময় কাটাচ্ছে। কোনো ক্ষেত্রেই তার কাজ আপনার মনঃপূত হচ্ছে না। এর ফলে কী হচ্ছে? এর ফলে কাজটি আপনাকে নিজের হাতে করতে হচ্ছে। তার ফলে অন্য কোনো ভালো কাজে আপনি আর মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। তাহলে এই পৃথিবীতে অন্যকে দিয়ে আমরা কীভাবে কাজ করাতে পারবো? এই ব্যাপারটা নিয়ে কখনো কী ভাবনা চিন্তা করেছেন? হ্যাঁ, একটিমাত্র পথ খোলা আছে, তা হলো, ঐ কাজটি সম্পর্কে মানুষটিকে আরো বেশি আগ্রহী করে তোলা।

না, এছাড়া আর কোনো পথ নেই!

অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অঘটন ঘটে যায়। আপনি সহজেই বলবেন, একটি লোকের হাতে সোনার ঘড়ি পরানো আছে। আমার মনে ইচ্ছে জাগলো, আমি ঘড়িটিকে আমার হাতে বাঁধবো। আমি কী করবো? আমি ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বললেও সে লোকটি ঘড়িটি খুলে দেবে না। এখন যদি আমি একটা বুলেট ভর্তি রিভলবার নিয়ে গিয়ে তার বুকের ওপর চেপে ধরি তাহলে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘড়িটি আমার হাতে পরিয়ে দেবে।

এভাবে হয়তো আমরা ভয় দেখিয়ে কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করাতে পারি। কিন্তু সে আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা সম্মান কিছুই দেবে না। আমার অবর্তমানে আমাকে গালাগাল দেবে। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করবে। ঠিক এইভাবে আমরা ছোটো একটি ছেলেকে মারের ভয় দেখিয়ে অনেকক্ষণ পড়ার ঘরে আটকে রাখি, চাবুক মারার ভয় দেখিয়ে শিশুশ্রমিকদের অনৈতিকভাবে খাটানো হয়। কিন্তু এই ধরনের নিষ্ঠুর পদ্ধতির অনেক অবাঞ্ছিত ফল আছে। এইসব পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত কখনো সুখদায়ক হতে পারে না।

তাহলে? কীভাবে আমরা একজন অনিচ্ছুক মানুষকে দিয়ে কাজ করাবো? আগেই বলেছি, কাজটির প্রতি আরো বেশি অনুরাগ জন্মাতে হবে। বলতে হবে—এই কাজ তুমি যেভাবে করো, অন্য কোনো মানুষ সেভাবে করতে পারবে না। অতএব, এই কাজে তুমিই হলে আমার সর্বোত্তম শ্রমিক।

ব্যাপারটা আরো একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা যাক। এই প্রসঙ্গে আমরা ভিয়েনার বিখ্যাত মনোবিশ্লেষক ডঃ সিগমন্ড ফ্রয়েডের কথা বলবো। তাঁকে আমরা অনায়াসে বিংশ শতাব্দীর সব থেকে জনপ্রিয় মনোবিজ্ঞানীর আখ্যা দিতে পারি। তিনি একবার একটি আলোচনা সভায় বলেছিলেন, আমি বা আপনি যে সমস্ত কাজ করে থাকি তার অন্তরালে দুটি উদ্দেশ্য থাকে। এক—যৌন আবেগ এবং দুই—বড়ো হওয়ার আকাঙ্খা।

চট করে মনে হবে ফ্রয়েডের কথার মধ্যে সত্যতা নেই। কিন্তু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলে, তার কথার আসল গুরুত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবো।

আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসার জন ডিউক আবার এই ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখেছেন। জন ডিউক বলেছেন, মানব মনে গভীরভাবে যে আকাঙ্খা প্রোথিত থাকে, তা হলো বিখ্যাত হওয়ার বাসনা। সকলের মনেই এই বাসনা লুকিয়ে আছে। কেউ হয়তো

সঙ্গীতজ্ঞ হতে চাইছে, কেউ গীতিকার, কেউ লেখক, কেউ ব্যবহারজীবী, কেউ অনন্ত অর্থের অধিকারী, কেউ উদ্যোগপতি, কেউ রাজনীতি বিশারদ, কথাটার মধ্যে যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। বিখ্যাত হওয়ার বাসনা—এই তিনটি শব্দ কত গভীর অর্থবাহী। এই বিষয়ে আমরা আবার পরে আলোচনা করবো। তবে ব্যাপারটাকে সহজে হেলাফেলা করবেন না।

এই জীবনে আপনি কী হতে চান। হয়তো তেমন কিছুই নয়। হয়তো দশটা-পাঁচটার জীবনের মধ্যেই আপনি আসল মানেটা খুঁজে নিতে চান। তা হলেও আপনার উচিত, নীচের প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়ানো। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকেই এই সব ব্যাপারগুলোর ওপর নজর দিতে হয়। যেমন—

(১) স্বাস্থ্য এবং জীবনরক্ষা, (২) খাদ্য, (৩) ঘুম, (৪) টাকা পয়সা এবং টাকায় কেনা যায় এই ধরনের জিনিসপত্র, (৫) পরের জীবন, (৬) যৌন আনন্দ ও তৃপ্তি, (৭) সন্তানের সুখ-সুবিধা এবং (৮) নিজের প্রাধান্য বোধ।

এর মধ্যে আমরা হয়তো সবগুলিই পাবো, শুধু একটি জিনিসকে আমরা চট করে করায়ত্ত করতে পারি না। খাদ্য আর ঘুমের মতো গভীর আকাঙ্খা অথবা জরুরী প্রয়োজনীয় আর একটি জিনিস আছে। তাকেই ফ্রয়েড বলেছিলেন বড়ো হওয়ার আকাঙ্খা। আবার ডিউক তাকে বলেছেন, বিখ্যাত হওয়ার বাসনা। ওপরে আমরা মানুষের যে আটটি প্রাথমিক চাহিদার কথা বললাম, সেই আটটি চাহিদাকে যদি একদিকে রাখা যায় এবং বড়ো হওয়ার আকাঙ্খাকে যদি অন্য দিকে রাখা যায়, তাহলে, আমার স্থির বিশ্বাস, বড়ো হওয়ার আকাঙ্খার দিকটি ভারী হবে।

লিঙ্কন একবার একটি চিঠি এইভাবে শুরু করেছিলেন—প্রত্যেকেই প্রশংসা পছন্দ করে। নিন্দাকে সবাই ঘেন্না করে। উইলিয়াম জেমস এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—মানব চরিত্রের একটা গভীর গোপন আকাঙ্খা হলো, প্রশংসা পাওয়ার তীব্রতম আকুতি।

লক্ষ্য করবেন, তিনি ইচ্ছে করেই কিন্তু আশা বা বাসনা কথাটি বলেননি। তিনি "আকুতি"—এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। আকুতি—এই শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি মানব মনের আবেগ সঞ্চাত ইচ্ছে বা উদ্দামনার কথা বলেছিলেন। সত্যিই তো, বড়ো হওয়ার বাসনাকে আমরা এক অদ্ভুত আকুতি বলতে পারি।

তাহলে আমরা আবার মানুষের সেই প্রাথমিক ক্ষুধার কথা বলছি। যে বিরল প্রকৃতির মানুষ এই ক্ষুধা মেটাতে পারেন তিনি বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত সাফল্যকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারেন। আর একথাটাও ধ্রুব সত্য যে লোকটি কবর দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করে, সেও এমন মানুষের মৃত্যুতে সত্যি সত্যি দুঃখবোধ করবে।

মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে অনেক তফাত আছে। তবে মনোজগতের যে প্রথম এবং প্রধান তফাত আমাকে বারে বারে চিন্তিত ও উজ্জীবিত করেছে, তা হলো বড়ো হওয়ার বাসনা। এখানে আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তখন আমি মিসৌরীর গ্রামারে কাজ করতাম। আমার বাবা জার্সি জাতের গুয়োর আর লাল মুখ গরু লালন করতেন। গ্রামের মেলায় আমরা এই অদ্ভুত দর্শন গুয়োর আর গরু প্রদর্শন করতাম। এতে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছিলাম।

আমার বাবা সাদা সিল্কের কাপড়ে নীল ফিতে এঁটে দিতেন। আর যে গরু বা গুয়োরটি শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেতো, তার মাথায় ঐ কাপড়টা পরিয়ে দেওয়া হতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম কোনো গরু বা গুয়োর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু আমার বাবার কাছে এক একটি নীল ফিতেওয়ালা সিল্কের কাপড় ছিল জীবনের আত্ম-অহমিকার প্রতীক। তিনি এগুলো ঘরের মধ্যে রেখে দিতেন। বন্ধু বান্ধব এলে দেখাতেন।

তাহলে, তাহলে কোন সত্যটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। তা হলো—শুয়োরগুলো নীল ফিতে নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করতো না। তবে বাবা সবসময় মাথা ঘামাতেন। এই পুরস্কারগুলো আমার বাবার মনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগিয়ে দিতো।

এই অব্দি পড়ে অনেকে ভাববেন, এটি একধরনের নির্লজ্জ প্রচারমুখীনতা। তবে যদি আমরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের কথা পড়ি, তাহলে বুঝতে পারবো, বড়ো হওয়ার আকাঙ্খা না থাকলে একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জীবন এবং জীবিকা প্রবাহিত হতে পারতো না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি জন্তুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ করার আকাঙ্খা না দেখাতো, তাহলে মানুষ কি বিশ্বের উন্নততম জীবে পরিণত হতে পারতো? তাহলে তো মানুষকে আজও জন্তু ও জানোয়ারের মতো জীবন কাটাতে হতো। এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে পশু শিকার করতে হতো ভাঙা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। বনের ভেতর ফলমূল কুড়িয়ে খেতে হতো।

তাহলে মানবসভ্যতার ইতিহাস আমাদের কোন্ কথাটা শেখাচ্ছে? মানুষ চিরদিনই নিজের আত্মঅহমিকা প্রকাশ করেছে। বড়ো হওয়ার আকাঙ্খাই আজ তাকে মহাপৃথিবীর অবিসংবাদিত সম্রাট করেছে।

এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের তাগিদেই হয়তো অশিক্ষিত মুদির দোকানের এক কেরাণী বই পড়া শুরু করেছিলেন। পিপের মধ্যে কতগুলি আইনের বই ছিল। পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে তিনি ঐ বইগুলি কিনেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বিশ্বের রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসকে নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি হলেন মহান আব্রাহাম লিঙ্কন।

এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অনুভূতি চার্লস ডিকেন্সকে তাঁর অমর উপন্যাসগুলি লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আবার সেই আকাঙ্খা ছিল বলেই স্যার ক্রিস্টোফার রেনক পাথরের মধ্যে দিয়ে সুরসৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই আকাঙ্খাই রকফেলারকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতে সাহায্য করেছিল।

আবার এই আকাঙ্খাই আপনার শহরের সবথেকে ধনী মানুষটিকে আরো বেশি অহঙ্কারী করে তোলে। এই আকাঙ্খা আছে বলেই তিনি বিলাসবহুল একটি প্রাসাদবাড়ি নির্মাণ করেন। সাধারণ শ্রমিককে প্রতি মুহূর্তে বঞ্চিত এবং প্রতারিত করেন।

এই অব্দি পড়ে অবশ্যই আপনার মনের ভেতর দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। আপনি ভাববেন, শ্রেষ্ঠত্ব হওয়ার আকাঙ্খাকে তাহলে কি আমরা পরিহার করবো? এই বোধ আমাদের কতখানি উন্নত করে? নাকি আমাদেরকে লোভী, অবিবেচক ও নৃশংস করে দেয়? আমার মনে হয়। যে কোনো আবেগের ভালো এবং মন্দ দুটি দিক আছে। যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টিতে এই আবেগটিকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো, এই আবেগ না থাকলে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারতো না। অবশ্য এই আবেগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার সৃষ্টি করেছে। মানুষকে অকারণে উচ্চাকাঙ্খী, লোভী, আত্মঅহঙ্কারী করে তুলেছে।

এই আকাঙ্খাই আপনাকে সর্বাধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ পরতে আগ্রহী করে তোলে। এই আকাঙ্খা আছে বলেই আপনি ফ্যাসান অথবা স্টাইল সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। আধুনিকতম মডেলের গাড়ি ড্রাইভ করতে চান। আপনার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়। আপনার ছেলে বা মেয়ে সমাজের একজন কেউকেটা হয়ে উঠবে—আপনি এই ধারণা পোষণ করেন এবং সেই মতো তাদের পরিচালনা করতে শুরু করেন।

আবার এই আকাঙ্খাই বহু ছেলেকে ডাকাত বা বন্দুকবাজের জীবন কাটানোর দিকে আকর্ষণ করে। এই আকাঙ্খা না থাকলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে প্রতি মুহূর্তে এতোগুলি

খুন জখম রাহাজানি ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটতো না।

এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ই পি মালরোনীর বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য। মালরোনী একবার একটি ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন—আজকের দিনের বেশিরভাগ তরুণ অপরাধী অদ্ভুত আত্ম অহমিকাবোধে আচ্ছন্ন। গ্রেপ্তার করার পর তারা একটি মাত্র অনুরোধ করে, তারা বলে, তাদের এইসব অপরাধের ঘটনা সংবাদপত্রের পাতায় যেন ফলাও করে ছাপা হয়।

কিছুদিন বাদে তাদের যে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসতে হবে, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হাতে নিজেদের অপদার্থ জীবন সঁপে দিতে হবে, সকলে তাদের উদ্দেশ্যে সীমাহীন ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করবে, সেইসব কথাগুলো তাদের মনে থাকে না। তারা ভাবে, তাদের ছবি ছাপা হবে মহান ব্যক্তিদের সাথে। বেবরুথ, লাগারডিয়া, আইনস্টাইন, লিন্ডেনবার্গ, টসকানিনি বা রুজভেল্টের পাশাপাশি আমার ছবি? ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই বুকের ভেতর কেমন একটা আলোড়ন।

আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনিও কি বিশিষ্ট হবার জন্যে কম চেষ্টা করেননি? এই ব্যাপারে আপনি আমি সকলে একই নৌকোর যাত্রী।

জন ডি রকফেলারের কথা বলা যাক। তিনি এক অদ্ভুত শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পেয়েছিলেন। দূর ওই চীনের রাজধানী পিকিং শহরের বুকে একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করার জন্য অজস্র ডলার ব্যয় করেছিলেন। এই হাসপাতালটি ছিল লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষদের জন্যে। ঐসব মানুষদের সাথে রকফেলার কোনোদিন দেখা করবেন না। দেখা হবার সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল না।

ডিলিংজার তার শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি পেয়েছিল, প্রথমে ডাকাত পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং শেষ পর্যন্ত ভাড়াটে খুনি হয়ে খুন করা। পুলিশ যখন তার জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন সে মিনেসোটার একটি খামার বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং বলে, আমি ডিলিংজার।

সে ভেবেছিল খামার বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই তার নাম জানে এবং ডিলিংজারকে রাতের অতিথি হিসাবে পেয়ে আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে শুরু করে দেবে। সে যে জনগণের এক নম্বর শত্রু, এই চরম সত্যিটা সবসময় সকলের কাছে জাহির করতো। সে আরো ঘোষণা করতো—আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করবো না। তবে হ্যাঁ, জেনে রাখুন, আমি ডিলিংজার।

ডিলিংজার ও রকফেলারের মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কি? একজন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা হিসাবে সুদূর পিকিং শহরে হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। এটাও তাঁর আত্ম অহমিকাবোধের এক প্রচ্ছন্ন প্রকাশ।

অন্যজন মানবঘাতক খুনী হিসাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছিলেন। হয়তো তাঁর এধরনের আবেগকে আমরা ধ্বংসাত্মক আবেগ বলতে পারি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রকফেলার ও ডিলিংজারের মধ্যে প্রাথমিক কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য একজনের আবেগ লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাহায্য করেছে। তাদের রোগ উপশমের সুযোগ করে দিয়েছে। অন্য জনের অনুভূতি হাজার হাজার মানুষকে আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে।

ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন কাহিনী আছে। যা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, যুগ যুগান্তরে কিছু মানুষ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে কত হাস্যাস্পদ পথের পথিক হয়েছেন।

একবার জন ওয়াশিংটন চেয়েছিলেন, তাঁকে যেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট

হিসাবে ডাকা হয়।

কলম্বাস চেয়েছিলেন, তাঁকে মহা সমুদ্রের অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে সম্বোধন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ক্যাথরিন দি গ্রেটের কথা বলতে পারি। তাঁকে লেখা চিঠির মধ্যে যদি হার ইমপিরিয়াল ম্যাজেস্টি এই শব্দ তিনটি লেখা না থাকতো, তাহলে তিনি কখনো কোনো চিঠি খুলতেন না।

মিসেস লিঙ্কন হোয়াইট হাউসে নানাধরনের অসঙ্গত আচরণ করতেন। একবার তিনি মিসেস গ্রান্টকে দারুণ ভাবে তিরস্কার করেছিলেন। কেননা মিসেস গ্রান্ট মিসেস লিঙ্কনের সামনে বসেছিলেন। তিনি সমবেত সকলের সামনেই বাঘিনীর মতো চিৎকার করে বলেন —আপনার এতো দুঃসাহস। আমি তো আপনাকে এখান বসতে বলিনি, মিসেস গ্রান্ট। আপনি এখনই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যান।

আমাদের দেশের কোটিপতিরা একসময়ে কুমেরু মহাদেশের অভিযান চালাবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার দান করেছিলেন। ভাববেন না, তাঁদের মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্ম হয়েছিল। এই দান করার অন্তরালে একটি লিখিত শর্ত ছিল। তা হলো, কুমেরু মহাদেশে এক একটি পর্বতশিখরের নামকরণ তাঁদের নামেই করতে হবে। ভেবে দেখুন, নিউইয়র্ক ম্যাসাচুসেটসের এক ধনকুবের কোন কুমেরু মহাদেশের বুকে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। আত্ম অহমিকাবোধের কী বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ! ভিক্টর হুগো অবশ্য আরো বেশি উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনের একটি মাত্র ইচ্ছে ছিল, তা হলো, তাঁর নামে প্যারিস শহরের নামকরণ করতে হবে। এমনকি শেক্সপীয়ার, সেই মহাশক্তিশালী লেখকও তাঁর পরিবারের সকলের জন্যে পুরস্কার প্রত্যাশা করতেন।

অনেকে আবার ইচ্ছে করে মানুষের সহানুভূতি কেড়ে নেবার জন্যে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। মিসেস ম্যাকিনলের মধ্যে এই বোধের আশ্চর্য জাগরণ ঘটে গিয়েছিল। তাঁর স্বামী হোয়াইট হাউসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মাঝে মধ্যেই তাঁকে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জন হে-র সাথে বৈঠকে বসতে হতো। অথচ শ্রীমতী ম্যাকিনলের এটা পছন্দসই ছিল না। ম্যাকিনল ভাবতেন, আমার স্বামী কেন সর্বক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকবেন না। আমার দাঁতে ব্যথা হলে তিনি কেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে ছুটে যাবেন না। শনিবার যদি আমি সিনেমা দেখবো বলে বায়না করি, তাহলে কেন আমার স্বামী কাজ দূরে সরিয়ে নিয়ে আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবেন না। মাঝে মধ্যেই তাই তাঁকে উচ্চস্বরে কান্নার অভিনয় করতে হতো। এমনকি অনেক সময় তিনি কল্পিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তিনি ভাবতেন, স্বামী এসে মাথায় জলপট্টি লাগিয়ে দেবেন। অথবা সর্বক্ষণ তাঁর হাতে হাত রেখে বসে থাকবেন।

এভাবেই আমরা অনেক সময় অসুস্থতার ভান করে সকলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে চাই। অবশ্য এর মধ্যে একধরনের ঋণাত্মক ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। যখন আমরা ধনাত্মক ব্যক্তিত্বের দ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না, তখন ইচ্ছে করেই আমাদের এইসব ঋণাত্মক ব্যাপারে মন দিতে হয়।

আমার এক পরিচিতা মেয়ী রবার্টস রাইনহার্টের কথা বলা যাক। তিনি এক চমৎকার সুন্দরী তরুণীর কথা বলেছিলেন। মিসেস রাইনহার্ট বলেন—ঐ মেয়েটির হঠাৎ একদিন অদ্ভুত একটি উপলব্ধি হলো। ও ভেবেছিল, এ জীবনে আমি মনের মতো পাত্র পাবো না। সারাজীবনটা আমাকে এভাবে একা একা কাটাতে হবে। নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে গিয়ে সে ভাবলো, কীভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। সে তাই এক মিথ্যে প্রতারণার আশ্রয়

নিলো। শয্যাশায়িনী হয়ে পড়লো। দশ বছর ধরে তার বৃদ্ধা মা তাকে সেবা করেছিলেন। তার তলা থেকে বারবার তিনি নীচে আসতেন, খাবার আনতেন, জ্বর দেখতেন, মাথায় জল পুলিয়ে দিতেন। অবশেষে এইবার বোধোদয় হলো মেয়েটির। সে বুঝতে পারলো, একটা যদি সে এভাবে বিছানায় শুয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারে ডুবে যাবে। অতএব তাকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হলো। সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেল।

তাহলে রাইন হার্টের এই গল্পটি থেকে আমরা কোন্ সরল সত্যটা জানতে পারলাম? আমরা বুঝতে পারলাম অনেক সময় মানুষ এইভাবে অসুস্থতার ভান করে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এটি করা কখনোই উচিত নয়।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন—যখন মানুষ কঠিন কঠোর বাস্তবের সাথে লড়তে গিয়ে হেরে যায়, তখনই এরা অলীক কল্পজগতের আশ্রয় নেয়। প্রথমে সে অর্ধ উন্মাদ হয়ে। তারপর একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোয় সবথেকে বেশি সংখ্যায় যে রোগীরা ভর্তি হয়ে আছেন, তাঁরা হলেন মানসিক রোগী। অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মিলিত সংখ্যা এদের চেয়ে অনেক কম হবে। এর কারণ কী?

যদি আপনি নিউইয়র্ক রাজ্যের অধিবাসী হন এবং আপনার বয়স পনেরোর বেশি হয়, তাহলে সাবধান! পরিসংখ্যান বলছে, এমন মানুষের শতকরা কুড়িজন শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যান। তাঁদের দিন কাটে কোনো মানসিক আশ্রমে।

এইভাবে পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ কী?

কারোর পক্ষেই এই প্রশ্নের চটজলদি জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করা দরকার। তবে স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনের ভেতর কয়েকটি উত্তর চলে আসে। আমরা জানি কিছু কিছু রোগ, যেমন সিফিলিসের মতো যৌন রোগ, মাথার কোষ ভেঙে নষ্ট করে দিলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। বাস্তবে মানসিক রোগের অর্ধেকই হয় শারীরিক কারণে। মস্তিষ্কের ব্যাপক ক্ষতি, নিয়মিত সুরাপান, টক্সিন অথবা আঘাত জনিত কারণ, কিন্তু বাকি অর্ধেকটা শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে কোনো গলদ থাকে না। অথচ রোগী বা রোগিনী অদ্ভুত আচরণ করতে থাকেন। মৃত্যুর তদন্তের সময় উচ্চক্ষমতার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইসব রোগাক্রান্তদের মস্তিষ্ক ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, ওনাদের মস্তিষ্কের কিলি আপনার আমার মস্তিষ্কের মতোই সজীব ও কর্মক্ষম। তবুও তারা অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ করছেন।

এই রহস্যের কারণ জানতে আমি একবার এক বিখ্যাত উন্মাদ আশ্রমের প্রধান চিকিৎসককে প্রশ্ন করেছিলাম। সেই ভদ্রলোক সারা দেশে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন। এই ব্যাপারে মৌলিক গবেষণা করেছেন। অসংখ্য মানুষকে কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের নিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এবং পরিশ্রমের ফলস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি খোলাখুলি আমাকে বললেন—আপনার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমার জানা নেই। হয়তো আপনি অবাক হচ্ছেন, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বোধহয় কোনো একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। যারা পাগল হয়ে যায়, তারা জানে না এর কারণ কী? তবে একটা ব্যাপার আমি বলতে পারি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছে থেকেই উন্মাদনা জেগে ওঠে। রূঢ় বাস্তবে মানুষ যে প্রাধান্য পায় না, কল্পিত পাগলামিতে সেই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনিয়েছিলেন যেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

বর্তমানে আমার কাছে এমন একজন রোগিনী আছেন, যাঁরা জীবনে বিয়েটা অভিশাপের মতো নেমে এসেছিল। তিনি চেয়েছিলেন অটুট ভালোবাসা, অপরিমাপ্য যৌন আনন্দ, একাধিক সন্তান এবং সামাজিক সম্মান। কিন্তু কঠিন কঠোর বাস্তব তাঁর কবি স্বপ্নকে ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছিল। যে ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্য, সেই স্বামী তাঁকে মোটেই ভালোবাসতেন না। এমনকি তাঁর সাথে একসঙ্গে খেতেও ঐ ভদ্রলোকের আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীকে ওপরে তাঁর নিজের ঘরে খাবার নিয়ে যেতে বাধ্য করতেন। মহিলাটির কোনো সন্তান ছিল না। সামাজিক দিক থেকে সামান্যতম সম্মান ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এসব কাজ করতে হলো।

এর ফলে তিনি ধীরে ধীরে উন্মাদিনী হয়ে গেলেন, কল্পনায় তিনি তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স করলেন। এমনকি কুমারী জীবনের নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, ইংল্যান্ডের এক অভিজাত সমাজে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাই তিনি নিজেকে লেডি স্মিথ বলে ডাকেন।

সন্তানের ব্যাপারেও তিনি একটা অদ্ভুত বিশ্বাসে ভর করেছেন। কল্পনায় তিনি দেখেন, প্রতি রাতেই তিনি নতুন একটি করে সন্তানলাভ করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি আমাকে বলেন, ডাক্তার, গতরাত্রে আমার একটা বাচ্চা হয়েছে জানেন। কী সুন্দর ফুটফুটে দেখতে। আপনি কি একবার ওর সাথে কথা বলবেন?

তাহলে? কী ঘটলো তাঁর ক্ষেত্রে। স্বপ্নের তরী বাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত কোনোদিন এসে দাঁড়ালো না তাঁর মনের আকাশে। তিনি বিচিত্র উন্মাদ জগতটাকেই আঁকড়ে ধরলেন। ভাবলেন, এটাই বোধহয় জীবনের আসল প্রাপ্তি।

এই ঘটনাকে আমরা কী বিয়োগান্ত বলতে পারি? তা কি বলা সম্ভব? তাঁর চিকিৎসক একবার আমাকে বলেছিলেন—আমি চাইলেও হয়তো ওনাকে উন্মাদ অবস্থা থেকে বাস্তব পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না। তবে মাঝে মধ্যে আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, আহা বেচারী, এই পৃথিবীর বুকে এতো দুঃখ কষ্ট। তার মধ্যে এসে উনি মিছিমিছি আবার কেন নিঃসঙ্গতার প্রতীক হবেন। তার চেয়ে এই তো ভালো, এই যে উনি একটা কল্পনার জগত সৃষ্টি করেছেন, এবং তার মধ্যে বেঁচে থেকে আনন্দ লাভ করছেন, আমার কি উচিত সেই আনন্দটাকে নষ্ট করে দেওয়া?

দল হিসাবে থাকলে উন্মাদেরা আপনার বা আমার থেকে অনেক বেশি সুখী। অনেক উন্মাদই এই অবস্থায় আনন্দ উপভোগ করে। করবে নাইবা কেন? এইভাবে তারা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। তারা এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ ডলারের চেক লিখে দেবে। অথবা আগা খানের কাছে একটা পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেবে। তাদের স্বপ্নের জগতে সারারাত শিশিরের টুপটাপ ঝরে পড়া। সেখানে কোনো আহত আর্তনাদ নেই। কোনো অভিমান নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

বোকা মানুষেরা যে প্রাধান্যের অনুভূতির জন্যে পাগল হয়ে যায়, একবার ভেবে দেখুন তো, আমরা যদি সেই মানুষগুলো এই পাগলামির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসা করি, তাহলে কী অলৌকিক ব্যাপারই না ঘটতে পারে।

আমার যতদূর জানা আছে, ইতিহাসে মাত্র দু'জন মানুষ বছরে দশ লক্ষ ডলার মাইনে হিসেবে পেয়েছেন। একজন হলেন ওয়াল্টার ক্রাইসলার এবং অন্যজন চার্লস সোয়াব।

অ্যান্ড্রু কার্নেগী সোয়াবকে বছরে দশ লক্ষ ডলার বা দৈনিক তিন হাজার ডলারের থেকেও বেশি কেন দিয়েছিলেন? এর একটা উত্তর আছে।

সোয়াব কি ছিলেন দারুণ প্রতিভাবান? তা নয়। তবে কি তিনি ইস্পাত তৈরির কাজটা

খুব ভালোভাবে করতে পারতেন? এটাও একটা মিথ্যে কথা।

চার্লস সোয়াব নিজেই আমায় বলেছিলেন, তাঁর কারখানাতে অনেক লোক আছে, যাঁরা ইস্পাত তৈরির ব্যাপারে অনায়াসে তাঁকে হারিয়ে দিতে পারবেন। তবে সোয়াব বলেছিলেন, তাঁকে যে অবিশ্বাস্য মাইনে দেওয়া হতো, শুধু তাঁর চরিত্রের একটি ক্ষমতার জন্যে। তিনি সহজেই যে কোনো শত্রুকে মিত্রতে পরিণত করতে পারতেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর জনসংযোগের রহস্যের আসল চাবিকাঠি কোথায় লুকিয়ে আছে?

তিনি নিজেই এইকথা বলেছিলেন—আমার মনে হয় তাঁর মুখ থেকে ছিটকে আসা এই শব্দগুলো হলো আমাদের জীবনের চিরকালীন সম্পদ। প্রতিটি বাড়ি, বিদ্যালয়, দোকান বা দেশের কর্মস্থলে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে তার ওপর টাঙিয়ে রাখা উচিত। শিশুরা ল্যাটিন ব্যাকরণের কথা শিখতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করে। ব্রাজিলে বার্ষিক কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। অথচ আমার মনে হয় এই কথাগুলো তাদের আগে শেখা উচিত। শুধু শেখা নয়, মনের ভেতর গেঁথে রাখা উচিত। এই কথাগুলো শুধু মেনে চলতে পারলে আমার বা আপনার জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাবে।

উনি বলেছিলেন—আমি মনে করি, মানুষের মনে উৎসাহ জাগিয়ে তোলাটাই হলো একজনের সবথেকে বড়ো ক্ষমতা। এটাই আমার সমস্ত ক্ষমতার গোড়ার কথা। আমি আরো মনে করি, কোনো মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের উন্মোচন ঘটানোর শ্রেষ্ঠ পথ হলো, সবসময় তাকে প্রশংসা করা এবং উৎসাহ দেওয়া।

ওপরওয়ালার কাছ থেকে সমালোচনার মতো আর কোনো কিছুই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষতি করতে পারে না। আমি সেইজন্য কাউকে সমালোচনা করি না। আমি সবসময় একজন মানুষকে উৎসাহ দিই। এতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তাই প্রশংসা করতেই ভালোবাসি। অন্যের দোষ খুঁজে নিতে আমি ঘৃণা করি। আমি যেটা সবথেকে বেশি পছন্দ করি তা হলো, সকাল থেকে রাত অব্দি যে কাজ আমি করবো তাতে আনন্দ পাবো। আর যখন প্রশংসা করবো, তখন দরাজ ভাবেই তা বিতরণ করবো। আগে বা পরে কী হতে পারে তা চিন্তা করবো না। সোয়াব ঠিক এটাই করতেন। কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ মানুষ কী করে? তারা ঠিক এর উল্টো করে। তারা সবসময় বেজার মুখে কাজ করে। প্রতি মুহূর্তে ভাবে এই কাজের জন্য আরো বেশি ডলার তাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মালিক বেটা কঞ্জুস। [illegible] ইচ্ছে করে তাদের খাটিয়ে মারছে। তারা সহজে কাউকে প্রশংসা করে না। প্রশংসার বিষয়বস্তু থাকলেও তারা মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে। ভাবে, আমার প্রশংসায় লোকটা যদি আর একটু উন্নত হয় তাহলে আমি মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়বো।

সোয়াব আরো বলেছিলেন—আমি এ জীবনে অনেক মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি বলতে চাই, এমন একজনেও মানুষ আমি দেখিনি, যিনি প্রশংসা শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকেন না তিনি সমালোচনায় রেগে যান না। তাহলে তিনি তো ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হয়ে যাবেন।

সোয়াব আরো জানিয়েছিলেন, অ্যান্ড্রু কার্নেগীর ঘটনাবহুল সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই ধ্যানধারণার মধ্যে। কার্নেগী তাঁর সহকর্মীদের খোলাখুলিভাবে প্রশংসা করতেন শুধু সামনে নয়, আড়ালেও। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বাচ বিচার ছিল না। কোম্পানীতে সব থেকে বেশি মাইনেতে যিনি চাকরি করেন, তাঁর যিনি ঘর পরিষ্কার করেন—দু'জনকেই 'কার্নেগী' একই রকম চোখে দেখতেন।

বর্তমানে আমার কাছে এমন একজন রোগিনী আছেন, যাঁরা জীবনে বিয়েটা অভিশাপের মতো নেমে এসেছিল। তিনি চেয়েছিলেন অটুট ভালোবাসা, অপরিমাপ্য যৌন আনন্দ, একাধিক সন্তান এবং সামাজিক সম্মান। কিন্তু কঠিন কঠোর বাস্তব তাঁর কবি স্বপ্নকে ভেঙে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছিল। যে ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্য, সেই স্বামী তাঁকে মোটেই ভালোবাসতেন না। এমনকি তাঁর সাথে একসঙ্গে খেতেও ঐ ভদ্রলোকের আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীকে ওপরে তাঁর নিজের ঘরে খাবার নিয়ে যেতে বাধ্য করতেন। মহিলাটির কোনো সন্তান ছিল না। সামাজিক দিক থেকে সামান্যতম সম্মান ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এসব কাজ করতে হলো।

এর ফলে তিনি ধীরে ধীরে উন্মাদিনী হয়ে গেলেন, কল্পনায় তিনি তাঁর স্বামীকে ডিভোর্স করলেন। এমনকি কুমারী জীবনের নাম গ্রহণ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, ইংল্যান্ডের এক অভিজাত সমাজে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাই তিনি নিজেকে লেডি স্মিথ বলে ডাকেন।

সন্তানের ব্যাপারেও তিনি একটা অদ্ভুত বিশ্বাসে ভর করেছেন। কল্পনায় তিনি দেখেন, প্রতি রাতেই তিনি নতুন একটি করে সন্তানলাভ করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি আমাকে বলেন, ডাক্তার, গতরাত্রে আমার একটা বাচ্চা হয়েছে জানেন। কী সুন্দর ফুটফুটে দেখতে। আপনি কি একবার ওর সাথে কথা বলবেন?

তাহলে? কী ঘটলো ওঁর ক্ষেত্রে। স্বপ্নের তরী বাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত কোনোদিন এসে দাঁড়ালো না তাঁর মনের আকাশে। তিনি বিচিত্র উন্মাদ জগতটাকেই আঁকড়ে ধরলেন। ভাবলেন, এটাই বোধহয় জীবনের আসল প্রাপ্তি।

এই ঘটনাকে আমরা কী বিষাদঘন বলতে পারি? তা কি বলা সম্ভব? তাঁর চিকিৎসক একবার আমাকে বলেছিলেন—আমি চাইলেও হয়তো ওনাকে উন্মাদ অবস্থা থেকে বাস্তব পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না। তবে মাঝে মধ্যে আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, আহা বেচারী, এই পৃথিবীর বুকে এতো দুঃখ কষ্ট। তার মধ্যে এসে উনি মিছিমিছি আবার কেন নিঃসঙ্গতার প্রতীক হবেন। তার চেয়ে এই তো ভালো, এই যে উনি একটা কল্পনার জগত সৃষ্টি করেছেন, এবং তার মধ্যে বেঁচে থেকে আনন্দ লাভ করছেন, আমার কি উচিত সেই আনন্দটাকে নষ্ট করে দেওয়া?

দল হিসাবে থাকলে উন্মাদেরা আপনার বা আমার থেকে অনেক বেশি সুখী। অনেক উন্মাদই এই অবস্থায় আনন্দ উপভোগ করে। করবে নাইবা কেন? এইভাবে তারা তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে। তারা এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ ডলারের চেক লিখে দেবে। অথবা আগা খাঁয়ের কাছে একটা পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দেবে। তাদের স্বপ্নের জগতে সারারাত শিশিরের টুপটাপ ঝরে পড়া। সেখানে কোনো আহত আর্তনাদ নেই। কোনো অভিমান নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

বোকা মানুষেরা যে প্রাধান্যের অনুভূতির জন্যে পাগল হয়ে যায়, একবার ভেবে দেখুন তো, আমরা যদি সেই মানুষদের এই পাগলামির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসা করি, তাহলে কী অলৌকিক ব্যাপারই না ঘটতে পারে।

আমার যতদূর জানা আছে, ইতিহাসে মাত্র দু'জন মানুষ বছরে দশ লক্ষ ডলার মাইনে হিসেবে পেয়েছেন। একজন হলেন ওয়াল্টার ক্রাইসলার এবং অন্যজন চার্লস সোয়াব।

অ্যান্ড্রু কার্নেগী সোয়াবকে বছরে দশ লক্ষ ডলার বা দৈনিক তিন হাজার ডলারের থেকেও বেশি কেন দিয়েছিলেন? এর একটা উত্তর আছে।

সোয়াব কি ছিলেন দারুণ প্রতিভাবান? তা নয়। তবে কি তিনি ইস্পাত তৈরির কাজটা

খুব ভালোভাবে করতে পারতেন? এটাও একটা মিথ্যে কথা।

চার্লস সোয়াব নিজেই আমায় বলেছিলেন, তাঁর কারখানাতে অনেক লোক আছে, যাঁরা ইস্পাত তৈরির ব্যাপারে অনায়াসে তাঁকে হারিয়ে দিতে পারবেন। তবে সোয়াব বলেছিলেন, তাঁকে যে অবিশ্বাস্য মাইনে দেওয়া হতো, শুধু তাঁর চরিত্রের একটি ক্ষমতার জন্যে। তিনি সহজেই যে কোনো শত্রুকে মিত্রতে পরিণত করতে পারতেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর জনসংযোগের রহস্যের আসল চাবিকাঠি কোথায় লুকিয়ে আছে?

তিনি নিজেই এইকথা বলেছিলেন—আমার মনে হয় তাঁর মুখ থেকে ছিটকে আসা এই শব্দগুলো হলো আমাদের জীবনের চিরকালীন সম্পদ। প্রতিটি বাড়ি, বিদ্যালয়, দোকান বা দেশের কর্মস্থলে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে তার ওপর টাঙিয়ে রাখা উচিত। শিশুরা ল্যাটিন ব্যাকরণের কথা শিখতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট করে। ব্রাজিলে বার্ষিক কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। অথচ আমার মনে হয় এই কথাগুলো তাদের আগে শেখা উচিত। শুধু শেখা নয়, মনের ভেতর গেঁথে রাখা উচিত। এই কথাগুলো শুধু মেনে চলতে পারলে আমার বা আপনার জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাবে।

উনি বলেছিলেন—আমি মনে করি, মানুষের মনে উৎসাহ জাগিয়ে তোলাটাই হলো একজনের সবথেকে বড়ো ক্ষমতা। এটাই আমার সমস্ত ক্ষমতার গোড়ার কথা। আমি আরো মনে করি, কোনো মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের উন্মোচন ঘটানোর শ্রেষ্ঠ পথ হলো, সবসময় তাকে প্রশংসা করা এবং উৎসাহ দেওয়া।

ওপরওয়ালার কাছ থেকে সমালোচনার মতো আর কোনো কিছুই মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষতি করতে পারে না। আমি সেইজন্য কাউকে সমালোচনা করি না। আমি সবসময় একজন মানুষকে উৎসাহ দিই। এতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি তাই প্রশংসা করতেই ভালোবাসি। অন্যের দোষ খুঁজে নিতে আমি ঘৃণা করি। আমি যেটা সবথেকে বেশি পছন্দ করি তা হলো, সকাল থেকে রাত অব্দি যে কাজ আমি করবো তাতে আনন্দ পাবো। আর যখন প্রশংসা করবো, তখন দরাজ ভাবেই তা বিতরণ করবো। আগে বা পরে কী হতে পারে তা চিন্তা করবো না। সোয়াব ঠিক এটাই করতেন। কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ মানুষ কী করে? তারা ঠিক এর উল্টো করে। তারা সবসময় বেজার মুখে কাজ করে। প্রতি মুহূর্তে ভাবে এই কাজের জন্য আরো বেশি ডলার তাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মালিক বেটা কঞ্জুস। সরকার ইচ্ছে করে তাদের খাটিয়ে মারছে। তারা সহজে কাউকে প্রশংসা করে না। প্রশংসার বিষয়বস্তু থাকলেও তারা মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে। ভাবে, আমার প্রশংসায় লোকটা যদি আর একটু উন্নত হয় তাহলে আমি মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়বো।

সোয়াব আরো বলেছিলেন—আমি এ জীবনে অনেক মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে মেলামেশা করেছি। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি বলতে চাই, এমন একজনও মানুষ আমি দেখিনি, যিনি প্রশংসা শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকেন না তিনি সমালোচনায় রেগে যান না। তাহলে তিনি তো ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে যাবেন।

সোয়াব আরো জানিয়েছিলেন, অ্যান্ড্রু কার্নেগীর ঘটনাবহুল সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই ধ্যানধারণার মধ্যে। কার্নেগী তাঁর সহকর্মীদের খোলাখুলিভাবে প্রশংসা করতেন শুধু সামনে নয়, আড়ালেও। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বাচ বিচার ছিল না। কোম্পানীতে যিনি সবথেকে বেশি মাইনেতে যিনি চাকরি করেন, তাঁর যিনি ঘর পরিষ্কার করেন—দু'জনকেই 'কার্নেগী' একই রকম চোখে দেখতেন।

এছাড়া কার্নেগী সহকর্মীদের প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন একটি সমাধিপ্রস্তরের মধ্যে দিয়ে। তিনি নিজে একটি সমাধিফলক লিখেছিলেন। এই ফলকের ওপর নিচের কথাগুলি খোদাই করা ছিল—এখানে এমন একজন শায়িত আছেন, যিনি তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারতেন।

শুধু এই ক'টি শব্দের মাধ্যমে কার্নেগী তাঁর মনোভাবের পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। রকফেলারকেও আমরা একজন সার্থক জনসংযোগী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। তিনি জীবনে অসাধারণ উন্নতি করেছিলেন। তাঁর সাফল্যের অন্যতম রহস্য ছিল আন্তরিকভাবে প্রশংসা করা। এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি উদাহরণ সাজিয়ে দিতে পারি। একবার তিনি তাঁর একজন অংশীদার এডওয়ার্ড টি বেডফোর্ডের সাথে ব্যবসাতে মেতে উঠেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তারা বেশ কিছু টাকা লগ্নী করেন। এতে প্রায় দশ লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়েছিল। ইচ্ছে করলে রকফেলার দারুণভাবে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানতেন, বেডফোর্ডকে কোনো ভাবেই দোষারোপ করা সম্ভব নয়। কেননা বেডফোর্ড সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। ব্যবসায়ে সবসময়ে আমরা সফল হই না। এখানে ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার থাকে। তাই তিনি এখানেই ব্যাপারটি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

রকফেলার প্রশংসা করার একটা পথ পেয়ে গেলেন। তিনি বেডফোর্ডকে প্রশংসা করলেন এই বলে, উনি ছিলেন বলেই শতকরা ষাট ভাগ তাঁর বাঁচাতে পেরেছেন। রকফেলার বলেছিলেন, একাজ সত্যিই দারুণ, উঁচু তলার মানুষও সহজে এই কাজ করতে পারে না।

জিকফিল ছিলেন ব্রডওয়েতে। তাঁকে আমরা বিনোদন জগতের অন্যতম নক্ষত্র বলে থাকি। তিনি প্রমোদ সংগঠক হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকান মেয়েদের গৌরবান্বিত করে তোলার কাজে তিনি একটা অদ্ভুত সূক্ষ্ম ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এই কাজটা করতেন সুচারু ভাবে। যে মেয়েটির দিকে কেউ দু'বার ফিরে তাকাবে না তাকে তিনি রহস্যময়ী আর লাবণ্যময়ী করে গড়ে তুলতেন। মেয়েটির মনের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ ভরে দিতেন। তিনি জানতেন, আত্মবিশ্বাসের থেকে বড়ো সাহস আর কিছু হতে পারে না।

এইভাবে তিনি অনেক মেয়েকে বিশ্বসুন্দরীর আসরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যখন একটি মেয়ের সাথে মিশতেন, প্রথমেই বলতেন, আহা, তোমার মধ্যে কী আছে, তুমি তা জানো না। এসো, আমি সেই গোপন খবরটা তোমাকে শুনিয়ে দেবো।

এছাড়া তিনি ছিলেন বাস্তববোধের মানুষ। কোরাস মেয়েদের মাইনে মাসে তিরিশ ডলারের বদলে একশো পঁচাত্তর ডলারে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি একটা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতেন, তা হলো, পেটে খিদে থাকলে কোনো মানুষ কাজে সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন খুব চমৎকার। অনুষ্ঠান রাতে উদ্বোধনের সময় প্রতিটি অংশগ্রহণকারিণীকে টেলিগ্রামে শুভেচ্ছা জানাতেন। প্রতিটি মেয়েকে একটি করে রক্তগোলাপ উপহার দিতেন। কোনো প্রশাসক এইভাবে যে তাদের সাথে কথা বলছে, মেয়েদের কাছে এটাই ছিল স্বপ্নের বিষয়। তারাও প্রাণপণ চেষ্টা করতো, কিভাবে তার সম্মান বজায় রাখা যেতে পারে।

আমার একবার অদ্ভুত একটা পাগলামি হয়েছিল। আমি ছ'রাত-ছ'দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম, ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন ছিল না। দেখলাম, দু'দিনের পর আমি যতখানি ক্ষুধার্ত, হয়েছি পরে ততখানি হইনি। তা সত্ত্বেও আমি জানি, কোনো মানুষকে পরপর ছ'দিন অনাহারে রাখাটা উচিত নয়। কোনো মালিক যদি ভাবেন কর্মচারীদের তিনি ছ'দিন

না খাইয়ে রেখে দেবেন তাহলে গর্হিত কাজ করবেন। আবার, যে মানুষ ছ'দিন কাউকে অনাহারে রাখতে চায় না, সেও অন্য কাউকে প্রশংসা করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে। দু-সপ্তাহ বা ষাট বছরেও সে প্রশংসা করতে চাইবে না।

অ্যালফ্রেড লান্স ছিলেন এক বিশিষ্ট অভিনেতা। তিনি রিইউনিয়ন ইন ভিয়েনাতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি বলেছেন—আমি যা সবথেকে বেশি চাই, তা হলো আমার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্যে কিছু নির্ভেজাল প্রশংসা।

আমরা সবসময় আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য অথবা তাদের বন্ধুবান্ধবদের জন্য খাদ্যাদ্যির ব্যবস্থা করি। কিন্তু কখনো তাদের আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করি না। আমরা ভাবি, মাংস আর আলু খেলেই তাদের শক্তি বাড়বে। কিন্তু আমরা কখনো প্রশংসার বাণী শুনিয়ে তাদের মানসিক ক্ষমতাকে আকাশচুম্বী করি না। আমরা কেন এই সরল সত্যটা বুঝতে পারি না যে প্রশংসা তাদের মনে প্রভাত সঙ্গীতের মতো চির জাগরূক হয়ে থাকতে পারবে। ভিটামিন খেলেও তার যে শক্তি বাড়ে না, প্রশংসা তাদের সেই আত্মশক্তি দেবে।

কোনো কোনো পাঠক বোধহয় এই পর্যন্ত পড়ে একটা মন্তব্য করে বসবেন—পুরোনো বক্তাকন্দী কথা। একরকম বাজে তোষামোদ ছাড়া আর কিছু নয়। এসব জিনিস আমরা জানি। এতে আপনার নতুনত্ব কী আছে? বুদ্ধিমান পাঠকদের অত সহজে বোকা বানাতে পারবেন না।

আপনার কথা ঠিক। তোষামোদে বুদ্ধিমান মানুষেরা কদাচিৎ ভোলেন। তোষামোদ হলো স্বার্থপরতায় মাখা এবং কপটতায় ভরা কিছু আচরণ। তোষামোদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় এবং তা হওয়ারই কথা। তবে একথা সত্যি, কিছু কিছু মানুষ প্রশংসা বাক্য শোনার জন্যে এতো আগ্রহান্বিত হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে প্রশংসা বাক্য বললে তাঁরা গলে জল হয়ে যান। ঠিক যেমন ভাবে অনাহারে আক্রান্ত মানুষ হাঁস বা কুচোমাছের ঝোল গিলে ফেলে, তেমনটি আর কী।

এখানেও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি বহু বিবাহকারী ডিভানি ভাইদের কথাই বলছি। ডিভানি ভাইরা বিয়ের বাজারে গিয়ে নিজেদের জাহির করতো। তারা আকাশের জ্বলজ্বলে তারার মতো উজ্জ্বল ছিল। সেই রাজপুত্ররা কেমন ভাবে দুই অপরূপ সুন্দরীর একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী, একজন বিখ্যাত অপেরা গায়িকা এবং লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বারবার হার্টনকে বিয়ে করেছিল, তা ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী করে তারা এই আপাত অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছিল?

লিবার্টি নামে একটি কাগজে অ্যাডেলা রুডার সেন্টন লিখেছিলেন—মেয়েদের কাছে ডিভানিদের আকর্ষণের ব্যাপার যুগ যুগ ধরিতে থাকা রহস্যের অঙ্গ।

তিনি আরো বলেছিলেন—বিখ্যাত পোলানেগ্রি পুরুষ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর বিখ্যাত শিল্পী একবার ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওরা তোষামোদের ব্যাপারটা খুব ভালো ভাবেই বোঝে। ওরা এতো সুন্দরভাবে প্রশংসা করতে শুরু করে যে সমস্ত আয় অহঙ্কার গলে জল হয়ে যায়। আমরা একবারও ভেবে দেখি না, এটি সম্পূর্ণ বাজে বকবকানি। মুহূর্তের মধ্যে মনে হয়, ওরা বুঝি সত্যি সত্যি আকাশ থেকে খসে পড়া দুটি দেবদূত। ওদের সাথে বিয়ে হলে আমরা জীবনের সমস্ত আনন্দকে মুঠোবন্দী করতে পারবো। বিনোদনের জগতে ভাসতে পারবো। জীবনে কখনো দুঃখের কালরাত্রির সামনে দাঁড়াতে হবে না।

এভাবেই ডিভানি ভাইরা নানাভাবে মেয়েদের আকর্ষণ করতো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসাতো।

মহারানী ভিক্টোরিয়াও প্রশংসা বাক্য শুনতে ভালোবাসতেন। ডিজরেলি স্বীকার করেছেন—রানীর সাথে কাজকর্ম করার সময় তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রানীকে প্রশংসা করতেন এবং দেখতেন রানী কেমন গলগল চিত্ত হয়ে উঠছেন।

ডিজরেলির নিজের ভাষায় ব্যাপারটা ছিল এইরকম—আমি রানীর সমস্ত অঙ্গে খুব সাবধানে তোষামোদের প্রলেপ লাগাতাম।

এটা আমরা সকলে জানি, ডিজরেলি ছিলেন বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে দক্ষ শাসক। তাঁকে আমরা ধুরন্ধর এক নিখুঁত মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। নিজের জগতে তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাঁর পক্ষে যে কাজটা করা অত্যন্ত সহজ ছিল সেটা আমি বা আপনি করতেই পারবো না। যদি জোর করে করার চেষ্টা করি, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে প্রশংসা করতে গেলে তিনি আমাদের ওপর রুষ্ট হবেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো কঠিন শাস্তি দেবেন।

সেক্ষেত্রে কী প্রমাণিত হচ্ছে? এই কথা কি প্রমাণিত হচ্ছে না, অপাত্রে তোষামোদ দান করলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে যায়? তোষামোদ হলো অনেকটা জাল টাকার মতো। জাল টাকার মতো যদি সেটাকে আপনি সর্বত্র চালাতে চান, তাহলে শেষ পর্যন্ত বিপদ হবে।

প্রশংসা এবং তোষামোদের মধ্যে কোনো তফাত আছে কি? খুবই সহজে এই তফাতটা বোঝা যায়। একটি হলো আন্তরিক এবং অন্যটি হলো কপটতা মাখানো। একটির উৎপত্তি হৃদয়ের অন্তর্মহল থেকে। অন্যটি সম্পূর্ণ বানানো। একটির মধ্যে স্বার্থপরতার কোনো চিহ্ন নেই। অন্যটির সর্বাঙ্গে স্বার্থপরতা জড়ানো আছে। একটিকে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রশংসা করে এবং অন্যটিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ঘৃণা করে।

তাহলে? প্রশংসা এবং তোষামোদের পার্থক্যটা বোঝা গেল কি?

আমি কিছুদিন আগে মেক্সিকো সিটিতে গিয়েছিলাম। সেখানকার ক্যাপুসটেকেকের প্রাসাদে জেনারেল ওয়েগনের একটি আবক্ষ মূর্তি দেখে এসেছিলাম, মূর্তির নীচে তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে কয়েকটি কথা লেখা হয়েছিল।

সেখানে খোদাই করা আছে—যে শত্রু আপনাকে আক্রমণ করছে তাকে ভয় পাবেন না। কিন্তু যে বন্ধুরা আপনাকে অকারণে তোষামোদ করছে তাদের থেকে দূরে থাকবেন।

আমি কখনো তোষামোদের হয়ে ওকালতি করছি না। এর ধারে কাছেও আমি যাচ্ছি না। আমি একটি নতুন জীবনপ্রবাহের কথা বারবার বলতে চাইছি। আমাকে আবার বলতে দিন—নতুন একটি জীবন প্রবাহ।

রাজা পঞ্চম জর্জের নাম তো আপনারা সকলেই জানেন। তিনি বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁর স্টাডি রুমে ছ'টি নীতিবাক্য টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল এইরকম। সস্তা তোষামোদ করতে বা পেতে যেন শিক্ষা না পাই।

এটিই হলো আসল কথা। তোষামোদ একধরনের সস্তা প্রশংসা। একবার তোষামোদের একটা অদ্ভুত অর্থ শুনেছিলাম—সেটা এখানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। তোষামোদ হলো লোকটি আসলে নিজের সম্পর্কে কিভাবে সেটাই বলে দেওয়া।

আমরা যদি সবাই তোষামোদ করতে চাইতাম, তাহলে সবাই সেটা গ্রহণ করে কাজ করতো, আমরাও তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতাম। আমরা যখন কোনো বিশেষ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না, তখন আমরা আমাদের ভাবনার পঁচানব্বই শতাংশ নিজের সম্পর্কে ভেবে কাটাই। এখন যদি আমরা কিছুদিনের জন্যে নিজের সম্পর্কে ভাবনা বন্ধ করি, আর অন্য সকলের ভালো করবো কিভাবে সেকথা চিন্তা করি, তাহলে হয়তো আমরা আর ঐ নিখো তোষামোদকে রপ্ত করবো না। কেননা, তখন আমরা আরো পরিশীলিত

হয়ে উঠবো। তখন এই সরল সত্যটা আমরা বুঝতে পারবো, তা হলো, মিথ্যে তোষামোদের মাধ্যমে হয়তো মাধ্যমিক আনন্দ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু চিরকালীন সফলতা অর্জন করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে এমারসনের কথা বলা যাক। এমারসন বলেছিলেন—যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে, তারা সবাই কোনো না কোনো ভাবে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ, আপনি সবসময় একথাই মনে করি, এবং এভাবেই তাদের সাথে মেলামেশা করি।

এই কথাটা যদি এমারসনের ক্ষেত্রে সত্য হয়, তাহলে আপনার আমার ক্ষেত্রে কেন সত্য হবে না। বরং বলা উচিত, এমারসনের ক্ষেত্রে যতটা সত্যি, আপনার আমার ক্ষেত্রে তা হাজার গুণ বেশি সত্যি হয়ে উঠবে।

আসুন, এবার আমরা আমাদের কর্ম এবং চাহিদা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বন্ধ করি। অন্যসকলের সদ্‌গুণ নিয়ে আলোচনা করি। তোষামোদের ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে যাই। আন্তরিকভাবে প্রশংসা করতে শিখি।

অন্যকে সমর্থনের বেলায় হাসি মুখে তা করি। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত শব্দের মালা তার গলায় পরিয়ে দিই। তাহলেই দেখা যাবে, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আপনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছেন। এবং এর ফলে আপনার জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বী হচ্ছে। আপনি নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসাবে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন।

তিন

অন্যকে চলার পথে সাথী করতে হবে—
তা না হলে এজীবনে আপনাকে একলা পথ চলতে হবে

শিরোনামটা শুনে খুব অবাক লাগছে কি? সত্যি, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এই পৃথিবীতে মানুষ একা একা পথ চলতে পারেনা। তাই জীবনের চলার পথে অন্যকে সঙ্গী করতেই হবে।

প্রতিটি গ্রীষ্মকালে আমি মেইনে মাছ ধরতে যাই। আমি স্ট্রবেরি এবং ক্রীম খুব ভালোবাসি। আবার মাছেরা পোকামাকড় পছন্দ করে। তার মানে? আমি যখন মাছ ধরতে যাই, তখন কি আমি সঙ্গে করে স্ট্রবেরি আর ক্রীম নিয়ে যাই। প্রশ্নটা কি খুব বোকার মতো হয়ে গেল?

আমি কিন্তু মাছেরা যা ভালোবাসে সেটাই নিয়ে যাই। বড়শিতে আমি স্ট্রবেরি বা ক্রীম আটকাই না। আমি পোকামাকড় বা ফড়িং লাগিয়ে রাখি। অদৃশ্য মাছেদের উদ্দেশ্য করে বলি, কীরে, খাবারটা তোদের পছন্দসই হয়েছে তো?

অপাত ছোট্ট একটি ঘটনা। কিন্তু এর মধ্যে জীবনের আসল নির্যাস লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ যে মানুষের সাথে আমি কথা বলবো, তার মতো করে নিজেকে তৈরি করতে হবে।

মানুষ গাঁথতে গিয়ে আমরা এই পদ্ধতিটাকেই প্রয়োগ করবো।

লয়েড জর্জ ঠিক এমনটি করেছিলেন, তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, যুদ্ধের সময় উইলসন, অরল্যাণ্ডো এবং ক্লিমেনসোর মতো নেতারা যখন বিস্মৃত এবং ক্ষমতাচ্যুত হন, তখন তিনি কীভাবে এতোদিন ধরে ক্ষমতার শীর্ষে আসীন থেকেছেন?

উনি একটা ভারী সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, আমার ক্ষমতার শীর্ষে বিচরণ করার একটিই মাত্র কারণ আছে। তা হলো, আমি বুঝেছি, মাছ বুঝে চাড় ফেলতে

হবে।

এই চাড় ফেলাটাই হলো আসল কথা। পোনামাছ যে চাড় পছন্দ করে, স্যালমন মাছ আবার তা দেখলে দূরে পালিয়ে যাবে।

আমরা আবার আসল বিষয়বস্তুতে চলে আসি। আপাতত মনে হতে পারে, এটা ছেলেমানুষীর অবাস্তব কাজ। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা ছেলেমানুষী আছে। আপনি যা করতে চাইছেন, তাতে আপনার আগ্রহ থাকা উচিত। বাকি সকলেই যে আপনার মতো একই বিষয়ে আগ্রহী হবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। কেউ গান গাইতে ভালোবাসে। কেউ গান শুনতে চায় না। কেউ কবিতা লেখাকে জীবনের একমাত্র সম্পদ হিসাবে মনে করে। কারো কাছে কবিতা হলো বাজে অর্থের কচকচানি। এমন ভাবেই প্রতিটি মানুষের এক-একটি বিষয়ের ওপর আগ্রহ আছে এবং আপনার উচিত তার সেই আগ্রহ সম্পর্কে কথা বলা।

যে যা চাইছে, সেই বিষয়ে কথা বললে আপনি অচিরেই তার হৃদয় দখল করতে পারবেন।

ভবিষ্যতে যদি আপনি কাউকে দিয়ে কোনো আপাত দুরূহ কাজ করিয়ে নিতে চান, তাহলেও এই আপ্তবাক্যটা মনে রাখতে হবে।

মনে করা যাক, আপনার ছেলে ধূমপান করছে। ব্যাপারটা আপনার মোটেই পছন্দ নয়। এক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? আপনি ছেলেকে কখনো উপদেশ দেবেন না। আপনি যা চাইছেন তা পরিষ্কার করে বলবেন না। আপনি শুধু বলবেন, সিগারেট খেলে আপনার ছেলে কোনোদিন বেস বল দলে ঢুকতে পারবে না। একশো গজ দৌড়ে বিজয়ী হতে পারবে না।

এভাবেই আপনি আপনার আসল ঈপ্সিত বস্তুটি পেয়ে যাবেন। দেখবেন, ছেলে আর সিগারেট খাচ্ছে না। কেননা মনে মনে সে বেস বল দলে ঢোকার জন্যে ছটফট করছিল। এই ঘটনাটা আপনার ছোটো ছেলেমেয়ে অথবা শিক্ষার্থী সকলের ওপরেই প্রয়োগ করা চলতে পারে।

আসুন, আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রাফেল ওয়ালডো এমারসনের নাম মনে আছে তো? একদিন তিনি এবং তাঁর ছেলে একটি বাছুরকে খোঁয়াড়ে ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা কিছুতেই পারছিলেন না। এটি একটি সাধারণ কাজ। কিন্তু ঠিকমত কৌশল না করলে এঁড়ে বাছুর দৌড়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে।

তাঁরা নিজেরা যা চান তাই করছিলেন। এমারসন বাছুরটাকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। সেই ছেলেটিও জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল। বাছুরটাও নিজে যা চায় তাই করতে থাকলো। সে পা শক্ত করে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রইলো। সে কিছুতেই তার আগের জায়গাটা ছাড়বে না।

বাড়ির আইরিস পরিচারিকা দূর থেকে এই ঝামেলা লক্ষ্য করছিল। পরিচারিকার প্রবন্ধ বা বই লেখার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বাছুরকে কীভাবে খোঁয়াড়ে ঢোকাতে হয়, সেই বিদ্যেটা সে ভালোভাবেই রপ্ত করেছিল। আবার এমারসনের এই বুদ্ধি ছিল না। পরিচারিকা বাছুরের মনোভাব বুঝতে পারলো। সে তার আঙুলটা মাতৃস্নেহে বাছুরের মুখে ঢুকিয়ে দিলো আর বাছুর সেটা চুষতে শুরু করলো। বাছুর ভুলেই গেল, তাকে জোর করে খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সে সুড়সুড় করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণবাদে নিজেকে খোঁয়াড়ে বন্দী অবস্থায় দেখলো।

এই ছোট্ট উদাহরণ থেকে আমরা কোন্ সিদ্ধান্ত নিতে পারি? আমরা কি বলতে পারি না, আপাতদৃষ্টিতে তেতো ওষুধকে চিনির আস্তরণে ডুবিয়ে খেতে হয়? তাহলে মন আর

বিরক্ত হয়ে ওঠে না।

জন্মের পর থেকে আপনি যা কিছু করে আসছেন তার অন্তরালে কোন্ ক্রিয়াটি সব থেকে বেশি শক্তিশালী? তা হলো, আপনি যেটা করতে চাইছেন।

কোনোদিন হয়তো আপনি রেডক্রশের তহবিলে একশো ডলার দান করেছিলেন? এটিকেও আমরা নিয়মের এক ব্যতিক্রম বলছি না। কেননা আপনি রেডক্রশকে দান করার জন্যে সত্যি সত্যি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো এই আগ্রহের অন্তরালে কোনো একটি দুরন্ত আবেগ কাজ করছিল। আপনি দান করে ঋণমুক্ত হতে চেয়েছিলেন। পাপের বোঝা কিছুটা হালকা করতে চেয়েছিলেন, জনসাধারণের কাছে উদার হিসাবে নিজকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, স্ত্রী, পুত্র-পরিবারের কাছে নিজেকে মহিমান্বিত হিসাবে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। অথবা আপনি নিজেই ভাবতে চেয়েছিলেন, এভাবে আমি একটা স্বার্থপরতাহীন কাজ করছি।

একশো ডলার দান করার অন্তরালে এতোগুলি কারণ ছিল। যদি কোনো একটি কারণ শক্তিশালী না হতো তাহলে কিছুতেই আপনি একশো ডলার হাতছাড়া করতেন না। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে চক্ষু লজ্জাতেও আপনি এই দান করে থাকতে পারেন। কোনো সুন্দরী তরুণী হাত পেতে কুপন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তার হাতে টাকা দিয়েছেন, এমনটিও হতে পারে। অথবা আপনার কোনো শাঁসালো মক্কেলকে খুশী করার জন্যে আপনি একশো ডলার দান করতে পারেন। তার মানে, আসল অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি দান করেছেন, কেননা এটা আপনি আন্তরিকভাবে করতে চেয়েছিলেন।

প্রফেসার হ্যারি এ ওভারস্টিট এই সম্পর্কে একটা ভারী সুন্দর বই লিখেছেন। তার "ইনফ্লুয়েন্সিং হিউম্যান বিহেভিয়ার" বইতে তিনি লিখেছেন—আমাদের কাজের উৎপত্তি হলো, আমরা যেটা চাই সেটাই। ভবিষ্যতে আমরা যে কাজ করবো, এখন থেকে আমাদের মনের মধ্যে তার একটা নীরব প্রস্তুতি শুরু হয়, স্কুল বিদ্যালয়ে রাজনীতিতে যেখানেই আমরা যাইনা কেন, সব সময় নিজেকে সেরা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাই। তাই আমাদের উচিত, প্রতিটি মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা। একাজ যে করতে পারে সারা দুনিয়া তার সঙ্গে থাকবে, যে পারবে না তাকে জীবন পথে একলাই চলতে হবে।

একেবারে গরীবের সন্তান ছিলেন স্কচ অ্যান্ড্রু কার্নেগী। তিনি প্রতি ঘন্টায় দু'সেন্ট করে রোজগার করতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন মারা গেলেন, তখন সকলে অবাক হয়ে দেখলো, তাঁর কয়েক হাজার কোটি ডলারের সম্পত্তি রয়েছে। তিনি কীভাবে এতো অর্থ রোজগার করেছিলেন? তিনি সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মাত্র চার বছর তিনি স্কুলে পড়েছিলেন। কিন্তু মানুষকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, সেই বিদ্যেটা ভালোভাবে শিখেছিলেন।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কার্নেগীর শালী একবার তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়েছিলেন। দু'জনেই ইয়েলে পড়াশুনা করছিলো। তারা নিজেদের নিয়েই সবসময় মশগুল থাকতো। বাড়িতে কখনো চিঠি দিতো না। মায়ের চিঠির জবাব দিতো না।

কার্নেগী সব কথা শুনলেন। তিনি একশো ডলার বাজি রাখলেন। তিনি বললেন—পরের ডাকেই ওদের উত্তর আসবে। বাজিতে তার শালী রাজী হয়ে গেলেন। তিনি এবার দু'জনকে বেশ আলাদা করে চিঠি দিলেন আর জানালেন, এই চিঠির সাথে পাঁচ ডলার করে নোট পাঠানো হয়েছে।

আসলে, তিনি কিন্তু নোট পাঠালেন না।

পরের ডাকেই উত্তর এলো। দুই দুষ্টু ছেলে মেসোমশাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আর চিঠির বাকি বক্তব্য কী ছিল, সেটা আপনারা বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা হয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

আগামীকাল হয়তো আপনি কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাইছেন। এই কথাটা তার কাছে বলার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন—ওকে কীভাবে আগ্রহী করে তুলবো?

এই প্রশ্নের যথাযথ সমাধান যদি আপনি পেয়ে যান, তাহলে কাজটা করানো আপনার পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না। আর তা না হলে, যতই আপনি বকবক করুন না কেন কল্পিত শাস্তির ভয় দেখান, লোকটি গোঁয়ার গোবিন্দের মতো বসে থাকবে। তাকে আপনি তার জায়গা থেকে একচুল সরাতে পারবেন না। তার ফলে কাজটিও আর শেষ পর্যন্ত আপনি করাতে পারবেন না।

নিউইয়র্কের কোনো একটি হোটেলের বলরুম আমি কুড়িটি রাতের জন্যে ভাড়া করে ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে আমি একটা বক্তৃতার আসর বসাবো। নির্জনের শুরুতে আচমকা জানানো হলো, আমাকে তিনগুণ বেশি ভাড়া দিতে হবে। ইতিমধ্যে আমি টিকিট বিক্রি করেছি। বেশ কিছু মানুষ টিকিট কেটেছেন। এখন এতো টাকা ভাড়া গুনলে আমার তো লোকসান হবে।

বাড়তি ভাড়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমার ছিল না। কিন্তু হোটেল ম্যানেজারের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে লাভ কী? তাদের আগ্রহ, তারা কী চায়, তাই নিয়ে। তাই দিন কয়েক বাদে আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমি ম্যানেজারকে সোজাসুজি বললাম, আপনার চিঠিটা পেয়ে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। তবে আপনাকে আমি দোষারোপ করছি না। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও বোধহয় একই ধরনের চিঠি লিখতে বাধ্য হতাম। এই হোটেলের ম্যানেজার হিসাবে আপনার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো, মালিকের পকেটে আরো বেশি টাকা পৌঁছে দেওয়া। তা না করলে আমার এই চাকরীটা বজায় থাকবে না। আর না থাকাই উচিত। এখন একবার আসুন, একটুকরো কাগজে লেখা যাক, এই ভাড়া বাড়ালে আপনার কী কী অসুবিধা হতে পারে।

ম্যানেজার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কেউ যে এভাবে তাঁকে শান্ত সহজ কথায় উপদেশ দিতে পারে, এই সরল সত্যটা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন অন্য কেউ হলে হয়তো ঝগড়া করতে আসতো। কিন্তু আসল কাজটি করতে পারতো না।

আমি সত্যি সত্যি একটি লেটার প্যাডের একটা পাতা ছিঁড়ে নিলাম। মাঝ বরাবর একটা লাইন টানলাম। একদিকে লিখলাম সুবিধে এবং অন্যদিকে লিখলাম অসুবিধে।

সুবিধার ঘরে আমি লিখলাম—বলরুম বিনা ভাড়ায়। তারপর বললাম—বক্তৃতার জন্যে বলরুম ভাড়া দিয়ে আপনি যে টাকা আয় করতে পারেন, নাচ-গানের অনুষ্ঠানের জন্যে ভাড়া দিলে অনেক বেশি টাকা আয় করতে পারবেন। অর্থাৎ মিছিমিছি আমি কুড়িটা রাত বলরুম আটকে রাখছি। আপনার এখনই উচিত আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া এবং অন্য একটি বিনোদনের দলকে এই বলরুম ভাড়া দেওয়া।

এবার অসুবিধার ব্যাপারটা লক্ষ করা যাক। আমার এই বক্তৃতা শুনতে সমাজের অনেক গণ্যমান্য মানুষেরা আসেন। বহু শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে আপনার হোটেলের নাম পৌঁছে গেছে। এটা কি আপনার পক্ষে একটা চমৎকার বিজ্ঞাপন নয়? যদি আপনি খবরের কাগজে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করে বিজ্ঞাপন দেন তাহলেও এতো মানুষকে

আকর্ষিত করতে পারবেন না। আমি আমার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এতো বেশী মানুষের কাছে আপনার হোটেলের নাম পৌঁছে দিতে পারবো, তা আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না। এই জনপ্রিয়তা কি আপনার হোটেলকে বরাবরের জন্যে ব্যবসা দেবে না?

কথা বলতে বলতে আমি আবার অসুবিধার জায়গাতে কতগুলো শব্দ লিখলাম। কাগজটা ভাঁজ করে ম্যানেজারের হাতে দিলাম। আমি বললাম—আমি সুবিধা আর অসুবিধাগুলো পাশাপাশি লিখে সাজিয়ে দিয়েছি। আশা করি, আপনি এটি ভালো করে পড়বেন, তারপর আপনার সুচিন্তিত মতামত আমাকে জানাবেন।

পরের দিন আমার হাতে একটি চিঠি এলো। আগে আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমাকে তিন গুণ বেশি ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু এখন ম্যানেজার মাত্র পঞ্চাশভাগ ভাড়া বাড়িয়েছেন। এই ভাড়া কমানোর ব্যাপারে ঐ সুবিধা-অসুবিধার তালিকাটাই দায়ী সেটা আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি।

আমি যদি সাধারণ মানুষের মতো কাজ করতাম তাহলে কী হতো? আমি সটান ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়তাম। তাঁর টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে বলতাম—আপনি কী ভেবেছেন? তিনশো গুণ ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন? এতে আমার চলবে কেমন করে? আপনি তো জানেন, টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে? আমি এখন কোথায় যাবো?

এর ফলে কী হতো? উনি উকিলের চিঠি দেওয়ার কথা বলতেন। আমিও সমানে তর্ক করতাম। তাতে আমার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। অথচ দেখলেন আমি কেমন কৌশল করে ওনাকে না চটিয়ে আমার কাজ করে ফেললাম।

মানবিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। এ বিষয়ে আমরা সেক্সডিক্স কোডের সাহায্য নিতে পারি। তিনি বলেছিলেন, কারো যদি কোনো গোপন সাফল্যের চাবিকাঠি থাকে, সেটা হলো, সকলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। কথাটা বার-বার বলতে হয় এবং মনের ভেতর গেঁথে রাখতে হয়।

ব্যাপারটা খুবই সহজ এবং সরল। দুনিয়ার নব্বই শতাংশ মানুষ কিন্তু এটা জীবনে নব্বইবার অগ্রাহ্য করে এবং তার ফলে বিফলতার অন্ধকারে পড়ে যায়।

এ বিষয়ে কোনো উদাহরণ চান? তাহলে একটা কথা বলতে পারি, আগামীকাল আপনি যে সমস্ত চিঠিগুলো পাবেন সেগুলো ভালোভাবে লক্ষ করুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার আসল অর্থ কোথায় লুকিয়ে আছে। কোনো বিজ্ঞাপন এজেন্সি যদি একটি চিঠি পাঠায়, তাহলে এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

সারা দেশের স্থানীয় বেতার স্টেশনের ম্যানেজারদের কাছে নিচের চিঠিটা পাঠানো হয়েছিল। প্রতিটি অনুচ্ছেদের তলায় আমি আমার প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে রেখেছি।

মি. জন. ব্ল্যাঙ্ক

ব্ল্যাঙ্ক হিল

ইন্ডিয়ানা

প্রিয় মি. ব্ল্যাঙ্ক, বেতার দুনিয়াতে আমাদের কোম্পানী তার বিজ্ঞাপন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চাইছে।

(আপনার কোম্পানী কী চায় তাতে আমার মাথাব্যথা কেন? আমি আমার সমস্যা নিয়ে পাগল হচ্ছি আর এখন আপনি আপনার কোম্পানীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে এসেছেন? ব্যাঙ্ক আর ধার দেবে না বলছে, পোকায় সব ফসল নষ্ট করেছে। শেয়ার বাজারে ধ্বস নেমেছে। আজ সকালে আমি আটটা পনেরোর গাড়ি ধরতে পারিনি। গতকাল জোন্সে নাচের অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। ডাক্তার বলেছেন আমার ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে

গেছে। বায়ুরোগ হয়েছে। মাথায় খুসকি হয়েছে। এরপর কী হবে? আরো বেশি দুশ্চিন্তা বাড়বে। সকালে আমি অফিসে যাবো। চিঠিপত্র খুলবো। আর খুলেই দেখবো নিউইয়র্কের একটা কেউকেটা কোম্পানী নিজের সম্পর্কে যা খুশী তাই বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে। যদি লোকটার ধারণা থাকতো, তার লেখা এই চিঠিটা আমার মনে কি ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তাহলে সে কখনোই এই ধরনের চিঠি লিখতো না।)

আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করতে পথ প্রশস্ত করে দেবো। পরবর্তী বছরে আমরা যে কর্মসূচী ঘোষণা করতে চলেছি, তাতে আমরা সুনিশ্চিত, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে।

(আপনারা অনেক ধনী, আরো ধনী হোন। ঈশ্বরের কাছে এইটুকু প্রার্থনা। তাতে আমার কী? আপনারা জেনারেল মোটর, জেনারেল ইলেকট্রিক আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে নিয়ে একটা বিরাট সংগঠন গড়ে তুলুন। আমি এর কানাকড়ি দাম দেবো না। আপনার যদি ছোট্ট একটা চড়াই পাখির মতো বুদ্ধি থাকতো তাহলে বুঝতে পারতেন এভাবে লোককে বিরক্ত করতে নেই। নিজের অহমিকা প্রকাশ করতে নেই। সকলে মিলে যাকে বড়ো ভাবে সেই সত্যিকারের বড়ো হয়। আপনাদের বিরাট সাফল্যের কথা শুনে নিজেকে আরো হীন বলে মনে হবে আমার। এতে আখেরে কী লাভ হবে?)

আমরা চাই আমাদের প্রতিষ্ঠান বেতার সম্পর্কে শেষ কথা হয়ে উঠুক।

(আপনারা চান? আপনারা কী গাধা নাকি? মুসোলিনী কিংবা ডিজরেলি যা চাইছেন তা নিয়ে আমি মাথা ব্যথা করতে যাবো কেন? আপনাকে শেষবারের মতো আমি জানাতে চাইছি, এইসব বাজে বকবকানি এবার থামিয়ে দিন। আমি কী চাইছি, সেটাই আমার কাছে প্রথম ও শেষ কথা। সেদিকে আপনি একবারও নজর দিলেন না। আপনি কী করে ভাবছেন, এ চিঠি আপনাকে যথাযথ সাফল্য দেবে।)

আপনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের তালিকাতে রাখছি। পরবর্তী সপ্তাহে সাপ্তাহিক বেতার অনুষ্ঠান শুরু হবে। আশা করি আপনি সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

(কী ভেবেছেন? এতো বড়ো আস্পর্ধা? আপনার মাথুর জোর আছে বটে। আপনার বড়ো বড়ো কথায় নিজেকে একটি অপদার্থ বলে মনে হচ্ছে। এর ওপর আবার আপনি বলছেন আমার কোম্পানীর নাম নথিভুক্ত করবেন। একবার দয়া করে কথাটা বলারও প্রয়োজন মনে করলেন না।)

এই চিঠির দ্রুত প্রাপ্তি স্বীকার করে আপনাদের বর্তমান কাজের ভাড়া জানালে উভয় পক্ষেই সেটা ভালো হবে।

মূর্খ, একটা সস্তাদরের বাজে কাগজে চিঠি লিখেছেন। চৈত্রের ঝরা পাতার মতো সে চিঠি কোথায় হারিয়ে যাবে। আমি এখন ব্যাঙ্ক, বন্ধক, ব্লাডপ্রেসার, পোকার উৎপাত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আবার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। আপনার এই চিঠিতে প্রাপ্তি স্বীকার করে সম্মান দেখাতে হবে? তাও আবার খুব তাড়াতাড়ি? আপনার কি জানা আছে, আপনার থেকে আমি অনেক বেশী ব্যস্ত? এসব ব্যাপারে মাথা দেবার মতো সময় আমার নেই। আমি সে কথাটাই বলতে চাইছি। আপনি লাটসাহেবের মতো হুকুম করে চলেছেন? এতোবড়ো সাহস কোথায় পেলেন? আবার লিখেছেন উভয় পক্ষের ভালো হবে। তাইলে আমার মনটা বুঝতে পেরেছেন দেখছি। কিন্তু আমার কী সুবিধা হবে সে ব্যাপারটা ধোঁয়ার মতো রয়ে গেছে।

আপনার বিশ্বস্ত,
জন ব্ল্যাঙ্ক
ম্যানেজার, বেতার দপ্তর

পুনশ্চঃ —ভেতরে পাঠানো ব্লাঙ্ক সীল পুস্তিকাটি আপনার আগ্রহ জাগাতে পারে। আপনি এটি পড়বেন এবং বেতার খোলার জন্যে ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(শেষপর্যন্ত পুনশ্চতে যা লিখেছেন, তাতে আমার কোনো সমস্যার সমাধান হতেও পারে। আপনি তো এটা দিয়ে চিঠি শুরু করতে পারতেন। বিজ্ঞাপন দপ্তরের লোক এমন চিঠি লিখলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। তাই ভাবছি, আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জন্যে খানিকটা আয়োডিন দরকার।)

এখন ধরুন বিজ্ঞাপন ব্যবসাতে জীবন কাটাচ্ছেন। মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন বলে মনে মনে অহঙ্কারী হয়ে উঠেছেন। সে ক্ষেত্রে যদি এমন একটি চিঠি এসে আপনাকে আঘাত করে, তাহলে আপনার মনটা কেমন হবে? এই চিঠি তো কোনো মাংসওয়ালা পাঠায়নি। কোনো কার্পেট সারাইওয়ালাও পাঠায়নি। এ চিঠি পাঠিয়েছেন বিজ্ঞাপন জগতের একজন কেউকেটা।

আর একটি চিঠির উদাহরণ দেওয়া যাক। চিঠিটি লিখেছিলেন এক ছাত্র। পাঠিয়েছিলেন মাল পরিবহন কোম্পানীর সুপারিনটেনডেন্ট। যাকে লেখা হয়েছিল, তার মনে এই চিঠি কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল?

আগে ভালোভাবে চিঠিটা পড়া যাক। তারপর না হয় আপনার সাথে শলাপরামর্শ করা যাবে।

এ জেরেগাস ফ্রুট ইনকরপোরেটেড
২৮ ফ্রন্ট স্ট্রীট
ব্রুকলীন এন ওয়াই
মি. এডওয়ার্ড ভার্নিলেল সমীপেষু,
মহাশয়,

আপনাকে জানাচ্ছি, আমাদের বহির্গামী রেলপথের মাল গ্রহণ ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। বিকেলে মাল পাঠানোর ফলে আমরা ঠিকমত মালগুলো খালাস করতে পারছি না। এর ফলে অযথা ভিড় হচ্ছে। কর্মীদের ওভার টাইম দিতে হচ্ছে। ট্রাকের জন্যে দেরী হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাল পাঠাতে গিয়ে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে। ১০ নভেম্বর আপনার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫১০ পেটি মাল এসেছিল। কিন্তু সেগুলি আসে বিকেল ৪.২০ মিনিটে।

কীভাবে আমরা এই সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাবো, তার চাবিকাঠি আপনার হাতেই ধরা আছে। আপনার সহৃদয় সহযোগিতা ছাড়া আমরা কিছুতেই এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করতে পারবো না। তাই আমরা অনুরোধ করছি, ভবিষ্যতে যদি কখনো বেশি পরিমাণে মাল পাঠান, তাহলে দয়া করে সঠিক সময়ের মধ্যে পাঠাবেন। অন্তত বিকেলের মধ্যে। নাহলে ট্রাকে করে সেগুলো ঠিক সময়ে উপযুক্ত স্থানে পাঠানো সম্ভব হবে না।

এই জাতীয় কাজ করার ফলে অনেকগুলো তাৎক্ষণিক সুবিধা দেখা দেবে। ট্রাক সঙ্গে সঙ্গে খালি হবে। আমরা আরো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ট্রাক সঙ্গে সঙ্গে খালি করে দেওয়া হবে।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
জে. বি সুপারিনটেনডেন্ট

চিঠিটা পড়ার পরে এ জেরেগাস কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার মি. ভার্নিলেল সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তলায় একটি ছোট্ট মন্তব্য করেছিলেন। ভাইলো—যা চাওয়া হয়েছিল, এই চিঠিটায় ঠিক তার উল্টো ফল হলো। চিঠিটা শুরু হয়েছিল

মাল খালাস ইত্যাদির ব্যাপার অসুবিধা জানিয়ে। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমাদের কোনো অসুবিধার কথা চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। বলা হয়েছিল, আমরা সহযোগিতা করলে ট্রাক দ্রুত খালাস করা সম্ভব এবং ঐ দিনের মধ্যেই মাল বিতরিত হয়ে যাবে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, আমাদের যে ব্যাপারে সবথেকে বেশি আগ্রহ আছে, সেটা সবার নিচে বলা হয়েছে। তাই চিঠিটাকে আমি কখনোই আদর্শ চিঠি বলতে পারি না।

এখন যদি আমরা নতুন করে এই চিঠিটা লিখি তাহলে কেমন হবে? আগেই বলা উচিত, অন্যের সমস্যার ওপর সর্বপ্রথম আলোকপাত করতে হবে। নিজের সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

হেনরি ফোর্ড যেমন বলেছিলেন —সবসময় অপরজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজেকে বিচার করবেন। তাহলেই আপনি সফল হতে পারবেন।

আসুন চিঠিটা একটু ঘুরিয়ে লেখা যাক। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে কোনো গুরুতর পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। তবে চিঠিটা কিন্তু সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

মি. এডওয়ার্ড ভার্নিলেল
জেলেগাস সন্স ইন কোং
২৮, ফ্রন্ট স্ট্রীট
ব্রুকলিন, এন ওয়াই

প্রিয় মি. ভার্নিলেল,

গত চোদ্দ বছর আপনার সাথে আমাদের ব্যবসায়িক সুসম্পর্ক বজায় আছে। আপনার এই অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যে আমরা সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনাদের কাছে আবার জানাচ্ছি, আমরা পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে গতির সঞ্চার করতে চাইছি। দ্রুত পরিচ্ছন্ন কাজ করতে চাইছি।

এক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি বিকেলের দিকে আপনাদের ট্রাক আসে তাহলে আমরা অতি সহজেই সেই ট্রাকগুলো খালি করতে পারবো না। ১০ নভেম্বর এমন ঘটনাই ঘটেছিল। অনেক খরিদ্দার এইভাবে শেষ বিকেলে ডাক পাঠিয়ে দেন। সকলের মাল জমে যায়। খালাস করতে করতে সন্ধ্যে কেটে যায়। ওভারটাইম দিতে হয়। এর ফলে কী হয়, আপনাদের কাজ জেটিতে আটকে যায়। মাল পরিবহণে দেরি হয়।

ব্যাপারটা ভাবতে আমাদের মোটেই ভালো লাগে না। কীভাবে এই অনভিপ্রেত ঘটনাকে এড়ানো সম্ভব? এটা করা সম্ভব যদি আপনারা বিকেলের আগেই সমস্ত মাল জেটিতে পাঠিয়ে দেন। তাহলে সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে। আপনাদের মালের ওপর আমাদের নজর থাকবে। কর্মচারীরাও তাড়াতাড়ি কাজ করে বাড়ি যেতে পারবে। আপনাদের তৈরি সুস্বাদু ম্যাক্রনি এবং নুডলস খেয়ে নৈশভোজ সারতে পারবে।

আমার অনুরোধ, এই চিঠিখানাকে আপনি কোনো অভিযোগ হিসাবে ভাববেন না। আর কখনোই ভাববেন না, আপনার ব্যবস্যার মধ্যে আমরা অযথা মাথা গলাচ্ছি। যখনই মাল পাঠাবেন, দয়া করে বিকেলের যথেষ্ট আগে পাঠাবেন। তাহলে আমরা আনন্দের সাথে সেই মাল যথাযোগ্য জায়গাতে পাঠিয়ে দেবো।

আপনারা অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। দয়া করে এই চিঠির উত্তর দিতে চাইবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
জে. বি সুপারিনটেনডেন্ট

তাহলেই বুঝতে পারছেন, বক্তব্য বিষয়ের সামান্য পরিবর্তন সাধন করে চিঠিখানাকে কেমন ভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হলো। চিঠি পড়ে গোমড়া মুখে হাসি ফুটবে। রাম গরুড়ের ছানাও হেসে উঠবে। কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করার সাহস করবে না।

এখন নানা ধরনের কাজ হচ্ছে। হাজার হাজার বিক্রেতা রাস্তার ধারে বসে আছে। তাদের সকলেই যে সফল তা নয়, তারা অনেকে ক্লান্ত, রিক্ত, বিবর্ণ। কিন্তু কেন? তারা সবসময় নিজেদের কথাই ভেবে চলে। নিজেদের চাহিদার দিকে দৃকপাত করে। সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট কী চাইতে পারে সেদিকে নজর দেয় না। তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি একদম নেই। তাই এই কথাটাই প্রথম ভাবতে হবে, ক্লায়েন্টদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর না দিলে ব্যবসা কখনোই বাড়বে না। বিক্রি বিষয়টির মধ্যে মনঃসংযোগ লুকিয়ে আছে। বিক্রি করার মধ্যে দিয়ে একজন বিক্রেতা ক্রেতাকে নানাভাব প্রভাবিত করে থাকে। এই প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটির সাথে সুভদ্র সম্পর্কে নির্ভর করে। ভালো সম্পর্ক না হলে এই প্রভাব খাটানো কখনোই সম্ভব নয়।

এখানে আর একটি কথা বলা যাক, সব মানুষ কিন্তু একই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হয় না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

আমি তখন গ্রেটার নিউইয়র্কের ফরেস্ট হিল এলাকাতে থাকতাম। একদিন যখন স্টেশনে ছুটছিলাম, তখন একজনের সাথে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে লঙ-আইল্যান্ডে জমি কেনা-বেচা করতেন।

ফরেস্ট হিল এলাকাটাকে তিনি হাতের তালুর মতো চিনতেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার বাড়িটি কী দিয়ে বানানো—ধাতব পাত না টালি?

উনি জানালেন, এ বিষয়টা ওনার জানা নেই। বরং উনি যা বললেন, সেটি আমার আগের থেকেই জানা। এটি আমি নিজেই ফরেস্ট হিল ক্লাবের অ্যাসোসিয়েশনকে ফোন করে জানতে পারি।

পরের দিন সকালবেলা আমি ওনার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। সেই চিঠির মধ্যে কী লেখা ছিল? তিনি সাত সেকেন্ডের মধ্যেও একটা টেলিফোন করে সব কিছু জানতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি বরং লিখেছিলেন, আমি যেন নিজে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানি। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন আমার বীমার ব্যাপারটা তাঁকে দেখতে দিই।

আমাকে সাহায্য করতে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি শুধু নিজেকেই সাহায্য করতে চাইছিলেন। তাঁর উচিত ছিল ভা ইয়ং-এর লেখা এ ডোগ ডিফার এবং আ ফরচুন টু শেয়ার নামক দুটি বই পড়ে ফেলা। এই দুটি বই পড়ে তিনি যদি বইয়ের বক্তব্য অনুসরণ করতেন, তাহলে অনেক বেশি লাভ করতে পারতেন। বীমার কাজ করে তিনি ক'টাকাই বা কমিশন পান? বেচারী!

পেশাদার মানুষেরা মাঝে মধ্যে একই ধরনের ভুল করে ফেলেন। কিছু দিন আগে আমি ফিলাডেলফিয়ার এক নামকরা নাক ও গলা বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর একমাত্র আগ্রহ ছিল আমার টাকা দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমাকে কতটা সাহায্য করা উচিত, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি খালি ভাবছিলেন আমার কাছ থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করবেন। এর ফলে কী হলো? আমি অতি দ্রুত তাঁর চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তাঁর লোভী কুৎসিত মন আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। আমি তাঁকে মনে মনে নিন্দা করলাম।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইভাবে স্বার্থপরতার জগতে বাস করে। তারা নিঃস্বার্থভাবে

অন্যকে সাহায্য করতে পারে না। তারা সব সময় নিজের সুযোগ সুবিধার কথা বলে।

এই প্রসঙ্গে ওয়েলডি ইয়াং বলেছিলেন —যে ব্যক্তি অন্য জায়গাতে নিজেকে ভাবতে পারেন, অন্যের ভাবনাকে নিজের ভাবনা করে নিতে পারেন, ভবিষ্যতে তাঁর কোনো ভাবনা থাকে না।

এই বইটি পাঠ করার পর আপনি সেকথাটাই ভাববেন। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সবসময় চিন্তা করতে হবে। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মেলাতে হবে। তবেই আপনি সফল হতে পারবেন।

কলেজে বেশির ভাগ ছাত্র কেন যান? তাঁরা ভার্জিলের কবিতা পাঠ করেন। তাঁরা ক্যালকুলাসের রহস্য ভেদ করেন। কিন্তু নিজের মন নিয়ে ভাববার মতো সময় হাতে পান না।

এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আমি একবার নিউজার্সির ক্যারিয়ার করপোরেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে তাপ নিয়ন্ত্রণের জিনিস পত্র তৈরি হয়। এক ভদ্রলোক ওখানকার ছাত্রদের বাস্কেট বল খেলার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছিল। তার নিজের কথাটা ছিল এইরকম —আমার ইচ্ছে আপনারা বেরিয়ে বাস্কেট বল খেলতে চলুন। এই খেলাটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি জিমনাসিয়ামে গেলেও এই খেলাটা ভালোভাবে খেলতে পারি না। কেননা সেখানে সঙ্গী নেই। কিছুদিন দু'জন তিনজন মিলে বল ছুঁড়তে গিয়ে চোখটা প্রায় কানা হবার মতো হয়েছিল। তবুও আমার ইচ্ছে আগামীকাল সকাল দশটায় আপনারা সবাই বাস্কেট বল কোর্টে আসবেন। এই খেলাটা খেলতে ভীষণ ইচ্ছে করছে আমার।

দেখুন, ভদ্রলোক কিন্তু নিজের বক্তব্যকে ঠিক মতো তুলে ধরতে পারেনি। তিনি বারবার নিজের ইচ্ছের কথা বলেছেন। আপনি কী চাইছেন, সে বিষয়ে সে মাথা ঘামান নি। আপনারা কেউই জিমনাসিয়ামে যেতে চান না। তাই না? তিনি যা চান তাও খেলতে চান না। চোখ কানা হোক, তাও কেউ বোধ হয় চাইবেন না।

জিমনাসিয়ামে গেলে আপনাদের যে কতো উপকার হবে, সে কথা কি উনি বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন? ইচ্ছে করলে পারতো, এতে শরীর চালনা দ্রুত হয়। খিদে বাড়ে। শরীরের নানা জায়গাতে মেরামতির কাজ শুরু হয়। মাথা পরিষ্কার হয়। বেশ মজা পাওয়া যায়। বাস্কেট বলও খেলা যায়। হৈ চৈ করা যায়।

প্রফেসার ওয়াসিটের কথাটা একবার শোনা যাক। তিনি বলেছিলেন, প্রথমে অন্যজনের মধ্যে একটা সাগ্রহের চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে হবে। যে এটা পারে সারা পৃথিবী তার সঙ্গে থাকে। যে পারে না তাকে জীবন পথে একাই চলতে হয়।

আমার শিক্ষানবীশদের মধ্যে একজন তাঁর ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে খুব ঝামেলাতে পড়েছিলেন। ছেলের ওজন কম ছিল। যে কোনো খাবারেই দারুণ অনীহা ছিল তার। তাই তার বাবা মা কী করলেন, তাঁরা ছেলেকে বকাবকি করলেন। তাঁরা বারবার করে বললেন— শোন, না খেলে তুমি কিন্তু আমার মতো বড়ো হতে পারবে না।

ছেলেটি এক্ষেত্রে কী করেছিল? সে কোনো বাইরের গুজবে মন দেয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, তিন বছরের একটা ছেলে আর তিরিশ বছরের বাবার দৃষ্টিভঙ্গী কোনো ক্ষেত্রেই এক হতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বাবা তার দৃষ্টিভঙ্গী ছেলের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অবশেষে বাবা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি নিজের মনকে বললেন —ছেলেটা কী চায়? ও যা চায় আর আমি যা চাই, সেই দুটোকে মেলাবো কেমন করে?

ছেলের একটা তিন চাকার সাইকেল ছিল। সেই সাইকেল চড়ে সে মাঝে মধ্যেই

ব্রুকলীনের বাড়ির পাশের রাস্তায় চলে যেতো। কয়েকটা বাড়ি পরে একটা দুষ্টু ছেলে থাকতো। বয়সে সে ছিল বেশ বড়ো। সে মাঝে মধ্যেই ছেলেটিকে সাইকেল থেকে টেনে নামিয়ে দিতো। আর ঐ সাইকেলটা আপন মনে চালাতো।

ছোট্ট ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে ছুটে আসতো। মাকে সব কথা জানানোর পরে মা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে পথে নামতেন। শয়তান ছেলেটাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতেন। আবার নিজের ছেলেকে সাইকেলে চড়াতেন। এই ঘটনা প্রায় রোজই ঘটতো।

এক্ষেত্রে বাচ্চাটি কী চাইতো? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের শার্লক হোমসের সাহায্য নিতে হবে না। ওর অহঙ্কার, ওর রাগ, ওর নিজেকে বড়ো করে মনে হওয়া, এসবের অন্তরালে একটি আবেগ আছে। এই আবেগ ওকে প্রতিশোধ নেবার জন্যে উদ্যত করতো। সেই শয়তান ছেলেটির নাক ফাটিয়ে দেবার ইচ্ছে জাগতো।

বাবা এর পর বাচ্চাটিকে বুঝিয়ে ছিল, যদি সে মায়ের কথামতো ঠিক-ঠিক খেয়ে নেয় তাহলে কিছুদিনের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হবে। তখন শয়তান বড়ো ছেলেটির নাক ভেঙে দেবে। এভাবেই তাকে শায়েস্তা করা সম্ভব হবে।

এর ফলে কী হলো? আগে খাওয়ার সময় চোখে জল বেরিয়ে আসতো, এখন ছেলেটিকে নিজে নিজেই খাবার খেয়ে নিচ্ছে, তার মনের ভেতর এই বিশ্বাস ঢুকেছে, খাবার না খেলে সে শক্তিশালী হতে পারবে না। শয়তান ছেলেটিকে ঠিকমতো শাস্তি দিতে পারবে না।

তাহলে এখানে কোন আবেগটি কাজ করছে। নিজের থেকে বয়সে এবং শক্তিতে বড়ো একটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে হবে, এই বোধটা ক্রমশঃ তার ভেতর জাগরিত হতে থাকে।

এই সমস্যাটার একটি সুষ্ঠ সমাধান হলো। এবার বাবা অন্য একটি সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। বাচ্চা ছেলেটি প্রায়ই ঘুমের ঘোরে বিছানা ভিজিয়ে ফেলতো। বাচ্চাটি ঘুমোতো তার ঠাকুরমার কাছে। সকাল বেলা ঠাকুরমা উঠে বিছানার অবস্থা লক্ষ্য করে ছেলেটিকে বলতেন —দেখো ড্যানি, রাত্তিরে আবার তুমি কী করছো?

ছেলেটি বলতো —না না, আমি করি নি। তুমিই করেছো।

তাকে বকুনি দেওয়া হতো। তাকে মারধোর করা হতো। কোনো কোনো সময় তাকে শান্ত ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হতো সবকিছু। বলা হতো, বিছানা শুকনো না রাখলে শরীর খারাপ হবে। তা সত্ত্বেও বিছানা শুকনো রাখা সম্ভব হলো না।

মা আর বাবা স্বভাবতই এখন প্রশ্ন তুললেন —কীভাবে এই নোংরা কাজটা বন্ধ করা যায়।

ছেলেটার ইচ্ছে কী ছিল? প্রথমত সে চাইতো, তার বাবার মতো পাজামা পরতে। ঠাকুমার মতো রাতে গাউন পরে ঘুমোতে সে মোটেই পছন্দ করতো না। ঠাকুরমা তখন ঐ বিছানা ভেজানো নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নাতির জন্যে রাতের পাজামা এলো। তিনি আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। তাঁর মনে আশা ছিল, এবার বোধহয় নাতি বদলে যাবে। দ্বিতীয়ত, ছেলেটি নিজস্ব একটি বিছানা চেয়েছিল। ঠাকুরমা তাতেও কোনো আপত্তি করেন নি।

ছেলেটির মা তাকে ব্রুকলীনের একটি বড়ো দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেলস গার্লকে বলেছিলেন, ছোট্ট ভদ্রলোক কিছু কেনাকাটা করতে চাইছে।

মেয়েটিও ছেলেটিকে যথাযথ সম্মান দিয়েছিল। মেয়েটি বলেছিল —বলুন আপনাকে কী দেবারো?

ছেলেটি পা উঁচু করে নিজের লম্বা শরীরটাকে আরো লম্বা করে জবাব দিয়েছিল —আমার জন্যে একটা বিছানা চাই।

ওর মা মেয়েটিকে একটা বিছানা দেখিয়ে চোখ টিপলেন। ছেলেটিকে সেটিই পছন্দ করানো হলো। বিছানাটি কেনা হয়ে গেল।

পরের দিন বিছানাটি বাড়িতে পৌঁছলো। রাত্রিবেলা বাবা এলেন। ছেলেটি দরজার কাছে এসে চিৎকার করে বললো —বাবা, ওপরে এসে আমার বিছানা দেখে যাও, আমি নিজেই কিনেছি কিন্তু।

বাবা চার্লস সোয়াবের কথাটিই মেনে চললেন। অর্থাৎ দারুণ খুশী হলেন। তিনি খুদে ভদ্রলোককে বারবার প্রশংসা করতে থাকলেন।

বাবা এবার মোক্ষম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন —খোকা, এ বিছানাটা কি তুমি ভেজাবে? কখন নয়, কি বলো?

ছেলেটি বললো —না না। এ বিছানা আমি ভেজাবো না। আমি পছন্দ করে কিনেছি তো?

ছেলেটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কথা রেখেছিল। তার গর্ব এবং অহঙ্কার এর ওপর নির্ভর করছিল। বিছানাটা একান্ত ভাবে তার নিজের। সে খুদে ভদ্রলোকের মতো পাজামা পরেছিল। সে একজন বড়ো সড়ো মানুষের মতো ব্যবহার করতে চাইছে।

আর একজন বাবা, একজন টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার, আমারই এক ছাত্র ; তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েছিলেন। মেয়েটি কখনোই সকালের ব্রেকফাস্ট খাবে না। তাকে বকাবকি করা হতো। আদেশ অনুরোধ উপরোধ করা হতো তবুও সে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসবে না।

শেষ পর্যন্ত তার বাবা আর মা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন —কী করে ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে প্রাতরাশ খাওয়াবো বলুন তো?

বাচ্চা মেয়েটি তার মাকে নকল করতে ভালোবাসতো। সে সবসময় ভাবতো, মায়ের মতো বড়ো হয়ে গেছে। একদিন বাবা-মা তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে প্রাতরাশ বানাতে গেলেন। আর ঠিক সময় মেয়েটির বাবা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। মেয়ে বললো —বাবা, আমি আজ সকলের জন্যে মলভেক্স বানাচ্ছি।

সেদিন কিন্তু তাকে খাওয়ানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করতে হয়নি। সে সবই খেয়ে নিলো। কেননা কাজ করার ব্যাপারে তার আগ্রহ জেগেছিল। নিজের সম্পর্কে সে বেশ গর্ববোধ করতে শুরু করে। সে নিজেকে জাহির করতে চায়। আর জাহির করার ব্যাপারটা ধরা পড়ে তার খাবার বানানোর মধ্যে দিয়ে।

উইলিয়াম উইন্টার একবার সুন্দর একটি মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে, নিজেকে সবসময় প্রকাশ করা।

আমরা ব্যবসার ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগাতে পারি। যখনই একটা চমৎকার ধারণা আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় তখন আমরা কী করবো? আমরা কী সেই ধারণাটা অন্যজনের মনে সংক্রামিত করবো? নাকি অন্য জনকে আগ্রহান্বিত করে তুলবো?

এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হলো—প্রথমেই অন্য লোকটির মনের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যে এই কাজটি সার্থকতার সঙ্গে করতে পারে, সারা দুনিয়া তার সঙ্গে থাকে। যে পারে না, তাকে একক নিঃসঙ্গতার মধ্যে সময় কাটাতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আমি নয়টি পরামর্শের কথা বলছি। এই পরামর্শগুলি যদি আপনি ঠিকমতো মেনে চলেন, তাহলে জীবনযুদ্ধে সফল সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

প্রথম পরামর্শ—যদি আপনি এই বইটি থেকে কিছু করতে চান তাহলে একটা অপরিহার্য কাজ আপনাকে করতে হবে। এই কাজটি আইন নীতি বা নিয়মের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমনই অপরিহার্য যে হাজার নিয়ম জানা না থাকলেও কোনো অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে, এই রাজকীয় যদি আপনার সঙ্গে থাকে, তাহলে এই বইয়ের পরামর্শ না নিয়েও আপনি জীবনে সফল হবেন।

এই যাদুকরী ব্যাপারটা কীরকম? এটি হলো এই—গভীর এবং আন্তরিক শেখার পিপাসা। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা গড়ে তোলার জন্যে প্রবল আকাঙ্খা।

আকাঙ্খা কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে? এ জন্য আপনাকে সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। নিজের মধ্যে কতগুলো ছবি আঁকতে হবে। দেখতে হবে, কিভাবে আপনি এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করছেন। সবসময় নিজেকে নিজেই বলবেন আমার জনপ্রিয়তা, আমার সুখ আমার আয় সবকিছু নির্ভর করছে জনসংযোগের ক্ষেত্রে আমার সাফল্যের ওপর। আমার দক্ষতা এবং ব্যবহারের ওপর।

দ্বিতীয় পরামর্শ—

প্রতিটি পরিচ্ছেদে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি পরিচ্ছেদ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা সৃষ্টি করুন। তাহলে আপনি পরের পরিচ্ছেদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবেন।

মানসিক আনন্দের জন্যে বই পড়বেন না। জনসংযোগে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যদি শেষ পর্যন্ত বই পাঠ করতে চান তাহলে প্রতিটি পরিচ্ছেদকে আলাদা ভাবে পড়বেন। শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এভাবে আপনি বই থেকে আপনার ঈপ্সিত বিষয়গুলিকে মুঠোবন্দী করতে পেরেছেন।

তৃতীয় পরামর্শ—

পড়তে গেলে মাঝে মধ্যে একটু থেমে পড়বেন। পঠিত বিষয়টা ঠিকমতো বোধগম্য হয়েছে কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করবেন, দেখবেন, বইতে যেসব উপদেশ দেওয়া আছে, সেগুলো আপনার কাজে লাগছে কিনা। কিভাবে পড়লে আপনি আরো বেশি উপকৃত হবেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ পরামর্শ—

পড়ার সময় লাল রঙের কোনো পেনসিল বা পেন রাখবেন। পড়তে পড়তে যদি কোনো ভালো উপদেশ দেখতে পান যা আপনার জীবনে কাজে লাগবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে রেখাঙ্কিত করবেন। আবার যদি সেই পরামর্শ বা উপদেশ আপনার খুবই ভালো লাগে, তাহলে তার তলায় দাগ দেবেন এবং তাতে তারকা চিহ্ন দেবেন। এইভাবে তারকা চিহ্ন দেওয়া লেখাগুলি থাকলে ভবিষ্যতে আপনি অতি সহজেই সেগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন এবং বারবার পড়ে মনের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারবেন।

পঞ্চম পরামর্শ—

আমি এক ভদ্রলোককে চিনি। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একটি বীমা প্রতিষ্ঠান অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। প্রতি মাসে তাঁর কোম্পানীতে বীমা সংক্রান্ত যে সমস্ত চুক্তি হতো, তিনি তার সবগুলো পড়ে ফেলতেন। একই চুক্তিপত্র তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে পড়তেন। কিন্তু কেন?

তিনি এইভাবে চুক্তির শর্তাবলীকে মনে রাখতে পারতেন। কেউ তাঁকে দ্বিতীয়বার ঠকাবার সাহস করতো না।

একসময় আমি জনগণের সামনে বক্তৃতা দেবার উপযোগী একটি বই লিখেছিলাম। দু বছর ধরে এই বইটি আমি লিখতে থাকি। কিন্তু এই বইয়ের কোন্ পাতায় কী লেখা আছে

তা বের করার জন্যে আমাকে মাঝে মধ্যেই তার পাতা উল্টাতে হয়েছিল। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে, কিরকম দ্রুততায় আমরা আমাদের সবকিছু ভুলে যাই।

যদি আপনি এই বইটি থেকে চিরকালীন উপকার পেতে চান, তাহলে কখনোই ভাববেন না, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই বইটি পড়া শেষ হয়ে যাবে। ভালো করে এই বইটি পড়ার পর এককোণে রেখে দিন। তারপর দেখুন সাতদিন বাদে আপনি সবকটি বিষয়কে মনে রাখতে পারছেন কিনা। যদি মনে হয় পারছেন তাহলেই আপনার পড়ার বিষয়টি সার্থক হয়েছে। আর যদি মনে হয়, এখনো আপনি বিষয়গুলি মনে রাখতে পারছেন না, তাহলে বইটি আবার পড়তে হবে। প্রতিদিন সময় পেলেই বইটির বিভিন্ন পাতায় চোখ বুলিয়ে নেবেন। প্রতিদিন নিজেকে বোঝাতে চাইবেন, আপনি বইটির কত শতাংশ মনে রাখতে পারছেন। মনে রাখবেন এই পরামর্শ আর নিয়মগুলো বারবার পড়া আর আলোচনার মধ্যে দিয়েই সেগুলোকে মনে রাখা সম্ভব। এছাড়া আর কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই।

ষষ্ঠ পরামর্শ—

বার্নাড শ একবার বলেছিলেন কোনো মানুষকে কোনো কিছু শেখাতে চাইলে সে কিছুতেই তা শিখবে না।

শ-এর মতো বুদ্ধিজীবী ঠিককথাই বলেছিলেন। শেখা ব্যাপারটি ব্যবহারিক। কাজ করতে করতে আমরা শিখি, অর্থাৎ, এই বই থেকে যেসব নিয়মগুলো আপনি এখনই শিখতে চাইছেন সেগুলিকে আলাদা করে সাজিয়ে নিন। সুযোগ পেলেই নিয়মগুলিকে কাজে লাগান। কেননা, ঠিকমতো প্রযুক্ত না হলে আপনি অচিরেই এই নিয়মটি একেবারেই ভুলে যাবেন।

এই উপদেশগুলো হয়তো সবসময় একসঙ্গে কাজে লাগাতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দেবে। এ ব্যাপারটা আমি ভালো মতো জানি। বইটা আমারই লেখা। আমার বিষয়গুলির যে শুধু তত্ত্বগত ভূমিকা আছে তা নয়, ব্যবহারিক প্রয়োগ কুশলতাতেও তারা অনেকের মন জয় করবে। এক্ষেত্রে মনে রাখবেন, একটি মানুষকে প্রশংসা করা সহজে যায় না। কিন্তু অতি সহজে আমরা তাকে নিন্দে করতে পারি। কাজের খুঁত বের করতে পারি। কিন্তু কখনো ভেবেও দেখি না, যদি তার অবস্থানে আমি থাকতাম, তাহলে আমার সৃজন শিল্পের কী অবস্থা হতো।

এক্ষেত্রে আরো কিছু কথা বলার আছে। তার আগে আমি আবার বলছি —বইয়ের পাতাগুলো অনবরত দেখতে থাকবেন। জনসংযোগের ক্ষেত্রে এই বইটি আপনার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে প্রকাশিত হবে। যখনই জীবনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখনই এই বইটির কথা চিন্তা করবেন। এই বইয়ের বিভিন্ন পাতায় আপনার ঐ সমস্যার সহজ সুন্দর সমাধানের চাবিকাঠি লুকোনো আছে। হয়তো আপনি কোনো শিশুর সাথে কথা বলছেন, আপনার স্ত্রীকে স্বমতে নিয়ে আসছেন, অসন্তুষ্ট মক্কেলকে সন্তুষ্ট করছেন —তখন স্বাভাবিক ভাবেই এই বইটির সাহায্য নেবেন। যদি কোনো ক্ষেত্রে ভুলবশত কিছু অন্যায় করে থাকেন, সেই অন্যায়ের সমাধানও এই বইতে আছে। এই বইয়ের বিভিন্ন পাতায় আপনি ইতিমধ্যেই দাগ দিয়ে রেখেছেন ভালো ভালো বাক্যের পাশে, দু-চারটি নক্ষত্র চিহ্ন দিয়েছেন, সেই পাতাগুলির দিকে বারবার তাকাবেন। দেখবেন, নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে আপনার আর ভুল হচ্ছে না। যাদুর মতো কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সপ্তম পরামর্শ—

আপনার স্ত্রী, ছেলে বা কাজের সহকর্মীকে বোলবেন, তাঁরা কীভাবে এই বইয়ে লিখিত নিয়মগুলি ভাঙছেন। আর প্রতিটি ত্রুটির জন্যে তাঁদের কিছু টাকা পারিতোষিক দেবার ব্যবস্থা করুন। হয়তো একটি ভুলের জন্যে এক ডলার, এই ভাবে। শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাঁরাও

নিজেদের কাজের জন্যে লজ্জা বোধ করছেন এবং আর আগের মতো ভুল করছেন না। তার মানে, তাঁরা অনেকখানি শুধরে গেছেন। সেক্ষেত্রে আপনি সহজেই তাঁদের সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন।

অষ্টম পরামর্শ—

ওয়াল স্ট্রীটের এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের কথা বলি। তিনি একবার আমার ক্লাসে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি আত্মোন্নতির একটি চমৎকার পথের প্রবর্তক। ছেলেবেলাতে ভদ্রলোক লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকার বিখ্যাত অর্থ বিনিয়োগকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি যে জীবনে এতোখানি উন্নতি সাধন করেছেন, এর অন্তরালে আছে অভাবনীয় ঐ পদ্ধতিটি। তিনি যা করতেন সেটি হলো এইরকম, আমি সেটাকে নিজের ভাষায় সাজিয়ে আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি।

বছরের পর বছর ধরে আমি একটি কাজ অক্লান্ত ভাবে করে এসেছি। সেটি হলো, যে সমস্ত লোকের সাথে আমি কথাবার্তা বলতাম, তার একটা বিবরণ লিখে রাখতাম। আমার পরিবারের লোকজন শনিবারের রাত্রে আমার জন্যে কোনোরকম কাজ রাখতো না। কেননা তারা জানতো, এই সময়টিতে আমি আত্ম-সমীক্ষা করি। আমি নিজেকে সমালোচনা করি।

গত সপ্তাহে আমি যে সমস্ত কাজ করেছি, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল কিনা। যে কথাগুলো আমি বলেছি, তার মধ্যে বেফাস কিছু বলে ফেলেছি কিনা। শনিবার নৈশভোজের পর আমি সাক্ষাতের বিবরণ লেখা ডাইরীটা খুলে বসে থাকতাম। সারা সপ্তাহে আমি যেসব আলোচনা করেছি, যেসব সভায় ভাষণ দিয়েছি, তা ঠিকমতো হয়েছে কিনা।

এরপর আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম—ঐ দিনে আমি কি ভুল করেছি?

—কোন্ কাজটা আমি ঠিক করেছি, আরো ভালোভাবে কাজটা করতে পারতাম কিনা।

—এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি কি শিক্ষা পেতে পারি?

আমি প্রায় দেখেছি সমালোচনা আমায় দুঃখ দিয়েছে। আমি যে কী ছোটো খাটো ভুল করেছি তা দেখে অবাক হয়ে গেছি। অবশ্য ধীরে ধীরে এই জাতীয় ভুলে সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। এই বিচারপদ্ধতি আমাকে আরো নিখুঁত করে তুলেছে। এই আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম সমালোচনা—এসবের দরকার আছে। এরা মানুষকে অনেক স্বাবলম্বী করে তোলে।

আমি এখন আরো সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। জনসংযোগের ক্ষেত্রেও আরো সফলভাবে পদক্ষেপ রাখতে পারি। এর থেকে ভালো কিছু ভাবতে আমি অপারগ।

আমার মনে হয় আপনাদেরও উচিত পদ্ধতি অনুসরণ করা। এই নীতির একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ কুশলতা আছে। এটি করলে কীভাবে আপনি লাভবান হবেন —প্রথমত আপনি নিজেকে বেশ অদ্ভুত এবং অমূল্য কোনো শিক্ষা পদ্ধতির সাথে একাত্মা করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, দেখবেন, মানুষের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নবম পরামর্শ—

আপনি একটি ডাইরী লেখার অভ্যেস করুন। ডাইরীতে আপনি আপনার অতীত জীবনের সব ঘটনা অকপটে স্বীকার করবেন। স্পষ্টভাবে সবকিছু লিখবেন। সাফল্যের কথা লিখবেন জীবনের চলার পথে যে সমস্ত ব্যর্থতা এসে আপনাকে আঁকড়ে ধরেছে তার কথাও স্বীকার করবেন। ডাইরীতে নাম, তারিখ, ফলাফল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন। এই জাতীয়, ডাইরী আপনাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করবে। কয়েক বছর বাদে সব ক'টা ডাইরী পাশাপাশি

রেখে পড়তে থাকুন। আপনি বুঝতে পারবেন, কীভাবে আপনার চারিত্রিক উন্নতি ঘটে গেছে। আগে যেসব ভুল আপনি করতেন, যেসব ঘটনাতে বিহ্বল হয়ে পড়তেন, হঠাৎ রেগে যেতেন, এখন আর আপনি সেইসব ভুল করেন না। তার মানে আপনার চরিত্র আরো পরিশীলিত হয়েছে। জনসংযোগের ক্ষেত্রে আপনি আরো বেশি দক্ষতা অর্জন করেছেন।

এই বই থেকে যদি আপনি সব থেকে বেশি লাভবান হতে চান, তাহলে নিম্নলিখিত ন'টি বিষয় আপনাকে মনে রাখতেই হবে।

(১) মানসিক সম্পর্কের নীতির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলুন।

(২) পরবর্তী পরিচ্ছেদ পাঠ করার আগে, আগের পরিচ্ছেদের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

(৩) পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কী সত্যি সত্যি এই বইতে লেখা বিষয়গুলি নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবো। নাকি নেহাত বইটা পড়তে হয় বলে পড়ছি।

(৪) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার তলায় লাল কালির দাগ দিন।

(৫) প্রতি মাসে বইটির পর্যালোচনা করুন।

(৬) সুযোগ পেলেই বইয়ের নীতিগুলিকে কাজে লাগান। আপনার দৈনিক সমস্যা মেটানোর জন্যে এই বইটিকে মুশকিল আসান হিসাবে গ্রহণ করুন।

(৭) নিজের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন আর প্রতি সপ্তাহে কতটা এগোলেন তার হিসেব দিন।

(৮) কী কী ভুল করলেন, আর কী কী উন্নতি করেছেন তার হিসেব রাখুন।

(৯) নিয়মগুলো কীভাবে কাজে লাগালেন, তা লেখার জন্য একটি ডাইরী লিখুন। মনে রাখবেন প্রথমেই অন্য লোকের মধ্যে বেশ কিছুটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। যিনি এই কাজটা ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারেন, পৃথিবী তার হাতের মুঠোয়। যিনি পারেন না তাকে জীবনের চলার পথে একক পথিক হিসাবে চলতে হয়।

চার

একাজ করলে সবাই আপনাকে ভালোবাসবে

কী করে বন্ধু পেতে হয় তা জানতে গেলে আপনাকে এ বই পড়তে হবে। প্রথমেই দেখা যাক, বন্ধু বলতে কী বোঝায়। অনেকে ভুল করে ভেবে থাকেন, বিনোদনের উৎসবে যিনি যোগ দেন, জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তকে যিনি আরো একটু বেশি তরল করে তোলেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু। কিন্তু তা নয়, যিনি দুঃখের রাত্রে আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকেন তাকেই আমরা প্রকৃত বন্ধু বলতে পারি।

কীভাবে আমরা পৃথিবীর সবসেরা বন্ধুত্বকে অর্জন করবো? তাহলে আপনাকে আরো একটু বিশদ বোঝাতে হবে। হয়তো আপনি এখনো সেই ব্যক্তির সন্ধান পাননি। কিন্তু কাল সকালে যে তার সংগে আপনার দেখা হবে না, এমনটি না মনে করার কোনো কারণ নেই। হয়তো আগামী দশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি আপনার জীবনের সেরা সুহৃদের সন্ধান পাবেন। আপনি তাকে থামিয়ে দেবেন। পিঠ চাপড়ে আদর করবেন। সে লাফিয়ে উঠে জানিয়ে দেবে, আপনাকে সে কতখানি পছন্দ করে। আপনিও বুঝতে পারবেন, তার এই

আনন্দ প্রকাশের মধ্যে কোনো বদ উদ্দেশ্য নেই। সে আপনাকে কোনো কিছু বিক্রি করতে চায় না। আপনার অগাধ অর্থে থাবা বসাতে চায় না।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কার কথা বলতে চাইছি? সে হলো, মানুষ নয়, একটি সারমেয় ছানা। একমাত্র কুকুরকে জীবন ধারণের জন্যে কোনোরকম কাজ করতে হয় না। মুরগীকে ডিম পাড়তে হয়। গরুকে দুধ দিতে হয়। ক্যানারি পাখিকে সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে হয়। কিন্তু কুকুর বেঁচে থাকার জন্যে আপনাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দেয় না। তাইতো আমরা বলে থাকি, এ জীবনে কুকুর হলো মানুষের সর্বোত্তম বন্ধু।

যখন আমার পাঁচ বছর বয়েস, তখন আমার বাবা ১৫ সেন্ট দিয়ে একটি হলদে লোমওয়ালা কুকুর ছানা এনে দিয়েছিলেন। আমার ছোটো বেলার দিনগুলিতে সেই কুকুরছানা ছিল আমার আনন্দের সঙ্গী। প্রত্যেকদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় সে বাগানের সামনে তার সুন্দর দুটি চোখ মেলে আমার অপেক্ষাতে বসে থাকতো। আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে এসে দারুণ আনন্দে আমাকে ঘিরে ডাকতে আরম্ভ করতো। তার নাম ছিল টিপি। প্রায় পাঁচ বছর ধরে টিপি ছিল আমার সারাক্ষণের বন্ধু। তারপর এক দুঃখময় রাত্রিরে, কোনোদিন সে রাতের কথা ভুলবো না, আমার বসে থাকার দশ ফুটের মধ্যে বাজ পড়ে সে মারা যায়। টিপির মৃত্যু আমার সমস্ত ছেটবেলাকে এক আশ্চর্য শোকস্তব্ধতার মধ্যে ঘিরে রেখেছিল।

টিপি কিন্তু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো বই পাঠ করেনি। এর কোনো দরকার ছিল না। কোনো একটা আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়ে সে জানতে পেরেছিল, কীভাবে মানুষকে আত্মার আপন করে নিতে হয়।

টিপি যদি তা পেরে থাকে সামান্য কুকুর হয়ে, আমরা মানুষ হয়ে তা কি করতে পারি না?

আমি অবাক হয়ে ভেবেছি, মানুষ কেন লোককে আপন করে নিতে পারে না? কেন তাদের মধ্যে একটা আত্ম-অহমিকাবোধ সব সময় কাজ করে?

এখানে আরো একটা বিষয় বলার আছে, তা হলো, মানুষ কিন্তু আপনার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহান্বিত নয়। সে শুধু নিজের কথাই ভাবতে ভালোবাসে। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে অবধি তারা শুধু আত্মোন্নতির কথা ভাবে।

নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী একবার একটি সমীক্ষার আয়োজন করেছিল। তারা টেলিফোনের লাইন ট্যাপ করতো এবং জানবার চেষ্টা করতো আমরা কোন্ শব্দটা সব থেকে বেশি ব্যবহার করি। আপনারা ঠিকই আন্দাজ করেছেন, দেখা গেল 'আমি'—এই শব্দটাই আমরা সবথেকে বেশি ব্যবহার করছি। 'আমি' এই সর্বনামটা পাঁচশো টেলিফোনে কথাবার্তার মধ্যে ৩,৯৯০ বার ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাবুন তো শুধু আমি আমি এবং আমি। আমি-র এক অন্তহীন মিছিল যেন সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

যে গ্রুপ ছবিতে আপনি আছেন সেটি হাতে নিয়ে সবার আগে আপনি কার দিকে দুটি চোখ নিবদ্ধ করেন বলুন তো? এক্ষেত্রেও উত্তরটা ঐ আমি ছাড়া আর কিছু হবে না।

আপনি যদি ভেবে থাকেন যে লোকে আপনার প্রতি খুবই আগ্রহান্বিত, তাহলে এই কঠিন কঠোর প্রশ্নটির জবাব দিন —ঈশ্বর না করুন, যদি আজ রাত্রে আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে কতজন মানুষ আপনার অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়াতে আসবে?

লোকে কেন আপনার সম্পর্কে আগ্রহী হবে যদি আপনি তার সম্পর্কে আগ্রহী না হন? আসুন, এবার হাতে একটা পেনসিল নিয়ে আপনার উত্তরটা লিখে ফেলা যাক।

আমরা যদি শুধুমাত্র লোককে আগ্রহী করার চেষ্টা করি, শুধু আমি-আমি করে চিৎকার

করি, তাহলে কোনোদিন আমরা সত্যিকারের বন্ধু পাবো না। সত্যিই তো এভাবে সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিখ্যাত নেপোলিয়ান এইভাবে চেষ্টা করেছিলেন। জোসেফাইনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন —জোসেফাইন, একজন মানুষ জীবনে যা যা চাইতে পারে, আমি তার সবই করায়ত্ত করেছি। তবুও ঠিক এই মুহূর্তে, সারা দুনিয়াতে একমাত্র তুমিই হলে সেই মানুষ, যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারি।

ঐতিহাসিকদের সন্দেহ আছে, নেপোলিয়ান জোসেফাইনের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছিলেন কিনা।

ভিয়েনার বিখ্যাত মনোস্তত্ত্ববিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার, হোয়াট লাইফ শুড মিন টু মি নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইতে তিনি লিখেছেন —যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না, সে দুনিয়াতে জীবন কাটায় সব থেকে অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অন্যকেও সে কারণে অকারণে বারে বারে আঘাত দেয়। এই ধরনের মানুষ থেকেই মানসিক এবং শারীরিক ব্যর্থতার জন্ম হয়।

মনস্তত্ত্বের ওপর আপনারা ভালো ভালো বক্তব্য পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এর থেকে চমৎকার কোনো মন্তব্য বোধহয় আর খুঁজে পাবেন না। একথা আমি বার বার বলতে চাইছি না। তা হলো অ্যাডলারের বক্তব্য এতোই সুন্দর যে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না সে দুনিয়ায় জীবন কাটাতে সব থেকে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পাছে পরে অন্যকে আঘাত করে।

একবার আমি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো গল্প লেখার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। ক্লাস চলাকালীন কোলিয়াস পত্রিকার সম্পাদক আমাদের কিছু বলেছিলেন—তিনি বলেছিলেন, তাঁর টেবিলে রোজ অসংখ্য গল্পের পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। একটি গল্প থেকে সামান্য কিছু অংশ পড়লেই তিনি বুঝতে পারেন, ঐ লেখক সত্যি সত্যি মানুষকে ভালোবাসেন কিনা। তিনি বলেন, লেখক যদি মানুষকে ভালো না বাসেন, তাহলে মানুষ তাঁর গল্প ভালোবাসবে না। এটি একটি সুন্দর সমীকরণ। সত্যিই তো, এই কথাটা ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

ঐ অভিজ্ঞ সম্পাদক ছোটো গল্প নিয়ে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'বার থেমে মার্জনা নিয়ে বলেছিলেন—তিনি একটা উপদেশ দিতে চান। সেটি হলো—আমি আপনাদের যা বলছি, আপনাদের কেউ কেউ হয়তো তাই বলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা যদি সফল গল্পলেখক হতে চান, তাহলে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ জাগাতেই হবে।

কল্পিত কাহিনী লেখার ক্ষেত্রে যদি এই সূত্রটি সত্য হিসাবে প্রতিপন্ন হয় তাহলে মানুষের সাথে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটি তিন গুণ খাঁটি হিসাবে বিবেচিত হবে।

একবার আমি হাওয়ার্ড থার্স্টনের সঙ্গে তাঁর সাজ ঘরে একটি সন্ধ্যে কাটিয়েছিলাম।

তখন তিনি ব্রডওয়েতে শেষবারের মতো একটি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। থার্স্টন কে ছিলেন মনে আছে তো? তিনি চোখের নিমেষে রুমালকে বেড়ালে পর্যবসিত করতে পারতেন। মুখের ভেতর কেরোসিন পুরে আগুন জ্বালাতে পারতেন। আপনারা ঠিকই অনুমান করছেন, তিনি ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত যাদুকর।

তাকে আমরা যাদুর কিংবদন্তী বলতে পারি। চল্লিশ বছর ধীরে তিনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাদুর খেলা দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রেখেছিলেন। সাত লক্ষের বেশি মানুষ তাঁর যাদু প্রদর্শন দেখার জন্যে টিকিট কেটে। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছিল এতে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ ডলার আয় করেছিলেন।

আমি থার্স্টনের কাছে তাঁর সাফল্যের রহস্য জানতে চেয়েছিলাম। স্কুলের পড়াশোনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কেননা ছোট্ট বেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই জীবনে নানা জীবিকার সাথে করমর্দন হয়েছিল তাঁর। প্রথমে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন একজন মজুর হিসাবে। গাড়ির মধ্যে খড়ের গাদায় ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দেন। দরজায় দরজায় ভিক্ষেও করেছিলেন বেঁচে থাকার জন্যে। রাস্তার সাইন বোর্ড আর বিজ্ঞাপন পড়েই তাঁর পড়াশুনাতে হাতেখড়ি হয়েছিল। সবথেকে অবাক কথা হলো, যে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে তিনি পৃথিবীর কাছে কিংবদন্তী মানুষ হিসাবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন সেই যাদুবিদ্যাতেও তাঁর প্রাথমিক কোনো ধারণা ছিল না। তিনি নিজেই অকপটে আমার কাছে স্বীকার করেছেন—যাদুর খেলা বা ভোজবাজী সম্বন্ধে অনেক বই আছে। তিনি যা জানেন, বই পড়ে। অন্য লোকেরা তাই শিখেছে। তবে তাঁর এমন দুটি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল অন্যদের যা ছিল না।

প্রথমত, পাদপ্রদীপের সামনে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা। তিনি ছিলেন এক দক্ষ প্রদর্শক। মানুষের চরিত্র কী, তা ভালোভাবেই জানতেন। তিনি যখন যাই করতেন তার মধ্যে একটা চমক থাকতো। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীকে নিখুঁত করে তুলে ধরতেন। কণ্ঠস্বরের ওঠানামাকে এমনভাবে ভাসিয়ে দিতেন যাতে আমরা প্রতি মুহূর্তে উত্তেজিত হতাম। সামান্য ভুরু ভঙ্গীতে ঝড় তুলতে পারতেন। এ সবই শিখেছিলেন। তাছাড়া, এগুলো করতে খুব বেশি সময় নিতেন না। এক পলকের মধ্যে তাঁর এই কায়দাগুলো শেষ হয়ে যেতো। এটাই তাঁর সাফল্যের মূল তা কিন্তু নয়।

থার্স্টন মানুষ সম্পর্কে প্রকৃত আগ্রহী ছিলেন। তিনি আমায় বলেন, বহু যাদুকর দর্শকদের লক্ষ্য করে নিজেদের বলতে চায় —আমার সামনে একদল গবেট বসে আছে, ওদের ঠিক বোকা বানাবো।

আমি কিন্তু কখনো তা ভাবিনি। মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেকে বলতাম —আমি কৃতজ্ঞ যে এতো মানুষ টিকিট কেটে আমার খেলা দেখতে এসেছেন। এঁরাই আমার জীবনটা ভালো ভাবে কাটাতে সম্ভব করে তুলেছেন। অতএব আমার উচিত, কোনোক্ষেত্রে তাঁদের সাথে প্রতারণা না করা। তাঁরা আমার কাছে যা চাইছেন, সবকিছু উজাড় করে দেওয়া।

তিনি এটাও বলেছিলেন —পাদপ্রদীপের তলায় তিনি কখনো নিজেকে একথা না বলে দাঁড়াতেন না। আমি যেমন আমার দর্শকদের ভালোবাসি, ঠিক তেমনই আমি আমাকে ভালোবাসি। অর্থাৎ আমার ভালোবাসা এবং দর্শকদের ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আপনি হয়তো ভাবছেন, যাদুকর বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর সফলতা দেখে আমার মনে হয়েছিল, তাঁর স্বপ্ন এবং ভাবনার মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

এবার আমি আর এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের কথা বলি। তিনি হলেন মাদাম শুম্যান হিঙ্ক।

তিনি সঙ্গীত জগতের একেবারে সর্বোচ্চ শিখরে পা রেখেছিলেন। কিন্তু যদি তাঁর জীবনের একটা দুঃখজনক অধ্যায়ের কথা আমি বলি, তাহলে আপনারা হয়তো একেবারে অবাক হয়ে যাবেন।

একবার তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে সন্তানসহ আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তীর গায়িকা। তিনিও স্বীকার করেছিলেন —মানুষকে ভালোবাসার জন্যই তাঁকে আজ এখানে এনেছে।

থিওডোর রুজভেল্ট কেন এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? এক্ষেত্রে একই কথা বলতে হবে। তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল শিশুর মতো নরম, শুধু দক্ষ প্রশাসকরাই নয়,

পরিচালকেরাও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর নিগ্রো পরিচারক জেমস ই অ্যামস তাঁর সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। বইটি হলো থিওডোর রুজভেল্ট, হিরো অফ হিজ ভ্যালে —এই বইতে অ্যামস একটি সুন্দর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

...একবার আমার স্ত্রী প্রেসিডেন্টকে পাখি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে কোনোদিন কোয়েল পাখি দেখেনি। প্রেসিডেন্ট তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে আমাদের কটেজের টেলিফোন বেজে উঠলো। —(অ্যামস এবং তার স্ত্রী অয়েস্টার বেপ রুজভেল্ট এস্টেটে বাস করতো।) আমার স্ত্রী টেলিফোনে সাড়া দিতেই স্বয়ং মি. রুজভেল্টের গলা শুনতে পেলো। প্রেসিডেন্ট জানালেন, তিনি কেন ফোন করেছেন। তিনি এইমাত্র দেখছেন, জানলার ধারে একটা কোয়েল পাখি বসে আছে। এটাই হলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ঐ কথাটা তিনি মনে রেখেছেন। শত কাজের মধ্যে ভুলে যাননি। তাই চোখের সামনে পাখি দেখে আমার স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, স্ত্রী যেন তখুনি এসে স্বচক্ষে কোয়েল পাখি দেখে। এটিই হলো রুজভেল্টের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ। তিনি প্রত্যেকের ছোটোখাটো ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুরুত্ব দিতেন। কিসে তাদের খুশি করা যায় তা ভাবতেন।

যখনই তিনি আমাদের কটেজের পাশ দিয়ে যেতেন, আমরা তখন কাছাকাছি না থাকলেও তিনি জেমস বলে ডাকতেন। যাওয়ার মুখে এটা ছিল তাঁর বন্ধুত্বের ডাক।

এমন একজন মানুষকে ভালো না বেসে কি থাকা যায়? তাছাড়া ভালো না বাসার কোনো কারণও ছিল না, রুজভেল্ট একবার হোয়াইট হাউসে আসেন। সেইসময় প্রেসিডেন্ট ট্যাফোর্ড আর মিসেস ট্যাফোর্ড বাইরে ছিলেন। সাধারণত আমরা যাদের সাথে কথা বলতে চাই না, সেই তথাকথিত মানুষদেরও রুজভেল্ট খুবই ভালোবাসতেন। তিনি হোয়াইট হাউসের সমস্ত পরিচারকদের নাম ধরে ডাকতেন। এমন কী রান্না ঘরের পরিচারিকার সাথেও তাঁর সুন্দর সুমধুর সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে আর টিবার্ট লিখেছেন —তিনি রান্নাঘরের পরিচারিকা অ্যালিসকে দেখতে পেয়ে বললেন —সে কখনো ভুট্টার রুটি বানায় কিনা। অ্যালিস জানালো, সে মাঝে মাঝে বানায় বটে, পরিচারকদের জন্যে। তবে ওপরতলার কেউ তা খায় না।

রুজভেল্ট উজ্জ্বল হয়ে বললেন —তাদের রুচিটাই বাজে। প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা হলে বলবো।

অ্যালিস প্লেটে করে তার জন্যে একটা রুটি নিয়ে এসেছিল। তিনি সেটা চিবোতে চিবোতে অফিসের দিকে চললেন। যাওয়ার সময় পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত মালী আর মজুরদের শুভেচ্ছা জানালেন।

তিনি অতীতে যেভাবে সবাইকে ডাকতেন, সেভাবেই তাদের ডাকলেন। তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে এইকথা আলোচনা করে।

অ্যালিস সজল চোখে একবার বলেছিল —দু'বছরে এটাই ছিল আমাদের জীবনের সব থেকে আনন্দময় দিন। আমাদের কেউই একশো ডলারের বদলেও এই মুহূর্তটাকে হাতছাড়া করতে রাজি ছিলাম না।

অন্যান্য মানুষদের সমস্যা সম্পর্কে এমন গভীর ভাবনাই ডঃ চার্লস এলিয়টকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে সফল প্রেসিডেন্ট হবার মর্যাদা দিতে পেরেছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়া অব্দি তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি কীভাবে কাজ করতেন তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একদিন কলেজে প্রথম ভর্তি হওয়া একজন ছাত্র এল আরজি

ক্যান্ডন প্রেসিডেন্টের অফিসে গিয়ে ছাত্রদের ঋণ ভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশ ডলার ধার নিতে চেয়েছিল। তার এই আবেদন মঞ্জুর করা হলো।

এবার তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা সে নিজের ভাষাতেই জানিয়েছিল।

এরপর আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলে আসতে চাইছিলাম। তখন প্রেসিডেন্ট এলিয়ট বললেন —দয়া করে একটু বসো। আমি দারুণ অবাক হলাম। তিনি আবার বললেন —আমি শুনলাম, তোমার নিজের ঘরে তুমি রান্না করে খাও। আমার মনে হয় কাজটা তোমার পক্ষে খুবই ভালো, যদি তুমি ঠিকমতো খাবার বানাতে পারো। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন তাই করতাম। তুমি কি কখনো মাংসের রুটি বানিয়েছো? জিনিসটা বানাতে পারলে খুবই ভালো হয়। একটুও নষ্ট হয় না। এবার শোন, আমি কীভাবে বানাতাম। তারপর তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে মাংস কেটে ধীরে ধীরে রান্না করতে হয়। যাতে সবটা শুকিয়ে না গিয়ে বেশ শুকনো হয়। তারপর রুটির মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হয়।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, মানুষের প্রতি আগ্রহী হলে আমেরিকার সব থেকে দামী লোকের নজর কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়। এখানেও একটা উদাহরণ আছে।

বেশ ক'বছর আগে আমি ব্রুকলীন ইনস্টিটিউট অফ পারফরমিং সায়েন্সে গল্প লেখার একটি পাঠ্যক্রম পরিচালনা করেছিলাম। আমরা সেখানে বিভিন্ন লেখকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁরা ছিলেন তখনকার দিনে খুবই জনপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে আমি ক্যাথরিন নরিস, ফ্যানি হার্স্ট, লিউপাথ হিউম্যানের নাম করতে পারি। আমরা তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, আমরা তাঁদের পরামর্শ পেতে খুবই আগ্রহী। আমরা জানতে চাইছি, তাদের সাফল্যের আসল চাবি কাঠি কোথায়।

প্রতিটি চিঠিতে অন্তত দেড়শো জন ছাত্রছাত্রী সই করেছিল। আমরা লিখেছিলাম—আমরা জানি, আপনারা খুবই ব্যস্ত মানুষ। কোনো বক্তৃতা তৈরি করা আপনাদের পক্ষে কঠিন। তাই আমরা কিছু প্রশ্ন পাঠালাম। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেলে আমাদের কাজের মধ্যে আমরা তা লাগাতে পারবো। আমরা দেখলাম, ওরা এটা পছন্দ করছেন। অবশ্য অনেকেই এটাকে বাজে অজুহাত হিসাবে ছুঁড়ে ফেলেছেন। অনেকে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ব্রুকলীনে আমাদের পাশে দাঁড়াতে চাইলেন।

ঠিক এইরকম পদ্ধতিতে আমি জেসলি এম শ, থিওডোর রুজভেল্টের অর্থ সেক্রেটারি, ট্যাফোর্ডের ক্যাবিনেটের অ্যাটর্নি জেনারেল জর্জ ডবলিউ উইকার্স হ্যাম, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট আর অনেক বিখ্যাত মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁরা এসে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতেন। এক আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হতো।

কসাই, রুটিওয়ালা বা সিংহাসনে বসা রাজা ও আপনি যাই হোন না কেন, প্রশংসা আপনাদের গলিয়ে দেবে। জার্মানীর কাইজারের কথাটাকেই এখানে একটা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, তিনি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ঘৃণিত এবং বিতর্কিত মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। এমনকি তাঁর দেশবাসীও তাঁর সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল। নিজের প্রাণ বাঁচাতে বেচারী কাইজারকে শেষ পর্যন্ত হল্যান্ডে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তখন আকাশ ছুঁয়েছে। অবস্থা এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে গিয়েছিল যে যদি তাঁকে চোখের সামনে কেউ দেখতো তাহলে হয়তো টুকরো টুকরো করে তাঁর শরীরটা ছিঁড়ে ফেলতো। অথবা জীবন্ত দেহটাকে আগুনে নিক্ষেপ করতো।

এইরকম ক্রোধ আর ঘৃণার মধ্যে একটি ছোট ছেলে কাইজারকে একটা চিঠি লেখে। ছেলেটি আন্তরিক ভাবে কাইজারের প্রশংসা করেছে। ছোটো ছেলেটি লিখেছিল —অন্যরা যা বলে বলুক, সে সবসময় উইলহেলমকে সম্রাট হিসাবে ভালোবেসে যাবে।

কাইজার চিঠিটা পেয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি আন্তরিক ভাবে চেয়েছিলেন, ছেলেটি যেন এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। ছেলেটি এসেছিল, তার সঙ্গে মাও এসেছিল। কাইজার পরে ছেলেটির মাকে বিয়ে করেছিলেন। ছোটো ছেলেটিকে বন্ধুলাভ এবং প্রভাব বিস্তার গোছের কোনো বই পড়তে হয়নি। ব্যাপারটাকে সে অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিল। এবং যেহেতু তার বয়েস কম ছিল, তাই সে মিথ্যে আত্ম-অহমিকা বোধে আচ্ছন্ন ছিল না। মনের ভাবনাকে অতি সহজেই প্রকাশ করতে পেরেছিল। এর কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ ছিল।

আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আমরা কাইজারকে চিঠি লেখার আগে তিনবার ভাবতাম। আমরা ভাবতাম, এই চিঠি লিখলে আমাদের ওপর কোনো বিরূপ আঘাত আসবে কিনা।

আমরা যদি সত্যি সত্যি বন্ধুত্ব করতে চাই, তাহলে অন্যদের অন্য কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই কাজের জন্যে সময় দিতে হবে। মানসিকতাকে উদার করতে হবে। নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে হবে। চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ এবং প্রগতিশীল করতে হবে। ডিউক অব উইণ্ডার যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন, তখন দক্ষিণ আমেরিকা সফরে যাবেন বলে ঠিক করেন। এর জন্য তিনি কী প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বলুন তো? যেহেতু দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা স্প্যানিশ, তাই তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, দক্ষিণ আমেরিকাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে। এর ফল হয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। অচিরেই দেখা গেল, দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ তাঁকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছেন।

অনেকদিন ধরে আমি ঠিক করেছিলাম, আমার বন্ধু-বান্ধবদের জন্মদিনের তারিখটা মনে রাখবো। কিন্তু কীভাবে এটা করবো?

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আমার কণামাত্র বিশ্বাস নেই। তবুও আমি সদ্য আলাপিত লোককে বলতাম, আচ্ছা, আমি একটা বিষয়ে গবেষণা করছি। তা হলো, মানুষের জীবনে জন্মদিনের কোনো প্রভাব আছে কিনা। অনুগ্রহ করে আপনি কি আপনার জন্মতারিখটা জানাবেন?

লোকটি প্রথমে আশ্চর্য হতেন। তারপর অনায়াসেই বলতেন চব্বিশে নভেম্বর। আমি স্মৃতির খাতায় তারিখটি টুকে নিতাম। তারপর সত্যি সত্যি ডাইরীর পাতায় তারিখটি লিখে নিতাম। এইভাবে আমি অনেকের জন্ম তারিখ লিখে নিয়েছিলাম। তারপর কী করলাম? তারপর দিন এবং মাস অনুসারে তারিখগুলো লিপিবদ্ধ করলাম। এবার আমার আসল কাজ শুরু হলো। ঠিক তারিখটা এলেই তাঁর কাছে আমার শুভেচ্ছা পত্র চলে যায়। এর প্রতিক্রিয়া দারুণ হলো। হয়তো এমন অনেকে আছেন যিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। পরিবারের লোকজনও তার জন্মদিনটা ভুলে গেছে। অথচ আমার কাছ থেকে শুভেচ্ছা পত্র পেয়ে তিনি একেবারে অবাক হয়ে যেতেন। এইভাবে আমি জনসংযোগের একটি নতুন সরণীকে উন্মুক্ত করতে পেরেছিলাম।

আমরা যদি সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সজীব ভঙ্গিতে এই বন্ধুত্বকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। কেউ টেলিফোন করলে এমনভাবে হ্যালো বলতে হবে যাতে ওপাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি বুঝতে পারে, তার গলা শুনে সত্যি সত্যি আমি

আনন্দিত হয়েছি।

দি নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানী তাদের অপারেটরের জন্যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছে। সেখানে তারা একটি বিষয় বারবার বলতে চেষ্টা করছে। ফোন এলেই বলতে হবে, সুপ্রভাত, আপনি যে আমাকে সেবা করার সামান্য সুযোগ দিয়েছেন, এতেই আমি ধন্য হয়েছি।

কাজে কর্মে এই দার্শনিক তত্ত্বটা কীভাবে প্রেরণা দেবে? এর অনেকগুলো বাস্তব উদাহরণ আমার কাছে জমে আছে। তবে তার থেকে মাত্র দুটি আপনাদের সামনে তুলে দেবো।

নিউইয়র্ক শহরের এক বড়ো ব্যাঙ্কের চার্লস আর ওয়াল্টারসের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বলা হয় একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে গোপন প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। ওয়াল্টারস জানতেন, মাত্র একজন লোকই এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। মি. ওয়াল্টারস তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। ঐ ভদ্রলোক বিরাট প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা। সামাজিক প্রতিপত্তির চূড়ায় বসে আছেন। মি. ওয়াল্টারসকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওয়াল্টারস বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো, প্রেসিডেন্টকে কিছুতেই প্রভাবিত করা যাচ্ছে না। নিজের সম্পর্কে অথবা নিজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উনি কোনো কথাই বলছেন না। তবে অন্তরঙ্গ আলাপ চারিতাতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন। অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে একে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট গম্ভীর মুখে বলেছেন, আমার বারো বছরের ছেলের একমাত্র সখ হলো ডাক টিকিট জমানো, রোজ সে আমার কাছে নিত্য নতুন ডাক টিকিটের জন্যে বায়না করে। আচ্ছা বলুন তো, আমি কিভাবে এতো স্ট্যাম্প যোগাড় করে দেবো।

বিফল মনোরথে মি. ওয়াল্টারস বাড়িতে ফিরে এলেন। নৈশভোজ শেষ হয়ে গেল। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সারা দিনের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। কীভাবে প্রেসিডেন্টের হৃদয় অভ্যন্তরে ঢোকা যায় তার একটা রাস্তা বের করতে হবে। একথা-সেকথা ভাববার পরে হঠাৎ তার মনে হলো, আচ্ছা প্রেসিডেন্টের ছেলে তো ডাকটিকিট জমাতে ভালোবাসে। আর আমাদের বিদেশ দপ্তরও ডাকটিকিট জমায়। সাত সমুদ্র পার হয়ে বিভিন্ন মহাদেশের যত ডাকটিকিট সেখানে সযত্নে সাজানো থাকে।

তাহলে? দুই আর দুইয়ে যোগ করলে তো চারই হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরদিন বিকেলে আবার প্রেসিডেন্টের কাছে হাজির হলেন।

তিনি বললেন —স্যার, আপনার ছেলের জন্যে আমি কিছু নতুন ডাকটিকিট নিয়ে এসেছি।

তাঁকে খাতির করে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রেসিডেন্ট অনেক কথা বললেন। এ কথা সাধারণত তিনি কাউকে বলতে চান না। তিনি ওয়াল্টারসের সাথে এতো জোরে করমর্দন করলেন, মনে হচ্ছে তিনি যেন কংগ্রেসের জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন।

তিনি ওয়াল্টারসের আনা ডাকটিকিট দেখে খুবই খুশী হলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার জর্জ এগুলো খুবই পছন্দ করবে। ডাকটিকিটগুলো নড়াচড়া করতে থাকলেন।

তারপর তারা প্রায় আধঘণ্টা ডাকটিকিট নিয়ে আলোচনা করলেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ছেলের ছবি দেখানো হয়েছিল। তারপরেও একঘণ্টা ধরে কথাবার্তা বলা হলো। ওয়াল্টারস সমস্ত খবর পেয়ে গেলেন। তাঁকে কোনোরকম চেষ্টাই করতে হলো না। প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে যা যা জানার ছিল, তা সহজেই জানলেন। তারপর অধীনস্ত কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়ে সেই খবর তাদের হাতে তুলে দিলেন। নিজের সহকর্মীদের টেলিফোন

করলেন। বলতে গেলে খবর আর রিপোর্টের একটি বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলেন।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এই প্রসঙ্গে আমরা ফিলাডেলফিয়ার মি. এম ন্যাভলে জুনিয়ারের কথা বলবো। তিনি তিন বছর ধরে একটি চেনস স্টোরকে কয়লা বিক্রি করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ চেইন স্টোর কোম্পানী শহরের বাইরের এক সরবরাহকারীর কাছ থেকে কয়লা কিনে আবার মি. ন্যাভলের অফিসের দরজার সামনে দিয়েই নিয়ে আসতো।

ন্যাভলে ভাবতেন, কীভাবে এই অর্ডারটা হস্তগত করা যেতে পারে। ন্যাভলে আমার ক্লাসে এসেছিলেন। তিনি ঐ চেইন স্টোরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন। তিনি বলেন, এরা হচ্ছে দেশের পয়লা নম্বর শত্রু।

তিনি খালি অবাক হয়ে জানতে চাইতেন, তিনি কেন ঐ চেইন স্টোরকে তার কয়লা সরবরাহ করতে পারছেন না।

আমি ওনার অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আমি ওনাকে অন্য কৌশল কাজে লাগাতে বলেছিলাম। তারপরেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। আমি বলেছিলাম, একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করলে কেমন হয় —বিতর্কের বিষয় হলো —চেইন স্টোর দেশের পক্ষে ভালো করার বদলে মন্দই করে চলেছে।

ন্যাভলে আমার পরামর্শের অন্য দিকটি নিলেন। তিনি চেইন স্টোরের হয়ে বক্তব্য রাখতে রাজী হলেন। তারপর সোজা হাজির হলেন ঐ চেইন স্টোরের এক কর্মকর্তার কাছে। সেই ভদ্রলোককে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। কিন্তু সেই ঘৃণার কথাটা প্রকাশ করলেন না।

তিনি সোজাসুজি বললেন —স্যার, আমি আপনাকে কয়লা বিক্রি করতে আসিনি। আমি একটি অন্য ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করতে এসেছি।

এবার ন্যাভলে বিতর্কের বিষয়টা জানালেন। তিনি বললেন, আমি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। কেননা আমি যে কথা বলতে চাই, তার জন্যে কয়েকটা পয়েন্ট দরকার, সেগুলো একমাত্র আপনি জানেন। প্রতিযোগিতাতে যে ভাবেই হোক জিততে হবে। তাই আপনি আমাকে যদি সাহায্য করেন, আমি সারাজীবন তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবো।

এরপর কী ঘটেছিল সেটা মি. ন্যাভলের নিজের কথাতেই শুনুন। আমি ভদ্রলোকের কাছে ঠিক একমিনিট সময় দিতে অনুরোধ করেছিলাম। এই শর্তেই তিনি আমার সাথে কথা বলতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রয়োজনের কথাটা শোনার পর তিনি আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলেন। এক ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট আমার জন্যে খরচ করেন। এরপর তিনি আর একজন কর্মকর্তাকে ডাকলেন। ঐ ভদ্রলোক চেইন স্টোর সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি অন্যান্য চেইন স্টোর সংস্থা থেকে বই আনিয়ে দিলেন। তাঁর মত হলো, আমেরিকার বুকে যতগুলো চেইন স্টোর আছে, তারা অক্লান্তভাবে সাধারণ জনগণের সেবা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, সমাজের নানা স্তরের মানুষের জন্যে তারা যেভাবে নিঃস্বার্থ চিত্তে সেবা করছেন তার জন্য তাঁকে খুবই গর্বিত বলে মনে হলো। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আমি স্বীকার করছি, নানা অজানা বিষয়ে তিনি আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। আমি এটি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তিনি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে পাল্টে দিয়েছিলেন। যখন আমি চলে আসছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বিতর্ক সভায় আমার সৌভাগ্য প্রার্থনা করলেন। পরে একসময় দেখা করে আমায় বিতর্ক কিরকম হলো তা জানাতে বললেন। শেষ যে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন, তা হলো —বসন্ত কালের শেষে আমার সাথে আরো একবার দেখা করবেন। আমি ভাবছি আপনার

কাছ থেকে কিছু কয়লা কিনবো।

এই ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যি সত্যি অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল। কেননা আমি সেবার কয়লা কেনা সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব করিনি অথচ তিনি উপযাচক হয়ে কয়লা কিনবেন বলে জানালেন। তাঁর সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে আমি দু-ঘণ্টার মধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু কয়লার প্রতি তাঁকে আগ্রহী করে তুলতে চাইলে হয়তো দশ বছরেও তা করতে পারতাম না।

আপনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি মি. ন্যাভলে, বহুবছর আগে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের একশো বছর আগে এক বিখ্যাত রোমান কবি পাবলিয়ান সাইরাস বিষয়ে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেছিলেন— আমরা অন্যের প্রতি যখনই আগ্রহী হই, অন্যেরা তখন আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

অতএব যদি আপনি আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চান, তাহলে আপনার নীতি হবে, অন্যের প্রতি সত্যিকারের আগ্রহী হয়ে উঠুন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে। ডঃ হেনরি লিঙ্কের দি রিটার্ন টু রিলিজিয়ন বইখানা পড়ে দেখতে পারেন। নামটা শুনে যেন ঘাবড়ে যাবেন না। এই বইটা সত্যি সত্যি আপনার ঘুমন্ত ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলবে।

পাঁচ

ভালো লাগানোর সহজ পথের সন্ধানে

কিছুদিন আগে আমি নিউইয়র্কে একটি ডিনারের আসরে যোগ দিয়েছিলাম।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন। ইদানিং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর অর্থ পেয়েছেন। তিনি তাঁর চেহারার মধ্যে একটা সুখী সুখী অনুভূতির ছাপ ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হীরে, জহরত, মনি মানিক্যের মালা পরেছিলেন। ডলারের অর্থমূল্যে যা হয়তো আকাশ ছোঁয়া হবে। কিন্তু অবাক কথা হলো, তিনি তাঁর মুখের কোনো পরিচর্যা করেননি।

সেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে শুধুই তিক্ততা এবং স্বার্থপরতা। পৃথিবীর সমস্ত লোককে তিনি ঘৃণা করছেন। এই জগতের মধ্যে একমাত্র তিনিই হলেন ভগবানের মতো। আর সকলে তাঁর চাকর-বাকর।

হায়, ঐ ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেননি, এইভাবে লোকের মন জয় করা সম্ভব নয়? পুরুষরা একজন মহিলার কাছ থেকে কী চায়। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, প্রথমেই পুরুষ চাইবে, মহিলা সঙ্গিনীটি যেন যথেষ্ট সুন্দরী হয়ে থাকে। কিন্তু সে জাকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা বহুমূল্যের অলঙ্কার পরলেই সকলের মন জয় করবে এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই। তার মুখ থেকে যদি আত্ম-অহঙ্কারী কথাবার্তা ছিটকে আসে। তাহলে অচিরেই সে পুরুষ সঙ্গীর হৃদয়ে বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে।

তাহলে মুখের কথা পোশাকের থেকে অনেক বেশি দামী নয় কি?

(চুপি চুপি একটা কথা বলি, আপনার স্ত্রী যখন কোনো ফারকোট কিনতে চাইবেন, তখন এই কথাটা মনে রাখবেন এবং তার কানে কানে শুনিয়ে দেবেন।)

চার্লাস সোয়াব একবার আমাকে বলেছিলেন, তাঁর হাসির দাম দশ লক্ষ ডলারেরও

বেশি। কথাটা তিনি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেননি।

সোয়াবের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর আকর্ষণ তাঁকে রাজার রাজা করেছিল। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম মাধুর্য হিসাবে আমরা অনায়াসে তাঁর মুখের হাসিকে চিহ্নিত করতে পারি।

একবার মরিস সেফালিয়ার্ডের সাথে সারাটা বিকেল কাটিয়েছিলাম। তখন আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, তিনি বোধহয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিক। কিন্তু যেই তিনি হাসলেন, মনে হলো ঘন কালো মেঘের আড়াল থেকে রোদ ঝরা সকাল উঁকি মারছে।

মুখের কোণে বিশ্বজয়ী হাসি না থাকলে মরিস সেফালিয়ার্ড বোধহয় প্যারিতে তাঁর বাবা বা ভাইয়ের মতো কাঠের আসবাবপত্র বানানোর কাজেই সারা জীবন থেকে যেতেন।

কোনো কথার চেয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে মনের ভাব বেশি প্রকাশ পায়। তাই হাসির ভেতর নীরব অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে —আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনি যে আমার কাছে এসেছেন তার জন্যে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

এ জন্যেই তো কুকুরদের এতো দাম। আপনাকে দেখে তাদের খুশীর বাঁধ মানে না। আর তাতে আপত্তি আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠেন।

হাসির আবার রকমফের আছে। স্বাভাবিক হাসি এবং কৃত্রিম হাসি। কৃত্রিম হাসি দিয়ে আমরা লোককে ঠকাবার চেষ্টা করি। তবে আমরা কখনো বোঝার চেষ্টা করি না, আমার ঠোঁটের কোণের হাসি যে কৃত্রিম তা ঐ লোকের চোখে পড়ে গেছে।

আমি কিন্তু এখানে সত্যিকারের হাসির কথাই বলবো। যে হাসি আসে অন্তর থেকে। সে হাসির মাধ্যমে আমরা অনায়াসে ভুবন জয় করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের বিরাট একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের নিয়োজক অধিকর্তার কথা বলা যাক। তিনি বলেছিলেন সেলসগার্ল হিসাবে সেই মেয়েরাই চটপটে হয়ে ওঠে, যাদের মুখে সুন্দর হাসির টুকরো লেগে থাকে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে গোমড়া মুখে বসে থাকে, তাহলে সেলসের কাজে সে মোটেই পারদর্শিনী হতে পারবে না।

আমেরিকার সব থেকে বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেকটার বোর্ডের চেয়ারম্যান একবার আমার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি কোনো লোকের চরিত্রের মধ্যে আনন্দের ছাপ না পড়ে তাহলে সে কোনো কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে না।

ঐ ভদ্রলোক কিন্তু প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাস করতেন না। প্রাচীন বইয়ের পাতায় পাতায় লেখা আছে, অমানুষিক পরিশ্রম করলেই সাফল্যকে করায়ত্ত করা যায়। নবীন তর্কবাগীশরা এই ভাবনা-চিন্তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই কথাই বললেন ঐ ভদ্রলোক। তিনি বললেন —আমি এমন সব মানুষকে জানি, যাঁরা কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন বলে আজ সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছেন। যদি কেউ কাজের মধ্যে একঘেয়েমির সন্ধান করেন, তাহলে তিনি কিছুতেই সফল হবেন না।

এখানে আর একটি গুপ্ত কথা বলে দেওয়া উচিত। তা হলো, যদি আপনি চান যে আপনার কাজে অন্যেরা আনন্দিত হোক, তাহলে আপনার উচিত অন্যকে আনন্দদানের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা।

হাজার হাজার ব্যবসায়ীর সাথে আমি মিলিত হয়েছি। তাদের কাছে আমি একটি বিনীত অনুরোধ রেখেছিলাম। আমি বলেছিলাম, সদা পরিচিত থেকে শুরু করে সকলকে দেখেই হাসতে থাকুন। হাসির মাধ্যমে আপনার হৃদয়ের দরজা খুলে দিন। তারপর ক্লাসে এসে

বলুন, আপনার এই আচরণের কী ফল হলো।

কী ফল হয়েছিল বলুন তো?

দেখা যাক, কার্ড এক্সচেঞ্জের মি. উইলিয়াম বি স্টাইনহার্টসের লেখা একখানা চিঠি। এই চিঠিখানা কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের শয়ে শয়ে চিঠি আমার হাতে এসেছে।

মি. স্টাইন হার্টস লিখেছিলেন —আঠারো বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। এই আঠারো বছর সময়সীমার মধ্যে আমি কখনো আমার স্ত্রীকে দেখে হাসিনি। কাজে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে উদ্দেশ্য করে কোনো শুভেচ্ছা বাক্য বলিনি। সত্যি কথা বলতে কী, ব্রডওয়েতে আমি ছিলাম সব থেকে অসুখী মানুষ।

যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, হাসি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে বললেন, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হাসি যে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে, এই প্রাথমিক ধান-ধারণাটাই আমার জানা ছিল না। তবু আমি আপনার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করিনি। আমি খালি বলেছিলাম, লেখক, আমাকে কিছুটা সময় দিন। আমি চেষ্টা করে দেখবো।

পরদিন সকালে আয়নার সামনে আমার মুখখানা ভেসে উঠলো। নিজেকে এইভাবে আবিষ্কার করে আমি অবাক হলাম। একি! আমার মুখ যে গেঁচার মতো। চুলে চিরুনী বোলানোর সময় আমি মনে মনে স্থির করলাম, অনেক হয়েছে। আর আমি এভাবে দিন কাটাবো না। আজ থেকে ঠাট্টা হাসিতে আমাকে মশগুল থাকতেই হবে।

এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। কাকে উদ্দেশ্য করে আমি হাসবো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, যেন আমার সহবাসিনী। আঠারোটি বছর যার সাথে আমি কাটিয়েছি। তাকে বললাম —সুপ্রভাত প্রিয়া।

এর কী পরিণতি হয়েছিল? স্ত্রী অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন ব্যবহার করতে আমাকে সে কখনো দেখিনি ও বেশ বাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। হয়তো একটা সজোরে ধাক্কা খেয়েছিল। আমি স্ত্রীকে বললাম —রোজই আমার এই পরিবর্তন দেখবে তুমি। আগামী দু'মাস ধরে আমি এমন ভাবেই তোমার সাথে ব্যবহার করে যাবো।

লেখক আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আমার এই পরিবর্তিত মানসিক ভঙ্গী আমাকে অশেষ সুখের সন্ধান দিয়েছে। গত দু'মাস ধরে আমি সেই সুখকে করায়ত্ত করতে পেরেছি।

যখন অফিসে যাই, দারোয়ানকে আমি সুপ্রভাত জানাই। কমবয়ের হাতে হাত রেখে করমর্দন করে। সাবওয়ের ক্যাশিয়ারকে খুচরো নেবার সময় অভিনন্দন জানাই। অফিসের দরজাতে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের সকলের সাথে এখন আমার ভালোবাসার সুমধুর সম্পর্ক।

হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম, তাদের আচরণের মধ্যেও স্মরণযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এতোদিন তারা আমাকে কোনোভাবেই সম্ভাষণ করতো না। কেমন যেন নিস্পৃহ চোখে আমাকে জরিপ করতো। কৃত্রিমতার আচরণ ছিল তাদের শরীরের সবখানে। এখন আমাকে দেখা মাত্র তারা সোল্লাসে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কে আগে আমার হাতে হাত রেখে করমর্দন করতে পারবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে।

আমি হাসিমুখে অনেক অভিযোগের সমাধান করতে পারছি। আগে যে সমস্যাগুলো আমার কাঁধের ওপর পাহাড়ের মতো চেপে বসতো, এখন সেগুলো বসন্তের ফুরফুরে বাতাসে হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি দেখছি, হাসি আমার সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে।

আর একজন ব্রোকারের সঙ্গেই আমি আমার অফিস চালাই, তার একজন কেরানী আছে।

ভারি চমৎকার একটি তরুণ। আমার এই হাসির ফলাফল তাকেও আক্রান্ত করেছিল। একদিন আমি হাসতে হাসতে আমার এই পরিবর্তিত জীবন দর্শনের কথা তাকে বলে ফেললাম। সে তখন স্বীকার করলো, নিজেকে প্রচণ্ড অসুখী বলে ভাবে সে। আমার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো সে। সে বললো, সত্যিই তো স্যার, হাসির মাধ্যমে আমরা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি।

সমালোচনা করার প্রোতটাকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি আর কোনো অধস্তন কর্মচারীকে কোনোভাবেই দোষারোপ করি না। আমি কী চাইছি সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। আমি অন্যের দৃষ্টিতে নিজেকে যাচাই করি। বলতে গেলে, আমার জীবনে একটা ছোট্ট বিপ্লব ঘটে গেছে। আমি এখন সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষে পরিণত হয়েছি। অর্থবান, বন্ধুত্বে সমৃদ্ধ এবং সুখী মানুষ। জীবনে এর থেকে বেশি আর কিবা আমরা আশা করতে পারি?

ব্যাপারটা মনে রাখবেন, কেননা এই চিঠি যিনি লিখেছেন, তাঁর প্রধান কাজ হলো শেয়ার কেনাবেচা করা। এই ব্যবসাটা খুবই কঠিন। ঠিকমত ঠিক জায়গায় ঠিক শেয়ারে টাকা লগ্নী করতে হবে। সামান্য ভুল চুক হলে ক্লায়েন্ট আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। ঘাড়ের ওপর অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিঃশ্বাস ফেলছে। আর, আর একটি গোপন কথা চুপি চুপি আপনাদের জানিয়ে রাখি, তা হলো, শতকরা নিরানব্বই জন কিন্তু এ ব্যবসাতে দারুণ ভাবে ব্যর্থ হন।

এখানে অনেকগুলো বাস্তব সমস্যার কথা উঠবে। যেমন ধরুন, কোনো কারণে হয়তো আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আপনি এখন জোর করে কীভাবে হাসবেন? অথবা আপনি হাসলে লোকে সে হাসিকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে?

এক্ষেত্রে আমার উপদেশ মেনে চলুন। প্রথমে জোর করে হাসার চেষ্টা করুন। যদি একলা থাকেন, তাহলে পুরোনো কোনো একটা গান ভাবার চেষ্টা করুন। হাতে হাতে তালি দিন, শিস দিন। ভাবতে চেষ্টা করুন আপনি সুখী, সুখ একটা অনুভূতি। পৃথিবীর দরিদ্রতম ব্যক্তিও নিজেকে সুখীতম সম্রাট বলে মনে করতে পারে। অজস্র অর্থের অধিকারী হয়েও মানুষের মনে অসুখ বাসা বাঁধতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসের কথা বলি। তিনি বলেছিলেন —আসল কাজ আর অনুভূতি একই সঙ্গে চলে। কাজের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কাজ মনের এক্তিয়ারে থাকে। পরোক্ষে অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কেননা অনুভূতি ইচ্ছার বশবর্তী নয়।

তাই সুখী হওয়ার একমাত্র পথ হলো, মনে মনে সুখভাব নিয়ে আসা, সত্যি সত্যি যদি আপনার মনের ভেতর সুখ না থাকে, আচরণের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটতে দেবেন না।

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ সুখ অনুসন্ধান করে চলেছে। সেটা লাভ করার একটিমাত্র পন্থা আছে। তা হলো, দুশ্চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুখ কখনোই বাইরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে না। সুখ নির্ভর করে ভেতরের উপাদানের ওপর। এটি বক্তশীল ব্যবস্থাপনায় এসেছে। আপনি কে, আপনার কী আছে, আপনি কত টাকা অর্জন করেছেন, এসবের ওপর সুখ নির্ভর করে না। সুখ সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন, তার ওপর সে নির্ভরশীল।

ব্যাপারটা খুব খটমট বলে মনে হচ্ছে কি? আসুন, আর একটা সহজ সাধারণ সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যাক।

দু'জন লোক হয় তো একই কাজ করতে পারে। দু'জনের হাতে একই রকম টাকা

আছে। তারা একই রকম সামাজিক সম্মান পেয়েছে। তবুও তাদের একজন অত্যন্ত সুখী এবং অন্যজন নয় কেন? এর কি কোন গোপন রহস্য আছে।

এর একটি রহস্য আছে। তা হলো, মানসিক অবস্থান। প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল চীনদেশের কুলীদের কথা। তারা ঘামে ভিজে প্রচণ্ড রোদে সারাদিন কাজ করে। দিনান্তে মাত্র সাত সেন্ট করে মজুরী পায়। কিন্তু তাদের মুখের হাসি কেউ কাড়তে পারেনি। আবার, এখানকার পার্ক এভেনিউর সব থেকে ধনী মানুষও দিনান্তে মুখ বেজার করে বাড়ি ফেরে। তার কাছে দিন কেটে যাওয়াটা একটি পাপক্ষয় ছাড়া আর কিছু নয়।

শেক্সপীয়ার বলেছিলেন —পৃথিবীর কোনো কিছুই ভালো বা খারাপ নয়। কোন জিনিসকে আমরা কীভাবে দেখবো, তার ওপর ভালোত্ব বা খারাপত্ব নির্ভর করছে। অর্থাৎ চিন্তাই সব ব্যবধান করে দিচ্ছে। কথাটা ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমি লিঙ্কনের কথাও বলবো। লিঙ্কন একবার বলেছিলেন —মানুষ যতটা সুখী হতে চায়, সে ততটাই হতে পারে। সুখের কোনো "পরিসীমা নেই। ইচ্ছে করলেই সুখকে আমরা আকাশ অভিসারী করে তুলতে পারি।

আমি একদিন নিউইয়র্কের লঙ আইল্যান্ড স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। ঠিক আমার সামনে তিরিশ বা চল্লিশজন প্রতিবন্ধী লাঠি আর ক্র্যাচে ভর রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলো। একটি ছেলেকে প্রায় কোলে তুলেই ওঠানো হচ্ছিল।

তার হাসিতে ভরা মুখ লক্ষ করে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ছেলেটির সাথে একজন অভিভাবক ছিলেন। তাঁকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন —হ্যাঁ, আমরা আমাদের আচরণের মধ্যে কখনোই হীনমন্যতার ছাপ ফুটিয়ে তুলি না। আমরা কখনোই ছেলেটিকে এই শোকাচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাপারটা বুঝতে দিই না। তার যে একটি পা খোঁড়া সারাজীবন তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে এটা তো স্বীকৃত সত্য। কখনো কোনো মানুষের দুর্বলতাকে অকারণে খুঁচিয়ে তুলতে নেই। কেননা, যেটা এখন সাময়িক দুর্বলতা বলে মনে হচ্ছে, পরে সেটাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। এই ছেলেটির এটাই হলো ভবিতব্য। এখন দেখুন, সে কেমন অন্য ছেলেদের সাথে মিলেমিশে পথ চলার চেষ্টা করছে।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, ঐ তথাকথিত খোঁড়া ছেলেটিকে অভিনন্দন জানাতে। ওর কাছ থেকে, ওর হাসিতে উল্লাস মুখ থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, হাজার হাজার ডলার খরচ করেও তার সিকিভাগ পেতাম না।

এবার আমি মেরী পিকফোর্ডের কথা বলি। তখন তাঁর জীবন একটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রহরের মধ্যে দিয়ে কাটছে। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। সমস্ত সন্ধ্যা তিনি আমার সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। সকলে ভেবেছিলেন মেরী পিকফোর্ড বোধ হয় দুনিয়ার সব থেকে অসুখী এক বিরক্ত মহিলা। কিন্তু আমি দেখলাম, তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যা তাঁকে বিশ্ববিজয়িনী করে তুলেছে। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে সুখ ফেটে পড়ছিল। এর গোপন রহস্য কী? পঁয়ত্রিশ পাতার একটি ছোট্ট বইতে মেরী পিকফোর্ড তাঁর অন্তরের সকল অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছেন। বইটি হলো হোয়াই নট ট্রাই গড?

একবার আমি ফ্রাঙ্কলিন বেটটারের সাথে কথা বলি, তিনি হলেন আমেরিকার সর্বোচ্চ বীমাকারী পুরুষ। সেন্ট লুই-এর কার্ডিনালের বাসিন্দা। কয়েক বছর আগে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যে মানুষের মুখে সবসময় হাসির টুকরো লেগে থাকে, অফিসে তাকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ জানাই। অর্থাৎ হাসি মুখের মানুষ সহজেই বিশ্বজয়

করতে পারে। যদি কোনো মানুষ আমার ঘরের সুইং ডোর ঠেলে মুখটা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে নোট লিখতে লিখতে আমি প্রথমেই তার মুখের দিকে দৃকপাত করি। যদি দেখি সেখানে আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে দুঃখ জমেছে তাহলে আমি বিরক্ত হই। লোকটিকে ভেতরে আসার অনুমতি আমাকে দিতেই হয়। কিন্তু তার সাথে কথাবার্তা বলার উৎসাহ আমি হারিয়ে ফেলি।

আবার বিপরীত ক্রমে যদি দেখি, ঈষৎ উঁকি মারা লোকটির সমস্ত মুখ হাসিতে ঝলমল করছে, আমি তাকে সাদর সম্ভাষণে ভেতরে ডেকে পাঠাই। আন্তরিক ভাবে তার সমস্যা শুনি। সমস্যাগুলি সমাধান করার ঐকান্তিক প্রয়াসে মগ্ন হই।

এইভাবেই তিনি বীমা করানোর কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন। হাসি মুখের মানুষদের সহজেই বোঝানো সম্ভব হয়। গোমড়া মুখের মানুষেরা কিছুতেই বীমার উপযোগিতা বুঝতে চান না।

এলবার্ট হাভার্ডের কথা বলা যাক। তিনিও এই ব্যাপারে তাঁর উপদেশ দিয়েছেন। তবে এই উপদেশটাকে জীবনে কাজে না লাগালে এর কোনো মূল্য নেই।

তিনি বলেছেন —যখনই বাড়ির বাইরে যাবেন, মাথাটা উঁচু রেখে ফুসফুসে বেশ জোরে হাওয়া নিন। কিছুটা সূর্যকিরণ গায়ে মেখে নিন। বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়া মাত্র হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠবেন। তাদের সাথে আন্তরিকভাবে করমর্দন করবেন। ভুল বোঝাবুঝির কথা মোটেও ভাববেন না। বন্ধুদের কখনো শত্রু ভেবে সময় নষ্ট করবেন না। কী করতে চলেছেন তা ভাবতে থাকুন। মনটাকে দৃঢ় করুন। কিছুই হয়নি এমনভাবে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যান। যেসব দারুণ কাজ করতে মনস্থ করেছেন, সেসব কথাই ভাবতে থাকুন। দেখবেন সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আপনি ক্রমশ দৃঢ় পদক্ষেপে ইচ্ছাপূরণের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

ঠিক যে ভাবে প্রবাল সাগরের ঢেউ থেকে তার দরকারী জিনিসগুলি সংগ্রহ করে নেয়, আপনাকেও পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। ব্যক্তিত্বকে আরো সুখদায়ী করতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আপনি যদি চেষ্টা করেন, তাহলেও হয়তো সফল হবেন না। কিন্তু এতোটুকু হাসি খুশী মনোভাব আপনাকে আরো বেশী আগ্রহী এবং আগ্রাসী করে তুলবে। আসলে চিন্তার মধ্যেই মানুষের আসল ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে থাকে। চিন্তাকে স্বচ্ছ, সুন্দর, শোভন করতে হবে। সবসময় চরিত্রের মধ্যে সারল্যের ভাব আনবে। তাহলেই আপনার দক্ষতা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যেতে পারবে। মনে রাখবেন, প্রতিটি ঐকান্তিক প্রয়াসের জন্ম হয় মানুষের কল্পনাশক্তির মধ্যে। কল্পনাশক্তিকে সুদূর প্রসারী করতে না পারলে আমাদের প্রয়াস মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। তখন আমরা আর সফল হতে পারবো না।

প্রাচীন চীনারা ছিলেন খুবই জ্ঞানী মানুষ। পৃথিবীর নানা বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল অপরিসীম, তাঁদের একটি প্রবাদের কথা আমার এখনো মনে হয়। লেখা আছে যে মানুষের মুখে হাসি নেই, তার কোনো দোকান খোলা উচিত নয়।

দোকানের কথা বলতে গেলে ফ্রাঙ্ক আর ভিনফেতারের বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি এই ঘরোয়া দার্শনিক তত্ত্বগুলো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অনেকদিন কেটে গেছে। কিন্তু এই তথ্যের মূল্যায়ন এখনো হতে পারে—

বড়দিনে হাসির মূল্য।

এতে কোনো কিছু খরচ নেই। তবে এটি অনেক কিছু সৃষ্টি করে।

যারা গ্রহীতা তাদের প্রচুর লাভ হয়। যারা দেয়, তাদের কোনো ক্ষতি হয় না।

এটি ঘটে যায় চোখের আড়ালে। কিন্তু এর রেশ থেকে যায় অনেকদিন।

কেউ এমন বড়ো মানুষ নন যার এটি ছাড়াই চলে যায়। আবার এমন কেউ দরিদ্র

নেই যার এটি লাভ হয় না।

হাসি হলো বন্ধুত্বের এক অমলিন চিহ্ন।

ক্লান্ত মানুষের কাছে হাসি হলো বিশ্রাম।

হতাশ মানুষের কাছে হাসি হলো আশার আলো।

দুঃখীদের কাছে হাসি সূর্যের আলোর সমান।

রোগীর কাছে হাসি তার কষ্ট দূর করার উপশম।

তা সত্ত্বেও হাসিকে কেনা যায় না।

হাসিকে কেউ ভিক্ষা করে চেয়ে আনতে পারে না।

হাসিকে ধার করা যায় না।

হাসিকে চুরি করতে পারা যায় না।

কারণ হাসি যতক্ষণ না কাউকে দেওয়া যায় ততক্ষণ তার কোন জাগতিক মূল্য নেই।

আসুন বড়দিনের শেষ মুহূর্তে কেনাকাটার ভিড়ে ব্যস্ত হয়ে না থেকে হাসতে চেষ্টা করি। হাসির এককণা যদি আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারি, তাহলে হাজার সূর্যের আলো জ্বলে উঠবে।

দেখবেন হাসি বিলোবার মতো মানুষ কিন্তু পৃথিবী থেকে কমে আসছে।

তাহলে, যদি আপনি ঐকান্তিকভাবে চান যে চারপাশের লোক আপনার দিকে আরো বেশি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে, তাহলে হাসুন, হাসুন এবং হাসির হিল্লোলে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা জয় করার মন্ত্রমালা শিখে নিন।

ছয়

ঝামেলা এড়ানোর সহজ পথ

১৮৯৮ সাল।

নিউইয়র্কের রকল্যান্ড কাউন্টিতে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল।

একটি শিশু মারা গিয়েছে। পড়শীরা তার শোকযাত্রার ব্যবস্থা করেছে। থমথমে পরিবেশ। অনেকের চোখে জল। আহা বেচারী, এই বয়সেই শিশুটিকে পরপারের সঙ্গী হতে হচ্ছে, এর থেকে শোকাভিভূত ঘটনা আর কি হতে পারে।

তখনই আর একটি অঘটন ঘটে গেল। জিম ফার্লি নামে এক ভদ্রলোক তাঁর ঘোড়াকে জলপান করতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সারারাত ধরে বরফ পড়েছিল। রাস্তাটা পিছল হয়ে গেছে। আবহাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা, ঘোড়াটিকে ক'দিন বাইরে আনা সম্ভব হয়নি। বাইরে আনতেই সে আনন্দে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলো। তারই আঘাতে জিম ফার্লি মারা গেলেন।

তার মানে? রকল্যান্ড কাউন্টির ছোট্ট স্টোনিপয়েন্ট গ্রামে পাশাপাশি দুটি শবযাত্রার আয়োজন করতে হলো।

মৃত্যুর সময় জিম ফার্লি তাঁর বিধবা স্ত্রীকে রেখে গিয়েছিলেন। ছিল তাঁর তিন পুত্র। কয়েকশো ডলারের বীমাপত্র।

বড়ো ছেলে জুনিয়ার জিমের বয়েস তখন মাত্র দশ বছর। সে একটি ইট তৈরীর কারখানাতে শ্রমিক হিসাবে যোগ দিলো। তার কাজ ছিল বালি মাখা ইট সাজানো। রোদ্দুরে ইট শুকিয়ে নেওয়া। সে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু তার মধ্যে আইরিশ সুলভ ভদ্রতার ছোঁয়া ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সকলের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো।

সবাই তাকে পছন্দ করতো। তরুণ বয়েসে জুনিয়ার জিম রাজনীতিতে যোগ দেয়। বেশ কয়েক বছর কাটার পর তার মধ্যে একটা ক্ষমতা জন্মালো। তা হলো প্রতিটি মানুষের নাম মনে রাখা।

কোনোদিন তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র পাননি। ছেচল্লিশ বছর হবার আগেই চারটি কলেজ তাঁকে সাম্মানিক ডিগ্রি প্রদান করেছিল। তিনি ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টমাস্টার জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেন।

আমি একবার এই আশ্চর্য মানুষের সাথে দেখা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম —জুনিয়ার জিম ফার্লি, আপনি কীভাবে সাফল্যের এই চূড়াতে এসে পৌঁছলেন?

তিনি হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলেন, কঠিন পরিশ্রমে।

আমি অবাক হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, ঠাট্টা করবেন না তো। সত্যি সত্যি বলুন তো, শুধুমাত্র পরিশ্রম করলেই কি মানুষ জীবনে সফল হতে পারে?

তিনি বললেন —পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

এরপরেই তিনি আমাকে আর একটি প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা মি. কার্নেগী, আপনার কী মনে হয় আমি কিসের ওপর ভিত্তি করে সফল হয়েছি?

আমি বলেছিলাম —আমার মনে হয়, এই যে আপনি দুশো মানুষকে তাদের নামে চেনেন, এটাই আপনার সফলতার সব থেকে বড়ো চাবিকাঠি।

তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন —দুশো নয়, আমি পঞ্চাশ হাজার মানুষকে তাদের প্রথম নাম ধরে ডাকতে পারি।

এটা কিন্তু কোনো অতিরঞ্জিত ক্ষমতা নয়। জুনিয়ার জিম ফার্লির সত্যি সত্যি এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা ছিল। যে কোনো মানুষের সাথে একবার দেখা হলেই তিনি তার নাম মনে রাখতে পারতেন। আর এই জন্যই বোধহয় ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পেরেছিলেন।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা যাক। জিম ফার্লি প্রথম দিকে একটি জিপসাম কোম্পানীর হয়ে কাজ করেছিলেন। সেলি পয়েন্টে যখন কেরানীর কাজ করতেন তখন থেকেই সমস্ত গ্রাহকদের নাম মনে রাখার অদ্ভুত কায়দাটা রপ্ত করেন।

ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব সহজ ছিল। যখন তাঁর সঙ্গে নতুন কারো দেখা হতো, তিনি সেই ভদ্রলোকের পুরো নাম জেনে নিতেন। এরই পাশাপাশি আরো জানতেন, তার পরিবারে কোন্ কোন্ সদস্য আছে। কে কী কাজ কর্ম করে। তার রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি।

ঐ ভদ্রলোক সম্পর্কে সব খবর তিনি তাঁর স্মৃতির মনিকোঠায় সযত্নে রেখে দিতেন। একবছর পরেও যদি ঐ ভদ্রলোকের সাথে আবার তাঁর দেখা হতো তিনি পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করতেন, ছেলে স্ত্রী মেয়েরা কেমন আছে? বাগানের ফুল গাছগুলো ঠিকমতো ফুল দিচ্ছে তো? পাপ নামে ছোট্ট বেড়াল ছানাটা এক বছরে বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, তাইতো?

যে কোনো মানুষেরই অবাক হওয়ার পালা। সত্যি সত্যি, কত লোক অবাক হয়ে যেতেন। এর ফলে জিমের জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়তে থাকে।

পরবর্তীকালে তিনি রুজভেল্টের প্রধান নির্বাচন এজেন্ট হয়েছিলেন। নির্বাচন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই জিম ফার্লি জুনিয়ার একটি কাজ করতে শুরু করলেন। তিনি রোজ প্রায় শ খানেক করে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে সেই চিঠি পাঠানো হলো। এরপর? একটি ট্রেনে চড়ে উনিশ দিনের মধ্যে কুড়িটা রাজ্যে বারো হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন। মাঝে কখনো বণি

গাড়িতে চড়েছেন। কখনো মোটর গাড়ির সওয়ার হয়েছেন। কোনো শহরে হঠাৎ করে নেমে পড়েছেন। বন্ধুদের সাথে প্রাতরাশের আসরে যোগ দিয়েছেন। চায়ের টেবিলে বসেছেন। নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন। তাদের সাথে মন খুলে কথা বলেছেন। আবার লোকোমোটিভের যাত্রী হয়েছেন।

পূর্ব দিকে হাজির হলেন তিনি। একজন বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের নাম আর ঠিকানা পাঠাতে। এইভাবে সবার কাছ থেকে তিনি নাম আর ঠিকানা সংগ্রহ করেন। দেখা গেল হাজার হাজার মানুষের নাম এসেছে। ফার্লি জুনিয়ার প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। প্রতিটা চিঠি তিনি আরম্ভ করতেন প্রিয় বিল বা প্রিয় টম —এইভাবে। আর শেষ করতেন তোমার জিম বলে।

জীবনের গোড়াতেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নিজের নামকেই সব থেকে বেশী ভালোবাসে। অপরের মুখে এই নাম উচ্চারিত হলে সব থেকে বেশী খুশী হয়। যদি কেউ এই নামটা স্মরণে রাখে, তাহলে মানুষটির উৎসাহ উদ্দীপনার সীমা থাকে না। আর যদি কেউ নামটা ভুলে যায়, তাহলে লোকটি ভাবতেই পারেন, উনি আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছেন না।

এখানে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি একবার প্যারিস শহরে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেখানকার সমস্ত আমেরিকানদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। যিনি চিঠিগুলো টাইপ করেছিলেন তিনি ভালো ইংরাজী জানতেন না। ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তারা নামের ক্ষেত্রে নানা গণ্ডগোল করে ফেলেছিলেন। প্যারির এক আমেরিকান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এতে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি আমার কাছে এসে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তার থেকেই বোঝা যায়, নিজের নামকে মানুষ সব থেকে প্রিয় সম্পদ হিসাবে ভালোবাসে এবং সে চায় সকলেই এই নামটির প্রতি একটু আলাদা আকর্ষণ দিক।

অ্যান্ড্রু কার্নেগী কেন এতো সফল হয়েছেন? তাঁর সফলতার গোপন চাবিকাঠি কী? আসুন, এবার এই রহস্যটা আপনাদের সামনে উদ্ঘাটন করা যাক।

তাঁকে ইস্পাতের রাজা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি ইস্পাত তৈরীর ব্যাপারটা সম্পর্কে অ,-আ,-ক,-খ কিছুই জানতেন না। শয়ে শয়ে কর্মচারী তার হয়ে কাজ করতেন। তারা ইস্পাত সম্পর্কে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ছিলেন।

কিন্তু অ্যান্ড্রু কার্নেগী একটি বিষয় জানতেন, তাহলো, কীভাবে কোন মানুষকে কোথায় ব্যবহার করতে হবে। এইভাবেই তিনি অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠেছিলেন। জীবনের গোড়াতেই তিনি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দান করতে থাকেন। এই কাজে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রাখেন। দশ বছর বয়সে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। তা হলো, নিজের নামের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ।

এই আবিষ্কারটা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ছোটো বয়সে কার্নেগী একবার স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তিনি একটা মা-খরগোস ধরেছিলেন। কিছুদিন বাদে তার থেকে একগাদা খরগোস হয়ে গেল। কিন্তু তাদের কী খাওয়ানো যাবে? ছোট্ট কার্নেগী কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ভাবনায় তাঁর মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। একদিন তাঁর মনের মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি পাড়ার সব ছোটো ছেলেদের জড়ো করলেন। তাদের বললেন, জঙ্গল থেকে কচি ফল আর ডাল পালা বয়ে আনতে। একটি শর্ত দেওয়া হলো। তিনি বললেন, যে সব থেকে তাড়াতাড়ি এই কাজটা করতে পারবে, বাচ্চা খরগোসের নাম তার নামেই রাখা হবে।

ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। পরবর্তীকালে কার্নেগী যখন জীবনের সফলতার সর্বোচ্চ, চূড়াতে বসেছিলেন, তখনো ছেট্টবেলার এই কৌশলটার কথা ভোলেননি।

আসুন কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তখন কার্নেগী চেষ্টা করছেন, পেনসিলভেনিয়ার রেলরোডের জন্যে ইস্পাত বিক্রি করতে। তখন জে এডগার টমসন ছিলেন ঐ রেলপথের প্রেসিডেন্ট, অ্যান্ড্রু কার্নেগী পিটসবার্গে একটি ইস্পাত কারখানা খুললেন। তিনি এই কারখানার নামকরণ করলেন —এডগার টমসন স্টীল ওয়ার্ক।

আসুন, আপনার সামনে একটা ধাঁধা দেওয়া যাক। যদি আপনি সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে সহজেই এই ধাঁধাটার সমাধান করতে পারবেন।

পেনসিলভেনিয়া রেলরোডে যখন ইস্পাতের দরকার হলো, তখন প্রেসিডেন্ট কোথায় গিয়েছিলেন? জে এডগার টমসন কাকে এই বরাদ্দ দিয়েছিলেন? তিনি কি বিশ্ববিখ্যাত ইস্পাত প্রস্তুতকারী সংগঠন সিয়ারস্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নাকি বরাবরের মতো রোবর্ডের কাছেই গিয়েছিলেন?

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তিনি কোন কোম্পানীতে এই ইস্পাত সরবরাহের দায়িত্ব দিয়েছিলেন?

কার্নেগী আর জর্জ পুলম্যান ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কী করে রেল গাড়ির কামরা সরবরাহ করা যেতে পারে, তা নিয়ে তাঁদের লড়াইয়ের অন্ত ছিল না। দু'জনেই উৎপাদিত মূল্যের দাম কমাচ্ছিলেন। শেষে এমন অবস্থা হলো, লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নিলো। অর্থাৎ লাভ একেবারে শূন্যে পৌঁছে গেল। অনেকে ভাবলেন, দুটি কোম্পানী বোধহয় এবার লাটে উঠবে।

এমনই একসময়ে একদিন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা হলো। নিউইয়র্কের সেন্ট নিকোলাস হোটেলে।

অ্যান্ড্রুকার্নেগীর সেন্টাল ট্র্যান্সপোর্টেশন কোম্পানী বনাম পুলম্যানের প্যালেস কার কোম্পানী—দুই হন্তাকর্তা পরস্পরকে দেখলেন।

অ্যান্ড্রু কার্নেগী নিজেই এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন —শুভ সন্ধ্যা, মি. পুলম্যান, আমরা দু'জনেই কী বোকার মতো ব্যবহার করছি না? চরম প্রতিদ্বন্দ্বীর এহেন ব্যবহারে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মি. পুলম্যান। তিনি ভাবতেই পারেননি, কার্নেগী তাঁর সাথে শুভ সম্ভাষণ জানাবেন।

ভয়ে ভয়ে পুলম্যান জানতে চাইলেন —আপনি কী বলছেন?

কার্নেগী তাঁর মনের আসল কথাটা খুলে বললেন। তিনি চাইছেন দুটি সংস্থার একীকরণ। একসঙ্গে কাজ করলে কী কী সুবিধা হস্তগত হতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে বললেন। এমন কি, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তাও বললেন।

পুলম্যান সব মন দিয়ে শুনলেন। তবুও তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বারবার ভাবছেন, এ বোধহয় কার্নেগীর নতুন কোনো চাল। এভাবেই তিনি পুলম্যানকে বধ করতে চাইছেন।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে পুলম্যান জানতে চাইলেন —আচ্ছা, সত্যি সত্যি যদি আপনার আর আমার কোম্পানী এক হয়ে যায় তাহলে এর নাম কী হবে।

জবাবটা কার্নেগীর ঠোঁটেই ছিল। তিনি বললেন —পুলম্যান প্যালেস কার কোম্পানী।

এই কথা শুনে পুলম্যান আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন

—আমার ঘরে আসুন। কথা বলা যাক।

এই কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প জগতে একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

তাহলে কী প্রমাণিত হচ্ছে? প্রমাণিত হচ্ছে, রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা ভিখারী থেকে শতকোটি ডলারের মালিক। দু'জনেরই একটি বিষয়ে চরম দুর্বলতা আছে, তা হলো, তাঁরা তাঁদের নামটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে ভালোবাসেন।

অ্যান্ড্রু কার্নেগী যে অতবড়ো নেতা হতে পেরেছিলেন, তার অন্তরালে আছে তাঁর এই আশ্চর্য ক্ষমতা। তিনি সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে প্রথম নাম ধরে ডাকতেন। ব্যবসায় যারা সহযোগিতা করতেন তাঁদের সকলের সাথেই ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। শ্রমিকের সাথেও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তিরিশ হাজার শ্রমিককে নাম ধরে ডাকার মতো। ক্ষমতা সহজে অর্জন করা যায় না। তিনি অহঙ্কার করে বলতেন, যতদিন তিনি ঐ বিশাল ইস্পাত সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন, একদিনের জন্যও শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি।

এবার পেডেরুসকির কথা বলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনোদন জগতের মুকুটহীন সম্রাট। তিনি তাঁর কৃষ্ণকায় পাচককে মি. কপার বলে সম্বোধন করতেন। ঐ পাচক পেডেরুসকির সাথে সমস্ত আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাটাই ছিল পেডেরুসকির কাজ। আর এর জন্যে মি. কপারকে কম ঝক্কাট পোহাতে হয়নি। মাঝরাত অব্দি অনুষ্ঠান চলতো। মি. কপার কফি কাপ হাতে বসে থাকতেন।

অন্যান্য মনিবেরা তাঁদের সামান্য পাচককে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন না, তাঁরা নাম ধরেই ডাকাডাকি করেন। যেমন টম অথবা বিল অথবা জর্জ। কিন্তু পেডেরুসকি সকলের সামনে পাচককে সম্মান দেখিয়েছেন এবং মি. কপার বলে ডেকেছেন। অতএব মি. কপারের ওপর দায়িত্ব এসে গেল, কীভাবে এই সম্মানের স্মৃতিরক্ষা করা যায়।

মানুষ তার নিজের নাম নিয়ে সত্যি সত্যি গর্ববোধ করে। সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। মাঝে মধ্যে তার প্রয়াস কৌতুকে পর্যবসিত হয়।

শক্ত ধাঁচের মানুষ পি টি বারনামের কথাও বলা যাক। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। কেননা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি কী করলেন? তিনি তাঁর মেয়ের পুত্র সন্তান অর্থাৎ নাতিকে পঁচিশ হাজার ডলার দিলেন। কেননা একটি মাত্র শর্ত ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, বারনাম সিলি নামে তাকে সর্বসমক্ষে দাঁড়াতে হবে।

দুশো বছর আগে ধনী ব্যক্তিরা কী করতেন? তারা লেখকদের টাকা দিয়ে উৎসাহিত করতেন, যাতে ঐ লেখকরা বইয়ের উৎসর্গেরি পাতায় তাঁদের নাম বসিয়ে দেন।

বিশ্বের বিভিন্ন পাঠাগার এবং মিউজিয়ামে যেসব দামী সংগ্রহ আছে তার অনেক এসেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী বা মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে এ ধরনের বহু সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি শর্ত আরোপ করা হয়। যে ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে অমূল্য রত্নরাজি তুলে দিয়েছেন, তাঁর নাম সুন্দরভাবে খোদাই করে রাখতে হবে। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক অথবা পাঠকের সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠবে দাতার নাম, প্রতিটি গীর্জার জানালার কাচেও এ ধরনের অনেক নাম লিখে রাখতে দেখা গেছে।

কিন্তু এখানে আর একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উদিত হয়। তা হলো, নাম যদি এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে তাহলে আমরা কেন সকলের নাম মনে রাখতে পারি না। আমরা বলি, অত্যধিক ব্যস্ততার জন্যই তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটা একটা অজুহাত মাত্র।

রুজভেল্টের মতো ব্যস্ত মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই এসেছেন। রুজভেল্ট সকলের নাম

মনে রাখতেন। এমন কি একজন সামান্য মোটর মেকানিককেও তিনি নাম ধরে ডেকেছিলেন।

এখানেও একটা গল্প বলা যাক। একবার ক্রাইসলার প্রতিষ্ঠান তাঁর জন্যে একটি বিশেষ ধরনের গাড়ি তৈরী করেছিল। ডবলিউ এফ চেম্বারলিনের এক মেকানিক সেই গাড়িটি নিয়ে হোয়াইট হাউসে এসেছিলেন। তারপর কী ঘটেছিল, তা চেম্বারলেনের লেখা একটি চিঠিতে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। তিনি সেদিনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন।

তাঁর চিঠির কিছু নির্বাচিত অংশ আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি।

তিনি লেখেন —আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে গাড়িটি চালানো সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিলাম। তিনিও আবার আমাকে শেখালেন কীভাবে মানুষ নামক গাড়িকে চালাতে হয়।

আমি হোয়াইট হাউসে পা দেওয়া মাত্র প্রেসিডেন্ট খুব খুশী হয়ে আমার সাথে দেখা করলেন। আমায় তিনি নাম ধরে ডাকলেন। আমি এতোক্ষণ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। কোথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা, আর কোথায় আমি সামান্য এক মোটর মেকানিক। কিন্তু তাঁর সাথে ব্যবহার করে বুঝতে পারলাম, তিনি সহজ সরল সাধারণ মানুষ। আমার প্রতিটি কথার ওপর আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গাড়িটা এমনভাবে বানানো হয়েছিল যে একটি মাত্র হাত দিয়ে চালানো যায়। গাড়িটা দেখতে অনেক লোক জমে গিয়েছিল। উনি বললেন —বাঃ চমৎকার গাড়ি। শুধু কোতাম টিপলেই চালানো যায়। আমার তো এখনই এটা চালিয়ে বাইরে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে।

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনরা গাড়িটার প্রশংসা করতে থাকায় তিনি বললেন —মি. চেম্বারলিন, এটা তৈরি করার জন্যে আপনারা যে পরিশ্রম করেছেন, তার জন্যে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই অনেক শ্রমিক এর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের সবাইকে একদিন ডেকে আনবেন কী?

তারপর তিনি নিজে গাড়িটির প্রতিটি যন্ত্রপাতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। মিসেস রুজভেল্ট এলেন। তিনিও প্রশংসা করলেন। সেক্রেটারী মিস পারকিনস এলেন। তারপর পুরোনো কৃষ্ণাঙ্গ চাকর জর্জ এলেন। জর্জকে প্রেসিডেন্ট বললেন —জর্জ, তুমি স্যুটকেসের দায়িত্ব নেবে তো?

শেষ পর্যন্ত চালানোর কৌশল শেখানো হলো। এবার প্রেসিডেন্ট বললেন —আমি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডকে তিরিশ মিনিট বসিয়ে রেখেছি। এবার তাই কাজে যাই, কেমন?

তাঁর এই ব্যবহারে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমি প্রেসিডেন্টের কাছে একজন মেকানিককে নিয়ে গিয়েছিলাম। রুজভেল্টের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট এর আগে তাঁর সাথে কথা বলেননি। এই প্রথম তার নামটি শুনলেন। সেই মেকানিক ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। বিদায় নেবার সময় প্রেসিডেন্ট মেকানিককে নাম ধরে ডেকে করমর্দন করলেন। হোয়াইট হাউসে আসার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিলেন। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কিন্তু কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা ছিল না। তা ছিল আন্তরিকতায় মাখা।

নিউইয়র্কে ফেরার পর আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সই করা একটা আলোকচিত্র পেয়েছিলাম। আমার কাজের জন্যে আর একদফা ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এতোসব করার সময় তিনি কোথায় পেলেন —সেটা আমার কাছে আজও এক রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বিশ্বাস করতেন, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় না রাখলে কেউ জীবনে সফল হতে পারবে না। আর এই পথে প্রথমেই একজন মানুষের নাম মনে রাখতে হবে। তার নামটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে হবে। তবে কাজের ক্ষেত্রে আমরা

তা কিন্তু করি না।

বেশীরভাগ সময়ে আমরা এই নামটাকে ভুলে যাই। অতিরিক্ত ব্যস্ততার অজুহাত দেখাই। নিজেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আর তার ফলে কী হয়? তার ফলে বন্ধুত্বটা দানা বাঁধতে পারে না।

যে কোনো রাজনৈতিক নেতা প্রথমে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করেন, তা হলো তাঁর ভোট কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটি ভোটারের নাম মনে রাখার চেষ্টা। বিচক্ষণতার সঙ্গেই তারা এই কাজটি করে থাকেন। অবশ্য এর মধ্যে একধরনের স্বার্থপরতা কাজ করছে। তাঁরা যে কোনো প্রকারে ভোটে জিতে ক্ষমতাকে মুঠোবন্দী করতে চান। তাঁরা বিশ্বাস করেন নাম ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো সমুদ্রে ডুব দেওয়া।

নাম মনে রাখার দক্ষতা রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভাইপো ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান একসময় অহঙ্কার করে বলতেন যে তিনি সকলের নাম মনে রাখতে পারেন।

তাঁর এই অহঙ্কার কিন্তু মিথ্যে বা গাড়ম্বর ছিল না। সত্যি সত্যি তিনি অনেক প্রজাকে নাম ধরে ডাকতে পারতেন।

এই কাজটা আমরা কীভাবে করবো? আসুন, একটা সরল সমাধানের কথা বলা যাক। হয়তো আপনার বন্ধু নামটা বললেন। আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে আপনি দুঃখিত হবার ভান করবেন। এবং বলবেন মিষ্টার আপনি কী বললেন? আর একবার বলবেন কী? তারপর নামটা একটু অসাধারণ হলে আপনি অবশ্যই বলবেন, নামের বানানটা কীরকম, একটু বলবেন কী?

ঠিক এটাই করতেন ফ্রান্সের সম্রাট ঐ তৃতীয় নেপোলিয়ান। শুধু তাই নয়, তিনি আর একটি কাজ করতেন। যদি অগিন্তক নামী কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি একখণ্ড কাগজে নামটা লিখে ফেলতেন। সেই কাগজের ওপর বার কয়েক চোখে বোলাতেন। মনের খাতায় নামটাকে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। তারপর কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। এইভাবে তিনি লোকটির একটি পরিপূর্ণ ছবি এঁকে ফেলতেন।

এই প্রসঙ্গে এক নার্স বলেছেন —ভালো কাজ করতে গেলে ছোটো ছোটো স্বার্থত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ, এই যে আপনি একজনের নাম মনে করার পেছনে পাঁচ মিনিট সময় খরচা করছেন এটাকে যদি একটা ভালো কাজ বলে মনে করেন, তাহলে পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট করার জন্যে কখনো চিন্তা করবেন না।

তাহলে? নিজেকে জনপ্রিয় করার তৃতীয় নিয়মটি কী হলো —মনে রাখবেন, যে কোনো লোকের কাছে তার নাম হলো সব থেকে মিষ্টি শব্দ।

সাত

কীভাবে ভালো বক্তা হবেন?

সম্প্রতি আমাকে একটা ব্রীজ খেলার আসরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রীজ খেলি না। সেখানে এক স্বর্গকেশিনী বসে ছিল। সেও ব্রীজ খেলে না। সে জানতো আমি নাওয়েল টমাস রেডিওয় যোগ দেবার আগে তার ম্যানেজার ছিলাম। সে আরো জানতো, আমি তার সঙ্গে ইওরোপ ঘুরেছি। অনেক সময় তার বক্তৃতা তৈরি করে দিয়েছি।

আমাকে দেখেই মেয়েটি বললো —মি. কার্নেগী, কতদিন বাদে আপনার সঙ্গে দেখা হলো বলুন তো? আপনার সাথে আমি যেসব সুন্দর জায়গাগুলোতে গিয়েছিলাম, তার দৃশ্যগুলো কী এখনো মনে আছে আপনার? আমাকে একবার বলবেন কী।

আমি সোফাতে বসলাম। মেয়েটি জানালো, কিছুদিন আগে সে তার স্বামীর সঙ্গে আফ্রিকা ভ্রমণ করে এসেছে। আমি প্রশংসা করলাম, আফ্রিকা! কী চমৎকার! আমি নিজেও আফ্রিকাতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একবার শুধু আলজিয়ার্সে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম। একে কি আর ভ্রমণ বলে? তোমরা সেখানকার বড়ো শিকারের জায়গাটাতে গিয়েছিলে নাকি? বাঃ, কী কী দেখলে, তোমাকে দেখে দারুণ হিংসে হচ্ছে আমার। আফ্রিকার গল্প শোনাবে না।

মেয়েটি এতো উৎসাহিত হয়েছিল, পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সে বকবক করে গেল। সে আর একবারও জানতে চাইলো না, আমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম বা আমি এই ক'বছর কী করেছি। আমার বেড়ানোর গল্প সে শুনতে চায়নি। সে চাইছিল একজন আগ্রহী শ্রোতাকে চোখের সামনে দেখতে। যাকে সবকিছু শোনাবে সে। আত্মগর্বে ফুলে উঠবে। অহঙ্কারী হয়ে উঠবে।

এতো অব্দি পড়ে কী মনে হচ্ছে আপনার? মেয়েটিকে কী আত্মগর্বী বলে দোষারোপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে? তা কখনো করবেন না। এ হলো সাধারণ মানুষের স্বভাব। আমি আপনি সকলেই নীরব শ্রোতা পেতে ভালোবাসি। যার সামনে নিজেকে ভালোভাবে জাহির করতে পারবো। তাই মেয়েটির এই আচরণকে আমরা কখনোই অস্বাভাবিক বলবো না।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কিছুদিন আগে আমি নিউইয়র্কের প্রকাশক কে ডবলিউ গ্রীনবার্নের দেওয়া একটি ডিনার পার্টিতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক বিখ্যাত বোটানিস্টের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। এর আগে আমি কোনো বোটানিস্টের সাথে পরিচিত হয়নি। তাঁকে দেখেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি চেয়ারের হাতলে বসে তার কথা শুনছিলাম। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল তার। গাঁজা, সাধারণ আলু ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য কথা শোনালেন। আমার নিজের একটা ছোট্ট বাগান আছে। ছোটো থেকেই আমি গাছপালার পরিচর্যা করে থাকি। কিন্তু মাঝে মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ি। যখন দেখি ডালিয়াতে ফুল হচ্ছে না। কুঁড়িগুলো অকালে ঝরে যাচ্ছে। আলু পচে যাচ্ছে —ইত্যাদি অরো কত কী। তিনি স্বতপ্রণোদিত হয়ে আমাকে নানা ব্যাপারে উপদেশ দিলেন। সেখানে আরো অনেক নিমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু আমি আমার চিরাচরিত ভদ্রতার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার উচিত ছিল সকলের সাথেই কথাবার্তা বলা। কিন্তু আমি শুধু সেই বোটানিস্টের সাথেই লেগেছিলাম।

দেখতে দেখতে মাঝরাত এসে গেল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ এবার নিমন্ত্রণকারীকে আমার সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। আমি নাকি উদ্দীপনায় ভরপুর। আমার মাথাটা খুব পরিষ্কার। সুন্দর কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু এই কথাটা শুনেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। আসলে আমি তো এক নীরব শ্রোতা হয়ে ওনার কথা শুনে গেছি। আসলে বোটানি বিষয়টা এতো বিদঘুটে, লম্বা লম্বা ল্যাটিন নাম আছে, এ বিষয়ে আমি কিবা ভাষণ দেবো?

তাহলে? উনি কেন আমার এতো প্রশংসা করলেন? এর একটি মাত্র কারণ আছে। একজন নীরব শ্রোতা পেয়ে উনি খুব খুশী হয়েছিলেন। অন্য যেখানে নিজের বিদ্যে জাহির করতে গেছেন, কেউ তা শোনেনি। সকলেই তাঁকে অবজ্ঞা করেছে। কেউ কেউ হয়তো সামনেই অপমান করেছে। বলেছে, দেখো বুড়োটা আবার জ্ঞান দিতে এলো। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে বসেছিলেন। আমার মতো এক নীরব শ্রোতাকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমি জ্যাক উডফোর্ডের কথা বলতে পারি। তাঁর ট্রেজারস ইন লাভ নামে একটি বই আছে। সেখানে তিনি লিখেছেন—খুব কম লোকই গভীরে মনোযোগ দিয়ে শোনে।

আমি আরো একটা কাজ করেছিলাম। আমি মাঝে মধ্যেই ঐ বোটানিস্ট ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলাম। অবশ্য এটা যে বানিয়ে বানিয়ে করেছি তা নয়। সত্যি সত্যি তাঁর ভাষণ আমাকে অনেকগুলো অজানা দিকের সন্ধান দিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম —তাঁর কথায় আমার দারুণ উপকার হলো। এবং আরো বলেছিলাম, আমার যদি উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর মতো জ্ঞান থাকতো তাহলে বাগানটা আরো সুন্দর হয়ে উঠতো।

তাঁর সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে পারলে আরো মজা হতো। তাঁর সাথে আবার যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম।

এই জন্যেই তিনি হয়তো আমাকে কথাবার্তাতে চৌখস বলেছিলেন। আসলে আমি ছিলাম একজন ভালো শ্রোতা। আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে উৎসাহিত করেছি মাত্র।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অনেকে খুব সফল হন। অনেকে বিফলতার বোঝা বহন করে। এর আসল কারণটা কী? চার্লস এলিয়ট বলেছেন —সফল ব্যবসায়ী হতে গেলে প্রথমেই যে গুণটা করায়ত্ত করতে হবে তা হলো, ক্লায়েন্টদের সমস্ত অভিযোগ মাথা পেতে শোনা। অযথা বিরক্তি উৎপাদন না করা। ঝগড়া তর্কের পরিবেশ সৃষ্টি না করা। এটাকে একধরনের নীরব স্তাবকতা বলা যেতে পারে।

একথা আমরা সবাই জানি। এর জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এম. বি. এ. পড়তে হয় না। অথচ আমরা কাজের কাজ কিছুই করি না। আমরা খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন দিই। ভালোভাবে দোকান সাজাই। নানকরা কেরানীদের নিয়োগ করি। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত কী করে? তারা শ্রোতাদের সাথে অযথা তর্ক শুরু করে দেয়। শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। এর ফলে কী হয়? বিজ্ঞাপন জলাঞ্জলি যায়। সাজানো দোকান ফাঁকা পড়ে থাকে। কেউ আর সেখানে ঢোকে না। কেরানীরা মাছি তাড়াতে ব্যস্ত থাকে।

জে. সি. উটনের কথা মনে আছে কি? আমার ক্লাসে তিনি একটা ভালো কথা বলেছিলেন। একবার একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে তিনি স্যুট কিনেছিলেন। কিন্তু স্যুটটা মোটেই ভালো ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই রঙটা একেবারে উঠে গেল।

তিনি স্যুটটা নিয়ে আবার ঐ স্টোরে গেলেন। যে ভদ্রলোক বিক্রি করেছিলেন তাকে দেখালেন, লোকটা কোনো কথাই শুনতে চাইছিল না। সে খালি নিজের কথাই বলতে চাইলো, সে বললো —কী বলছেন মশাই। আমি নিজের হাতে এই ধরনের স্যুট কয়েক হাজার বিক্রি করেছি। এই প্রথম একটা অভিযোগ পেলাম। হয়তো খোপাটার মাথায় বুদ্ধি ছিল না। বেশি ক্ষার মিশিয়ে দিয়েছে। আর আপনি এসেছেন ঝগড়া করতে? যান, যান মশাই! পয়সা ফেরত? কিছুই হবে না।

সেলসম্যানের ব্যবহারে ভদ্রলোক খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি আর বেশি কথা বাড়াতে চাননি। ইতিমধ্যে সেলসম্যান আরো গরম গরম কথা বলতে শুরু করলো।

সে বলতে থাকলো —আমাদের ওপর জোর করে এসব চাপাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের আপনি ঠকাতে চাইছেন? আর একটা স্যুট চাইছেন নাকি?

এর মধ্যে আর একজন সেলসম্যান সেখানে ঢুকে পড়েছে। সে চিৎকার করে বললো —এতো কম দামে এর থেকে ভালো জিনিস আশা করছেন কী করে?

উটন ভীষণ চটে গেলেন। তিনি অবাক হলেন। তিনি একজন খরিদ্দার। এসেছেন অভিযোগ জানাতে। অথচ, প্রথম বিক্রেতা তাঁর সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললো। দ্বিতীয়জন

মন্তব্য করলো, এতো সস্তায় মাল কিনলে তো ঠকতেই হবে।

উটন বলতে চাইছিলেন —এই স্যুট তিনি আর নিয়ে যাবেন না। এটাকে দোকানের এক কোণে ফেলে রেখে যাবেন।

ঠিক সেই সময়ে দোকানের মালিক এসে পড়লেন। তিনি নিজের ব্যবসাটা ভালোভাবেই জানতেন। তিনি উটনকে একেবারে বদলে দিলেন। তিনি বললেন —সরি স্যার, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি উটনকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে নিয়ে গেলেন। কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে দিলেন। তারপর উটনের অভিযোগ প্রথম থেকে শুনে গেলেন।

উটনের কথা শেষ হলো। ইতিমধ্যে ঐ দু'জন বিক্রেতা সেখানে ঢুকে পড়েছে। তারা আবার উটনকে অপমান করার চেষ্টা করতে শুরু করলো। দোকানের মালিক বুঝতে পারলেন, এতে দোকানের বদনাম হবে। তিনি বিক্রেতা দু'জনের সাথে তর্ক করলেন। বললেন —ছিঃ ছিঃ, তোমরা এখনই মাফ চেয়ে নাও। ক্রেতাকে সন্তুষ্ট না করলে তোমাদের মাইনে হবে কোথা থেকে?

তিনি আর কী করলেন? তিনি বললেন —এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। বলুন, কীভাবে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

কয়েক মিনিট আগে উটন ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি স্যুটটা গোল করে পাকিয়ে দোকানের কোণে ফেলে দেবার মতলব করেছিলেন। ভেবেছিলেন পুলিশের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করবেন। কিন্তু তখন তিনি একেবারে পাল্টে গেলেন। তিনি বললেন —এক্ষেত্রে আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আমি চাই না আপনার কোনো ক্ষতি হোক। আমি বুঝতে পারছি, এতে আপনার হাত ছিল না। কিন্তু আমি কী করবো বলুন তো? এই স্যুটটা তো আমি আর পরতে পারবো না। ভদ্রলোক বললেন —এই স্যুটটা আরো এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে। যদি রঙটা আরো চটে যায়, তাহলে তিনি এটা বদলে দেবেন। তিনি বললেন —উটন, আপনার অসুবিধার জন্যে আমি সত্যি সত্যি দুঃখিত।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে উটন অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর এই স্যুটটার কথা ভুলে গেলেন। এইভাবে দোকানের মালিক তাঁর সম্ভাব্য খরিদ্দারকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

এই কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? আমরা এই শিক্ষা পেলাম, ঐ দু'জন বিক্রেতা সারাজীবন সেলসম্যানই থেকে যাবে। তারা কোনো কোম্পানীর কর্তা হতে পারবে না। আর সম্ভবত তাদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারা প্যাকিং ঘরের অন্ধকারে বসে বসে প্যাক করবে। যাতে কোনোদিন তাদের জনসংযোগের সামনে এসে দাঁড়াতে না হয়। ঐ মালিক নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থা করবেন।

আঘাত বিলাসী এবং সমালোচক মনোযোগী শ্রোতা পোলক খুব খুশী হন। এমন শ্রোতা যে চুপচাপ শুনে যাবে। যে কখনো গোখরো সাপের মতো ছোবল মারবে না। এবার নিউইয়র্ক টেলিফোন কোম্পানীর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

তারা একজন গ্রাহককে নিয়ে একবার খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোক প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। তিনি টেলিফোনের তার আর খুঁটি উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনি কিছু চার্জকে অতিরিক্ত বলে মনে করেছিলেন। খবরের কাগজের পাতায় তিনি টেলিফোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে একাধিক চিঠি ছাপালেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে গিয়ে অজস্র অভিযোগ করলেন। শেষপর্যন্ত টেলিফোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিলেন।

টেলিফোন কোম্পানী কী করলো? তারা একজন দক্ষ এবং কুশলী মানুষকে পাঠালেন ঐ রাগী ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করতে। ঐ লোকটি খিটখিটে গ্রাহকের সব কথা মন দিয়ে

শুনলেন। লোকটির সব গালাগাল হজম করলেন। আর তিনি যে ঠিক সে কথাও জানালেন।

তিন ঘণ্টা ধরে ঐ ভদ্রলোক গালাগাল দিয়েছিলেন। আমি চুপ করে সব শুনেছিলাম। এবং শেষ পর্যন্ত চার-চারবার ঐ গ্রাহকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলেন, প্রত্যেকবার গ্রাহক ভদ্রলোকের রাগ একটু একটু করে কমছে। মনের ঝাল তো ঝাড়াই হয়ে গেছে। এখন আর মিথ্যে প্যাঁচিয়ে কী হবে।

পরে টেলিফোন কর্মচারী আর একটি মজার ব্যাপার করলেন। তিনি একটি বানানো গ্রাহক সমিতি খাড়া করলেন। ঐ ভদ্রলোককে তার প্রেসিডেন্ট করে দিলেন। হাজার হাজার টেলিফোন গ্রাহক এখন তাঁকে ফোন করতে থাকলেন। সকলেরই কিছু না কিছু সমস্যা আছে। তাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ঐ ভদ্রলোক জেরবার হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর আসল কথাটাই ভুলে গেলেন। তাহলে দেখলেন তো, কী সুন্দরভাবে একজন রাগী গ্রাহককে বশে নিয়ে আনা সম্ভব হলো।

এইভাবে আমরা দেখেছি, প্রাথমিক শত্রুতা শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। ধৈর্য ধরে সব কিছু মেটাতে হবে। এক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ রাগী ভদ্রলোক টেলিফোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে আনিত মামলা তুলে নিয়েছিলেন। এবং বকেয়া বিলের সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে কী প্রমাণিত হলো? প্রথমে তিনি নিজেকে একজন নিরপেক্ষ যোদ্ধা হিসাবে ভেবেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অভিযোগের ওপর যেন কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে গালাগাল দিয়েছিলেন। এইভাবে একটা বিতর্কিত অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন, এতে কোনো লাভ হচ্ছে না, তখন খবরের কাগজের পাতায় গরম গরম চিঠি লিখলেন। তাতেও কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত মামলা দায়ের করলেন। ঠিক এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ঐ টেলিফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা উল্টোদিকে চলতে শুরু করলো। তাঁর কাল্পনিক অভিযোগ বাতাসে মিলিয়ে গেল। এমন ভাবে যে সমস্যাটার সমাধান হতে পারে, টেলিফোন কোম্পানী বোধহয় তা ভাবতে পারেনি। একদিন সকালবেলা, উটন কোম্পানীর জুলিয়ান এফ টেডমারের অফিসে এক ক্ষুব্ধ ক্রেতা ঝড়ের মতো ঢুকে পড়লেন।

পরবর্তীকালে মি. টেডমার এই ঘটনাটা আমাকে বলেছিলেন। লোকটির কাছে টেডমারের প্রতিষ্ঠান পনেরো ডলার পেতো। ক্রেতা সেটা অস্বীকার করলো। তবে টেডমার জানতেন যে তার ভুল হচ্ছে। তাই টেডমার বারবার ক্রেতার কাছ থেকে সেটা দাবী করলেন। ভদ্রলোক রাগে শিকাগোতে এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, আমি কখনো আপনাকে কোনো ডলার দেবো না। এবং আপনার দোকান থেকে এক ডলারেরও জিনিস কিনবো না।

টেডমার ধৈর্য ধরে ভদ্রলোকের কথা শুনলেন। মাঝে মধ্যেই বাধা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তাতে অবস্থাটা হাতের বাইরে চলে যাবে ভেবে তিনি নিজেকে সংযত করলেন। শান্ত মনে সব কথা শুনলেন।

তারপর যখন ক্রেতা ভদ্রলোকের রাগ একটু কমলো, তখন টেডমার বললেন —আপনি যে শিকাগোতে এসে আমাকে একথা বলছেন, তার জন্যে আপনাকে আমি অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। কেননা আমার প্রতিষ্ঠান যদি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে, তাহলে আরো অনেক গ্রাহকের বিরক্তি উৎপাদন করবে। এটা খুব খারাপ ব্যাপার। তাই আপনার কী অভিযোগ আপনি শান্তভাবে বলুন। দেখি কী করা যায়।

ক্রেতা ভদ্রলোক এমন ব্যবহার আশাই করেনি। সে ভীষণ রেগে গিয়েছিলো।

টেডমার তাঁকে বললেন —ঐ পনেরো ডলার আমরা বাতিল করে দেবো। এর জন্য আপনার সাথে ঝগড়া করবো না। তবে আপনার সমস্যা কী তা জানালে সমাধানের চেষ্টা করবো।

টেডমার তাকে আরো বলেছিলেন, আপনি এতো রেগে গেছেন কেন? অবশ্য, আমি বুঝতে পারছি, যদি আমি আপনার জায়গায় থাকতাম, তাহলে হয়তো বেশি রেগে যেতাম। ঠিক আছে, আপনি আমার কাছ থেকে কিনবেন না। আমি আর কতগুলো ভালো উলের দোকানের নাম বলছি, সেখানে গেলে আপনার উপকার হবে।

আগে ঐ ভদ্রলোক শিকাগোতে এলে টেডমার ওনার সাথে একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারতেন। সেদিনও তিনি ঐ ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রেতা রাজী হয়নি। আবার টেডমার অফিসে ফিরে এলেন। ক্রেতার মন ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে একটা মস্ত বড় বায়না দিলো। বাড়ি ফেরার সময় তার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কেননা, টেডমার ইতিমধ্যে ভদ্রতা দেখিয়েছেন। এর উত্তর কীভাবে দেওয়া যাবে। তাই লোকটি নিজেকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে সে কোনো ড্রয়ারে বিলটা খুঁজে পেয়েছিল। তারপর টেডমারের কাছে মার্জনা চেয়ে বিলটা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে আর একটি মজার ঘটনা ঘটে যায়। তার স্ত্রীর একটি ছেলে হলো। তার নাম রাখা হলো টেডমার। এরপর থেকে আজীবন সে টেডমারের বন্ধু হিসাবেই পরিচিত হয়েছিল। বাইশ বছর পর তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে টেডমারের প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছিল।

এবার আর একটা গল্প শোনা যাক। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। একটি গরীব ভাচ ছেলে স্কুলের পর একটা দোকানে কাচ সাফাইয়ের কাজ করতো। এরজন্য সপ্তাহে মাত্র পনেরো সেন্ট করে সে পেতো। ভাচ ছেলেটি এতোই গরীব ছিল যে প্রতিদিন কয়লার গাড়ি চলে যাওয়ার পর একটা ঝুড়ি নিয়ে টুকরো কয়লাগুলো তুলে রাখতো।

সেই ছেলেটির নাম এডওয়ার্ড বব। সারা জীবনে ছ' বছরের বেশি স্কুলে যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমেরিকার ইতিহাসে সব থেকে সফল একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক হতে পেরেছিল।

তার এই উত্তরণের ইতিহাস বিস্ময়কর। হঠাৎ শুনলে মনে হয় বুঝি বানানো গল্প কথা। কিন্তু আমি জানি, কী অসম্ভব একাগ্রতা এবং জেদ থাকার ফলে সে এইভাবে সাফল্য লাভ করে।

সেই গল্পটা হয়তো বিরাট। তার প্রতিটি পাতায় অনেক উত্তেজনার খোরাক মেশানো আছে সংক্ষেপে হয়তো সেটা শোনা যেতে পারে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো, প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির কাছে যে কোনো বাধার প্রাচীর কেমন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

যখন তার বয়েস মাত্র তেরো বছর, তখন পড়াশোনার সাথে ইতি ঘটাতে হয়। ইতিমধ্যে সংসারের বোঝা মাথার ওপর চেপে বসেছে। কিছু একটা না করলে আর চলছে না।

বেচারী বব কী করলেন? তিনি একটি অফিসে প্রতি সপ্তাহে দু'ডলার পঁচিশ সেন্ট মাইনের কাজ শুরু করলেন। কাজ মানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, যাকে আমরা অফিস বয় বলে থাকি।

এতেও কিন্তু তাঁর পড়াশোনার আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমে যায়নি। বরং তিনি নিজেই নিজের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করলেন। গাড়িভাড়া আর লাঞ্চের খরচ বাঁচিয়ে তিনি আমেরিকার মনীষীদের জীবনী কিনে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। বিখ্যাত

সব মানুষদের জীবনী পড়ে তাঁদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদেরকে ছোটো ছোটো চিঠি পাঠালেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের জীবন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে চাইলেন। বব ধারাবাহিক ভাবে এই কাজটা করেছিলেন। কোনো তাৎক্ষণিক লাভের জন্যে নয়। তার সুদূর প্রসারী ইচ্ছা ছিল। তিনি এইসব মহামনীষীদের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনটাকে একেবারে পাল্টে ফেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এর ফলে কী হলো? জেনারেল জেমস এ গারফিল্ড —যিনি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর কাছে বব প্রশ্ন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, সত্যি সত্যি ছেলেবেলায় গারফিল্ড কোনো খালের নৌকার গুণ টানতেন কিনা।

গারফিল্ড এই চিঠির জবাব দিয়েছিলেন।

একইভাবে তিনি জেনারেল গ্রান্টকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে কোনো এক যুদ্ধে গ্র্যান্টের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। গ্র্যান্ট এই চিঠিটা পড়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ বছর ছেলেকে জবাব দিলেন। ঐ রণপথের একটি মানচিত্র এঁকে পাঠিয়েছিলেন। শুধু কী তাই? ছেলেটিকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন, বব খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি গারফিল্ডের এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। সমস্ত সন্ধ্যা ঐ বিশাল মানুষটির সংস্পর্শে আসেন। গল্প করে সময় কেটে যায়।

তিনি এমারসনকে চিঠি লিখেছিলেন। এইভাবে কিশোর ছেলেটি মার্কিন দেশের আরো অনেক বিখ্যাত মানুষদের সাথে পত্রালাপ করতে শুরু করেন। এই তালিকাতে কারা ছিলেন? নামগুলো পড়লে হয়তো আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। যাঁরা মার্কিন দেশের প্রথম সারির জননায়ক, রাষ্ট্রনেতা, সাহিত্যিক, শিল্পী অথবা সাংবাদিক, তাঁদের সকলের সাথেই বব সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই তালিকাতে ছিলেন ফিলিপ্স বুকস, অলিভার, ওয়েনডেল হোমস, লংফেলো, মিসেস অব্রাহাম লিঙ্কন, লুইসা মেরী অ্যালকট জেনারেল শেরম্যান এবং জেভারসন ডেভিস।

এর ফলে কী হলো? দেখা গেল, প্রায়শই উইলিস ববের ডাক পড়ছে। সন্ধ্যেগুলো ঐসব মানুষদের সান্নিধ্যে কেটে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হচ্ছে। এইসব নামী স্ত্রী-পুরুষ তাঁর জীবনকে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থানে এনে দিয়েছিলেন।

পৃথিবীর সব থেকে খ্যাতিমান সাক্ষাৎকারী মানুষটির নাম হলো অহিজাক মারুকশন। তাঁর বক্তব্য হলো, মানুষ কারো কথা মন দিয়ে শুনতে চায় না। সব সময় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে। নিজেদের কথাতেই ব্যস্ত থাকে। চোখ খোলা রাখতে ভুলে যায়। অথচ খ্যাতিমান মানুষেরা আমাকে বলেছেন সবসময় অন্যের কথার প্রতি নজর দিতে হবে। জীবনে উন্নতি করতে হলে তোমাকে প্রথমেই একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে। এই পৃথিবীতে ভালো বক্তা অনেক আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা শ্রোতার খুবই অভাব।

নামীরাই যে কেবল ভালো শ্রোতা খোঁজেন, এমনটি ভাবা উচিত নয়। রিডারস ডাইজেস্ট পত্রিকাতে একবার লেখা হয়েছিল —বহুলোক ডাক্তার ডাকেন কেন? শুধু ভালো ভালো কথা শোনার জন্য।

এবার আমরা গৃহযুদ্ধের সেই অন্ধকার দিনগুলোর কথা ভাবতে পারি। সেই সময় লিঙ্কন একবার ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডের তাঁর একটি পুরোনো বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির মধ্যে লিঙ্কন কী বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন ঐ বন্ধু যেন ওয়াশিংটনে আসেন। লিঙ্কন তাঁর সাথে কোনো একটি মারাত্মক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চান।

লিঙ্কনের কথামতো পুরোনো সেই বন্ধু হোয়াইট হাউসে এসে পৌঁছে ছিলেন। লিঙ্কন ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর সাথে কথা বলেন। তিনি ক্রীতদাসদের মুক্তির সমস্যা নিয়ে খুবই

চিন্তিত এবং ভাবিত ছিলেন। দেখা গেল যেসব সমস্যার জটগুলো ক্রমশ আরো গভীর ভাবে তাঁকে চেপে ধরেছিল, সেগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

কীভাবে এই ব্যাপারে একটা ঘোষণাপত্র জারি করা যেতে পারে—তা নিয়ে সমস্ত মার্কিন দেশ উত্তেল উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সকলকেই ঠিকভাবে খুশী করা সম্ভব হচ্ছিল না।

বন্ধুর সাথে কথা বলার পর লিঙ্কন এ ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্তে থাকলেন। তিনি সমস্ত বক্তব্যকে পর পর সাজালেন। তিনি চেয়েছিলেন, ক্রীতদাসদের মুক্তি দান করতে। কিন্তু অনেকে এর বিরোধিতা করেছিলেন।

কথা শেষ হয়ে গেল। লিঙ্কন বন্ধুর সাথে করমর্দন করলেন। বন্ধুকে আবার ইলিনয়ে ফেরত পাঠালেন। কিন্তু এই ব্যাপারে বন্ধুর মতামত জানালেন না। দেখা গেল লিঙ্কন একাই কিন্তু কথা বলে গেছেন। এভাবে কথা বলাতে তাঁর মনের ক্ষোভ দূরীভূত হয়ে গেল।

বন্ধুটি বলেছিলেন, কথা শেষ হওয়ার পর লিঙ্কনকে অনেক সহজ সরল স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। অথচ যখন আমি প্রথম হোয়াইট হাউসে পা রেখেছি, আমার মনে হচ্ছিল লিঙ্কন যেন কোনো একটি অচেনা অজানা সমস্যায় খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

তাহলে এর থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে? মহামতি লিঙ্কনের মতো একজন মানুষও ভালো শ্রোতার সন্ধানে মগ্ন ছিলেন। তিনি চাইছিলেন ধৈর্যশীল কোনো মানুষ এসে তাঁর সামনে বসে থাকবেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনবেন। অযথা বিতর্কের সৃষ্টি করবেন না। ইলিনয়ের বন্ধুটির কাছ থেকে তিনি এইসব পেয়েছিলেন।

আপনি যদি চান যে লোকে আপনাকে নিয়ে কৌতুক করবে অথবা আপনার পেছনে টিটকিরি দিয়ে নিন্দে করবে, তাহলে আপনি কয়েকটি ব্যাপার করে দেখতে পারেন। যেমন, কারো সাথে দেখা হলে তার কথা কখনোই শুনবেন না। খালি নিজের সম্পর্কে বলে যাবেন। সে কোন্ কোন্ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে চাইছে, তা জানতে চাইবেন না। সে হয়তো আপনার মতো এতো চালাক নয়। আপনি ভাববেন, সে এতো কথা বলবে কেন। আমি তো ইচ্ছে করলেই তাকে থামিয়ে দিতে পারি। সে এখন যে বিষয়টা নিয়ে বকর বকর করছে, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান আকাশছোঁয়া।

কখনো এটা করতে যাবেন না। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি হয়তো প্রাণীতত্ত্বে আপনার মতো সুপণ্ডিত পৃথিবীতে কেউ নেই। এবং যে লোকটি প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলছেন, এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের সীমানা অ-আ-ক-খ ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারেনি। তবুও আপনাকে একজন মরমী এবং দরদী শ্রোতা হতে হবে। তা না হলে আলোচনার মজাটাই জমবে না।

যে সমস্ত লোক শুধুমাত্র নিজের কথাই বলে থাকে, সে সর্বদা নিজের কথাই ভাবে। একে একটা মনোস্তাত্ত্বিক অবদমন বলা যেতে পারে। ডাঃ নিকোলাস মারে বাটলার, যিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তিনি এই প্রসঙ্গে খুব দামি আর সত্যি কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, যে মানুষ কেবল নিজের কথা বলে থাকে, সে নেহাতই অশিক্ষিত। যত শিক্ষাই তার হোক না কেন, সে সত্যিকারের সুশিক্ষা কখনো পায়নি।

অর্থাৎ, আপনি যদি ভালো কথক হতে চান, তাহলে আগে আপনাকে ভালো শ্রোতা হতে হবে। এই ব্যাপার দুটো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, ভালো পাঠক না হলে ভালো লেখক হওয়া যায় না। মিসেস চার্লস নরম্যান কী বলেছিলেন মনে আছে তো? নিজেকে ভালো লাগাতে গেলে অন্যের প্রতি আগ্রহ দেখান। এমন প্রশ্ন করুন, যার উত্তর অবধারিত ভাবে বেরিয়ে আসবে।

মনে রাখবেন, যার সাথে কথা বলছেন, সে নিজের ব্যাপারে একশো ভাগ আগ্রহী।

আপনি কী বলছেন, তা মোটেই সে শুনতে চাইছে না। হাজার মানুষ মারা গেলেও সে মোটেও ব্যথিত হবে না। কিন্তু তার কড়ে আঙুল সামান্য ব্যথা হলে সে চিন্তিত হয়ে পড়বে। সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই এই নির্মম কথাগুলি সাংঘাতিক ভাবে সত্যি। আফ্রিকায় চল্লিশটা ভূমিকম্পের থেকে একজন মানুষ তার ঘাড়ের ফোঁড়া নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত থাকে। অতএব যখনই কারো সাথে কোনো কথাবার্তা বলবেন তখন মানুষের এই প্রাথমিক ধ্যানধারণার প্রতি নজর দেবেন।

তাহলে এই অধ্যায়ের শেষে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? আমরা কি বলতে পারি না—ভালো শ্রোতা হয়ে উঠুন। অন্যদের কথা বলার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিন। তাহলেই দেখবেন আপনি একজন ভালো কথক হতে পারছেন।

আট

কীভাবে অন্যদের উৎসাহী করা যেতে পারে?

থিওডোর রুজভেল্ট যে এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা নয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল আকাশছোঁয়া। তিনি থাকতেন অয়েস্টার বে-তে। যাঁরাই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন, তাঁর এই ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

গ্যামালিয়েল ব্রাডফোর্ড লিখেছেন যে দর্শনার্থী কোনো কাউ বয়, রাজনৈতিক নেতা বা কূটনৈতিক যে হোক না কেন, রুজভেল্ট জানতেন কার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত।

এই গুণটা তিনি কীভাবে রপ্ত করেছিলেন?

উত্তরটা খুবই সহজ সরল। রুজভেল্ট আগে থেকেই জানতেন আগামীকাল সকালে তাঁকে কার কার সাথে কথা বলতে হবে। তিনি সারারাত ধরে সেই লোকটির পছন্দসই বিষয় লিখে বই পড়তেন। দেখতেন কীভাবে তাকে আরো বেশি প্রভাবিত করা যেতে পারে।

মনে করা যাক, পরদিন সকালে হয়তো এক কাউবয় রুজভেল্টের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে রুজভেল্ট তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতে চলে যেতেন। কাউবয়দের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত যেসব বই সেখানে থরে থরে সাজানো আছে সেগুলির পাতা উল্টোতেন। এর ফলে কী হতো? দেখা যেতো কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি কাউবয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সংগ্রহ করে ফেলেছেন। পরের দিন যখন ছেলেটি আসতো, তখন রুজভেল্টের মুখ থেকে এই সব শব্দ শুনে একেবারে অবাক হয়ে যেতো। এভাবে থিওডোর রুজভেল্ট সমস্ত মানুষের ওপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।

রুজভেল্ট জানতেন, নেতারাও জানে, যে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার সহজতম রাস্তাটি হলো তাঁর প্রিয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা। এই আলোচনার মধ্যে আন্তরিকতার ছাপ ফুটিয়ে তোলা।

উইলিয়াম জায়নস ফেলপসের কথা বলা যাক। তিনি ছিলেন ইয়েলের সাহিত্যের অধ্যাপক। অল্প বয়েসেই তিনি এই পদ অর্জন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—আমার যখন আট বছর বয়েস তখন আমি আমার এক পিসির বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ ছিলাম, একদিন এক মধ্যবয়স্ক লোক সন্ধ্যাতে এলেন। পিসির সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর আমার সাথে আলাপ হলো। তখন আমি নৌকো নিয়ে কথা বলতে খুবই ভালোবাসতাম। ভদ্রলোক আমাকে অনেকক্ষণ ধরে জ্ঞান

দিলেন।

উনি চলে যাবার পর আমি উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিলাম। বলেছিলাম, কী চমৎকার মানুষ। নৌকো সম্পর্কে ওঁর কত আগ্রহ।

পিসি হাসতে হাসতে বললেন—উনি নিউইয়র্কের একজন বিখ্যাত আইনবিদ। নৌকো নিয়ে ছিটেফোঁটাও মাথাব্যথা নেই।

তাহলে? আমি অবাক হয়ে গেলাম! উনি আমার বিষয়টা কী করে জানলেন?

এর উত্তরটা পিসির কাছে ছিল। পিসি বললেন—উনি একজন ভদ্রলোক। উনি বুঝেছিলেন, তুমি নৌকো সম্পর্কে আগ্রহী। উনি আরো বুঝেছিলেন, নৌকো নিয়ে কথা বললে তুমি আরো খুশী হবে। তাই উনি তোমার মন জয় করেছিলেন।

উইলিয়াম ফেলপস এইসব কথা লিখেছেন তাঁর হিউম্যান নেচার বইতে। তিনি মন্তব্য করেছেন—আমি জীবনে কখনো পিসির কথা ভুলিনি।

যখন আমি এই পরিচ্ছেদটি লিখছিলাম, তখন আমার সামনে এডওয়ার্ড এল চ্যালিসের একটি চিঠি পড়েছিল। চ্যালিস কে জানেন তো? বয়েজ স্কাউট আন্দোলনের প্রথম সারির এক নেতা।

সেই চিঠি থেকেই কিছুটা অংশ আপনাদের সামনে তুলে দিচ্ছি...

...একবার আমার এক বিশেষ সাহায্যের দরকার হয়েছিল। ইউরোপে বয়েজ স্কাউট জামবোরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম আমেরিকা থেকে অন্তত একজন বয়েজ স্কাউট যেন সেখানে যেতে পারেন। আসা-যাওয়ার খরচ কে যোগাবে? আমেরিকার কোনো একটি কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট যদি দয়া পরবশ হয়ে এই খরচ যোগান, তাহলে ভালো হয়।

এমনই এক প্রেসিডেন্টের সন্ধানে তাঁর চেম্বারে গিয়েছিলাম। আমি ইতিমধ্যে তাঁর সম্পর্কে একটি অভাবিত খবর জানতে পেরেছিলাম। তিনি দশ লক্ষ ডলারের একটি চেক লিখেছিলেন। চেকটা ক্যাশ হয়ে যাওয়ার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেটি আবার তাঁর হাতে ফেরত দিয়েছিল। তিনি চেকটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে অফিস ঘরে রেখে দিয়েছেন।

এই খবরটা সংবাদপত্রে পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে ঐ ভদ্রলোক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আমি ওনার অফিস ঘরে ঢুকে প্রথমেই চেকটা দেখতে চেয়েছিলাম। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওনাকে প্রশংসা করেছিলাম।

অন্য কেউ হলে প্রথমেই কাজের কথাটা পেড়ে ফেলতো। তাতে কী হতো? তাতে ভদ্রলোক হয়তো আমাকে একজন অবস্থিত অতিথি হিসাবে চিহ্নিত করতেন। কিন্তু আমি আমার মনের কথাটা চট করে বললাম না। পরে ধীরে ধীরে আমার আগ্রহের কথা বললাম।

শেষ পর্যন্ত কী হলো? দেখা গেল, উনি যে শুধু একজনকে ইউরোপে পাঠালেন, তা নয়—পাঁচ জন বয়েজ স্কাউট এবং আমাকেও পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তাছাড়া এক হাজার ডলারের একটি চেক লিখে দিলেন। আমি যাতে ইউরোপে সাত সপ্তাহ থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করলেন। এরই পাশাপাশি তিনি ইউরোপে তাঁর শাখার প্রেসিডেন্টের পরিচয় পত্রও লিখে দিলেন। প্যারিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করে শহরটা ঘুরিয়ে দেখালেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার কয়েকটি দরিদ্র ছেলেকে ডাক দিয়েছিলেন। আমাদের বয়েজ স্কাউট আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী হয়ে গিয়েছিলেন।

কীভাবে তাঁকে এতোটা উৎসাহী করা হলো? আমি যদি ঐভাবে বুদ্ধি করে আগে তাঁর প্রশংসা না করতাম, তাহলে এই দয়ার একশো ভাগের এক ভাগও হয়তো পেতাম না।

আসুন, এই মূল্যবান কৌশলটাকে কীভাবে ব্যবসার কাজে লাগানো যেতে পারে, তা

একবার দেখাই যাক।

এই প্রসঙ্গে আমি ডুভার্নয় কোম্পানীর হেনরী জি ডুভার্নয়ের কথা তুলে ধরছি। তিনি হলেন নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত রুটি তৈরি কারখানার মালিক।

তিনি নিউইয়র্কের কোনো একটি হোটেলে তাঁর কোম্পানীর তৈরী করা রুটি বিক্রি করার চেষ্টা করছিলেন। চার বছর ধরে তিনি প্রতি সপ্তাহে হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছেন। ম্যানেজার যেখানেই যেতেন, তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন। এমনকি অন্য হোটেলের ম্যানেজারের সাথে ভাগ করে খেয়েছেন। সবই করেছেন পাউরুটির অর্ডার পাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস ফলপ্রসু হয়নি।

তারপর কী হলো? আসুন মিস্টার ডুভার্নয়ের আত্মজীবনীর পাতায় চোখ রাখা যাক। মি. ডুভার্নয় বলেছেন—মানব চরিত্র অনুধাবন করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ইতিমধ্যে আমার মধ্যে জন্মেছিল। আমি আমার কৌশল পাল্টানোর ব্যবস্থা করলাম। আমি জানতে চাইছিলাম, ভদ্রলোক কিসে অত্যন্ত আগ্রহী।

আমি জানতে পারলাম, তিনি হোটেল অভ্যর্থনা সমিতির সক্রিয় সদস্য। আরো জানতে পারলাম, তিনি শুধু সদস্যই নন, তাঁর দারুণ আগ্রহের জন্যে তাঁকে সভাপতি করা হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক সমিতিরও প্রেসিডেন্ট। যেখানেই ঐ সমিতির সভা থেকে তিনি হাজির হন। এমনকি এর জন্যে ওনাকে যদি মরুভূমি পার হতে হয়, পাহাড় ডিঙোতে হয় অথবা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়, উনি পিছিয়ে পড়েন না।

তাহলে? আমি ঠিক করলাম, ওনার সাথে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে। অভ্যর্থনাকারীদের স্বভাব-চরিত্র কেমন তা জানতে হবে।

এরপর আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

যেসব কথা ওনার মধ্যে জমেছিল সবকিছু উগরে দেবার চেষ্টা করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটাই ওনার জীবনের একমাত্র সখ। এমন কী, আমাকে ওনার সমিতির সদস্য করে নিলেন।

মনে রাখবেন, আমি কিন্তু আমার কোম্পানীর পাঁউরুটি নিয়ে একটি শব্দও খরচ করিনি। ক'দিন বাদে হোটেলের স্টুয়ার্ট রুটির নমুনা নিয়ে দেখা করতে ফোন করলেন।

স্টুয়ার্ট আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আমাদের ঐ বুড়ো প্রেসিডেন্টকে আপনি কীভাবে মাত করেছেন বলুন তো? খিটখিটে স্বভাবের মানুষ। কারো ভালো দেখতে পারে না। অথচ আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

তাহলে? চার বছর ধরে ভদ্রলোক যা করতে পারেননি, মাত্র আধ ঘণ্টাতে তিনি সেটা কী করে করলেন?

এক্ষেত্রে আমরা পাঁচ নম্বর নিয়মটি প্রয়োগ করতে পারি। তাহলো—অন্যের উৎসাহের ব্যাপার নিয়ে কথা বলুন। তাহলে দেখবেন, ঐ ব্যক্তি নিজে থেকেই আপনার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠছে।

নয়

কী করে চট করে ভালো লাগানো যায়

এবার আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা বলছি।

একদিন আমি নিউইয়র্কের ব্রাইট এভিনিউর থার্টি ফার্স্ট স্ট্রীটের একটি ডাকঘরে দাঁড়িয়ে

ছিলাম। একটি চিঠি রেজেস্ট্রি করতে হবে। লম্বা লাইন পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পাঠানো দরকার। অতএব স্বাভাবিক কারণেই আমার কপালে বিরক্তির ভুরু কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠেছিল।

আমি লক্ষ্য করলাম, রেজিস্ট্রির কেরাণী তাঁর কাজে খুবই একঘেয়েমি বোধ করছেন। এখানে তো বৈচিত্রের কোনো অবকাশ নেই। সেই এক ভাবে খাম ওজন করা। ডাকটিকিট দেওয়া। খুচরো পয়সা দেওয়া-নেওয়া করা। রসিদ লেখা। দিনের পর দিন ধরে এই কাজের যাঁতাকলে পিষে যাওয়া।

আমি নিজেকে বললাম—এই লোকটিকে এখনই তাঁর কাজের প্রতি উৎসাহী করে তুলতে হবে। তাঁকে পছন্দ সই ভালো ভালো কিছু কথা বলতে হবে। অবশ্য আমার সম্পর্কে নয়। ওর সম্পর্কে।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই আপাত নিরীহ রসকসহীন একটি মানুষকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অনেক সময় কঠিন। বিশেষ করে অচেনা মানুষ সম্পর্কে। তবে এক্ষেত্রে কাজটা সহজ হবে। আমি তখন ঠিক করলাম, কিভাবে ওনার সাথে ভাব জমানো যেতে পারে।

উনি যখন আমার খামখানা ওজন করছিলেন, তখন আমি মন্তব্য করলাম—আহা, আপনার মতো আমার যদি চুল থাকতো!

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন। অন্য কোনো মানুষ বোধহয় ওনাকে এভাবে প্রশংসা করেননি। সত্যিই তো ওনার চুলের বাহার দেখার মতো। ঘাড়ের কাছে নেমে গেছে।

উনি সলাজ হেসে বললেন—না-না, এ কী বলছেন। এখন তো আগের মতো চুল নেই।

জবাবে আমি বললাম—আগেকার জৌলুস হারিয়েও সেগুলো এখনো চমৎকার আছে।

ভদ্রলোক আবার অসম্ভব খুশী হলেন। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। শেষ কালে বললেন—অনেকেই আমার চুলের প্রশংসা করেছে।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি—সেদিন সারারাত ভদ্রলোকের চোখে ঘুম আসেনি। হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে সেদিন তিনি ডিনার খেয়েছিলেন। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দশবার নিজের চুল দেখে বলেছিলেন—আহা, আমার এতো সুন্দর চুল। অথচ আমি তার কদর করছি না।

এই গল্পটা আমি অনেকের সামনেই বলেছিলাম। তাঁরা অবাক হয়ে জানতে চেয়ে ছিলেন—মি. কার্নেগী। এর মাধ্যমে আপনার কী উপকার সাধিত হলো?

আমি ওঁর কাছে কী চাইছিলাম? সবসময় নিজের উপকার কেন চাইবো? আমি চেয়েছিলাম ওনার মনের মধ্যে খুশীর ভাব ছড়িয়ে দিতে। এবং এটা যে করতে পেরেছিলাম, তার জন্যে নিজেকে খুবই ভালোবাসতে ইচ্ছে করেছিল।

আমরা সবসময় কেন স্বার্থপর হয়ে উঠবো? কেন ভাববো, পরিবর্তে কিছু পাওয়ার আকাঙ্খা লুকিয়ে থাকবে আমাদের মনের মধ্যে? যদি আমাদের মন এই ধরনের নীচতা এবং চতুরতায় ভরে ওঠে—তাহলে সব কাজে ব্যর্থতাই হবে আমাদের একমাত্র প্রাপ্য।

তবে লোকটির কাছ থেকে আমি হয়তো কিছু আদায় করতে চাইছিলাম। ডলারে যার দাম দেওয়া যাবে না। এবং তা পেয়েছিলাম। এটা আমার সবথেকে বড় পাওনা। একটা আশ্চর্য মানসিক অনুভূতি। আমি যে ওনার ক্লান্ত বিধ্বস্ত মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। এটা ভেবে মনে মনে খুবই আনন্দ হয়েছিল আমার।

মানুষের ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন আছে। যদি আমরা সেই আইনের প্রতিটি ধারা এবং উপধারাকে মেনে চলি তাহলে কখনো আমাদের অসুবিধার সামনে দাঁড়াতে হবে না।

এই প্রসঙ্গে সবথেকে বড়ো আইন হলো—সবসময় অন্য মানুষটিকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ দিন।

প্রফেসার জন ডিউই বলেছেন—নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা মানুষের একটি চিরন্তন আকাঙ্খা। প্রফেসার উইলিয়াম জেমস বলেছেন—মানব চরিত্রে গভীরতম নীতি হলো প্রশংসিত হওয়ার আকাঙ্খা।

আগেই আমি বলেছি, আবার বলছি, এই আকাঙ্খাই আমাদের অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে। অর্থাৎ আমরা কুকুর, বেড়াল, শুয়োর, অথবা বাঘের থেকে আলাদা হতে পেরেছি। এই আকাঙ্খা আছে বলেই সভ্যতার জন্ম হয়েছে। এই আগ্রহ প্রতি মুহূর্তে সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দার্শনিকেরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনের এই গভীর অভীপ্সার ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁদের সমবেত চিন্তা ভাবনার মধ্যে দিয়ে মানব চরিত্র সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তবে এগুলি নতুন নয়, ইতিহাসের মতোই পুরোনো।

জরথুষ্ট ছিলেন এক বিশিষ্ট দার্শনিক। তিনি আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে তাঁর সমস্ত অগ্নি উপাসক অনুগামীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ২৪০০ বছর আগে কনফুসিয়াস নামে এক জ্ঞানী ব্যক্তি চীন দেশে এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। লাওৎসে, যিনি তাও ধর্মের উদগাতা, তিনি ফান উপত্যকায় তাঁর পবিত্র শিল্পদের কাছে এই বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব এটা শিখিয়েছিলেন খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে, পবিত্র গঙ্গার তীরে বসে। হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি তারও হাজার বছর আগে একই কথা শিখিয়েছিল। ১৯০০ বছর আগে প্রস্তরময় জুডিয়াতে যীশু এই শিক্ষাদান করেন।

যীশু একটিমাত্র বাক্যের ভেতর তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। এটিকে আমরা সারা পৃথিবীর সবথেকে দামী নীতি হিসাবে ঘোষণা করতে পারি—অন্যের প্রতি সেই ব্যবহারই করো অন্যের কাছ থেকে যা আশা করা যায়।

আপনি দৈনন্দিন কাজে যাদের সংস্পর্শে আসেন, তাদের কাছ থেকে কী ধরনের ব্যবহার আশা করেন? আপনি চাইবেন, আপনার কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন। যখনই এই মূল্যায়ন আপনি দেখতে পান, তখন লোকটির প্রতি অত্যন্ত খুশী হয়ে ওঠেন।

প্রত্যেক মানুষের একটি ছোট্ট দুনিয়া আছে। সেই মানুষটি ঐ দুনিয়াতে অবিসংবাদিত সম্রাট হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়। ঐ দুনিয়ার সমস্ত বাসিন্দার কাছে নিজের গুরুত্ব চায়। আপনি যদি কোনো সাধারণ মানুষও হয়ে থাকেন, তাহলেও, নিজের রাজত্বে আপনি নিজেই একজন রাজা!

তবে এখানে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হলো, আমরা কেউই ফাঁপা তোষামোদ ভালোবাসি না। আমরা সত্যিকারের সহযোগিতা এবং প্রশংসা শুনতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা চার্লস শোয়াবের কথা বলতে পারি। তিনি একবার কথার কথায় বলেছিলেন—সেইরকম মানুষদের আমরা ভালোবাসি, যারা হৃদয়ের স্বীকৃতি দান করে এবং সত্যিকারের প্রশংসা করে।

আমরা সবাই তাই চাই।

এবার আসুন, তাহলে আমরা সোনার অক্ষরে লেখা এই নীতিটাকে মেনে চলি। অন্যদের সেই জিনিস দিই, তাদের কাছ থেকে যা আমরা আশা করছি।

কেমন করে এই বাক্যটাকে আমরা আয়ত্ত করবো? যখন কোথায় কার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করবো?

এর একটা সহজ সুন্দর উত্তর লেখা আছে আমার কাছে। এর উত্তর হলো সব সময় এবং সব জায়গাতে।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমি একবার রেডিও সিটির খবর সংগ্রহকারী কেরানীর কাছ থেকে হেনরী সুভেইনের অফিসের ফোন নম্বরটা জানতে চেয়েছিলাম।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা সেই ভদ্রলোক এমন ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, মনে হলো, আমাকে নম্বরটা জানিয়ে তিনি অত্যন্ত গর্ববোধ করছেন। তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলেন—হেনরী সুভেইন। উনিশ তলা। ঘরের নম্বর ১৮১৬।

আমি এলিভেটরের দিকে ছুটে গেলাম। আবার ফিরে এলাম। আমি বললাম, আপনি যেভাবে সব জানালেন, তার জন্য একটা উষ্ণ অভিনন্দন অবশ্যই আপনার পাওনা! আপনি সুন্দর পরিষ্কার ভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আপনি যেন এক শিল্পীর মতো কাজ করেছেন। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

ঐ ভদ্রলোকের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কথার ফাঁকে ফাঁকে উনি একটু বিরতি দিয়েছিলেন। যাতে ওনার কথাটা আমার বোধগম্য হয়। উনি সত্যি সত্যি আমার প্রশংসা বাক্য শুনে খুবই গর্বিত হয়েছিলেন। উনিশ তলায় যাওয়ার অবসরে আমার মনে হয়েছিল, আমি সেই বিকেলে অন্তত একজন মানুষের মনে আকাঙ্খিত সুখের পরশ জাগাতে সমর্থ হয়েছি।

প্রশংসা-করা দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে আপনাকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বা কোনো বিশাল কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়ে উঠতে হবে না। আপনি প্রতিদিনই নিজের চারপাশে এই মোহাবিষ্ট ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারেন।

যেমন ধরুন, যিনি খাবার পরিবেশন করছেন, সেই মহিলাকে আপনি খাবারের আদেশ দিলেন। সে ভুল করে কিছু আনলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, তোমাকে আবার কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত। আমি আসলে এটা চাইনি। আমি অন্য কিছু একটা চেয়েছিলাম। হয়তো আমার বলতে ভুল হয়েছিল। তুমি কি রান্নাঘরে গিয়ে সেই খাবারটা নিয়ে আসবে?

সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে ভয়ে বলবে, না-না, কষ্ট কী? আসলে সে আনন্দের সঙ্গে আবার রান্নাঘরে ঘরে যাবে আপনার পছন্দ মতো পদটি নিয়ে খাবার ঘরে চলে আসবে। কেননা আপনি তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন।

আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত, দয়া করে কী ধন্যবাদ, যদি, ইত্যাদি আলঙ্কারিক শব্দগুলো আপনার বক্তব্যকে আরো পরিশীলিত করে তোলে, জীবনযাত্রাটাকে সুন্দর সুচারু করে, জীবনটাকে মোলায়েম করে তোলে।

এই ধরনের কথা বলতে গেলে আপনার অতিরিক্ত কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু যার প্রতি এই সব বাক্য বর্ষিত হয় সে বুঝতে পারে তার স্বভাব চরিত্র এবং বংশ মর্যাদার প্রতি আপনি কতখানি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

আপনি কী হল কেইনের কোনো উপন্যাস কখনো পড়েছেন? ক্রীশ্চান ডিমাস্টার ম্যাকলিয়াম? এক লক্ষ মানুষ তাঁর উপন্যাস পাঠ করেছেন। তিনি ছিলেন এক কর্মকারের সন্তান। সারা জীবনে মাত্র আট বছর স্কুলের সাথে ভাব-ভালোবাসা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু তিনি যখন মারা গেলেন, দেখা গেল, একজন অত্যন্ত অর্থবান সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কী করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হলো?

আসুন আমরা হল কেইনের গল্পগাথা শুনি।

হল কেইন সনেট এবং বীর গাথা ভালোবাসতেন। ছোটোবেলা থেকেই ভালোবাসতেন। ছোটোবেলাতেই তিনি দাস্তে কাফিয়েল রসেটির সব কবিতা পড়ে ফেলেন। শুধু পড়ে ফেলাই নয়, প্রতিটি পংক্তি মনের রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর।

একদিন তিনি রসেটির শিল্পমন্ডিত রচনার অপূর্ব প্রশংসা করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারই একটি কপি রসেটিকে পাঠিয়ে দিলেন। রসেটি সেটা পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন।

রসেটি হয়তো আপন মনে বলেছিলেন—যে তরুণ আমার সম্পর্কে এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে দারুণ কিছু।

রসেটি ঐ কামারের ছেলেকে তাঁর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানালেন। কেইন লন্ডনে এলেন। এই ঘটনাটা কেইনের জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এভাবেই তিনি সেকালের এক বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার বিরলতম সুযোগ পেয়েছিলেন। রসেটির পরামর্শ এবং উৎসাহে তিনি অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নতুন একটি জীবনে প্রবেশ করেন। যে জীবনে হাজার আলোর রোশনাই। তাঁর লেখক পরিচিতি শুরু হয়ে গেল।

তাঁর বাড়ি আইল অফ ম্যানের কেমাস ক্যাসেল সারা বিশ্বের ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে মক্কার মতো হয়ে উঠলো। এছাড়াও তিনি মৃত্যুর পরে রেখে গেলেন কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। হয়তো এসবই হয়েছিল রসেটির সংস্পর্শে আসার জন্যে। তিনি যদি এইভাবে ছোটোবেলা থেকে বই পড়ার স্বভাব না রাখতেন, রসেটিকে চিঠি না লিখতেন, তাহলে শত সহস্র অনামী সাধারণ হত দরিদ্র শ্রমিকের মতো তাঁর জীবন কেটে যেতো।

তাহলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছোটো ছোটো ঘটনা মানুষের জীবনে কী বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তবে দেখতে হবে, তার মধ্যে যেন আন্তরিকতা থাকে। হল কেইন কিন্তু সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা করে ও ভালোবেসে ঐ প্রশংসাসূচক চিঠিটি লিখেছিলেন। তিনি মিথ্যে তোষামোদ করতে চাননি। তাঁর এই আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হতে চেয়েছিলো।

আপনি কি ভাবেন জাপানীদের থেকে আপনি শ্রেষ্ঠ? আসল কথাটা হলো জাপানীরা সর্ব বিষয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবতে ভালোবাসেন। কোনো রক্ষণশীল জাপানী যদি কোনো সাদা চামড়ার মানুষকে জাপানী মহিলার সাথে নাচতে দেখেন, তাহলে ক্ষেপে আগুন হয়ে যান।

আপনি কি নিজেকে ভারতের হিন্দুদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে ভালোবাসেন?

ভারতীয় হিন্দুরা নিজেদের পৃথিবীর মধ্যে সবার সেরা বলেই মনে করেন।

আপনি কি নিজেকে এস্কিমোর থেকে সেরা বলে ভাবেন? এটা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন। কেননা এস্কিমোরা নিজেদেরই সেরা জাতি হিসাবে চিন্তাভাবনা করে থাকেন।

এস্কিমোদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা ভীষণ অলস। তাঁরা কাজকর্ম কিছুই করতে চান না। এস্কিমোরা তাদের বলে থাকেন সাদা চামড়ার মানুষ। এভাবেই তারা ঘৃণার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

যে কোনো জাতি নিজেকে অন্য জাতির থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে। এর থেকেই দেশ-প্রেমের জন্ম হয়, যার পরিনতি হলো মারাত্মক যুদ্ধ।

খোলাখুলি সত্যি কথাটাই বলে ফেলা ভালো। তাহলো, যে কোনো মানুষের সাথেই আপনার দেখা হোক না কেন, সে সবক্ষেত্রে আপনাকে তার থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করে।

তার হৃদয়ে প্রবেশ করার নিশ্চিত উপায় হলো, তার এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আপনি ওয়াকিবহাল। ছোট্ট এই পৃথিবীতে সে যে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে সেই খবরটা ইতিমধ্যেই আপনার কানে পৌঁছে গেছে।

এই প্রসঙ্গে এমারসন কী বলেছেন সেটা কি আপনার মনে আছে? এমারসন বলেছেন —যখনই কোনো মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আমি মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিই। আমি বেশ বুঝতে পারি, উনি ওনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন। আমাকে নীরবে তা মেনে নিতে হবে। তবেই হয়তো ওনার কাছে আমি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারবো।

এখানে একটি দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমন একজন মানুষের সাথে পরিচয় হয়, যার চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কণামাত্র নেই। যিনি সকল কাজে অসমর্থ অক্ষম এবং অসফল। তিনি শুধু গলাবাজী করে লোক ঠকাবার চেষ্টা করেন। অথচ তাঁকেও শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে হয়।

এ সম্পর্কে শেক্সপীয়ার বলেছিলেন —মানুষ। গর্বিত মানুষ! সামান্য অধিকারের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সে এমন কিছু অদ্ভুত কাজ করে বসে, যাতে স্বর্গের দেবদূতরাও কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এবার আমি আমার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইছি। আমার পাঠক্রমের কিছু ব্যবসায়ী ছাত্র এই আপ্তবাক্যগুলি মেনে চলে জীবনে কী অসম্ভব সফলতা অর্জন করে চলেছেন।

প্রথমেই আমি কানেকটিকাটের সেই অ্যাটর্নির কথাটাই বলবো। অবশ্য তাঁর অনুরোধে আমি তাঁর আসল নামটা আপনাদের শোনাতে পারছি না। তিনি এ ব্যাপারে বারবার তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক আমার পাঠক্রমে যোগ দিলেন। আসুন তাঁকে আমরা সংক্ষেপে মি. আর বলে ডাকি। কিছুদিন বাদে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লঙ আইল্যান্ডে গেলেন। সেখানে তাঁর কিছু আত্মীয়স্বজন বসবাস করেন। তারপর তিনি গেলেন এক বৃদ্ধা পিসির সাথে আত্মীয়দের বাড়িতে। মি. আর বৃদ্ধাকেই তাঁর নতুন শেখা বাক্যগুলি বলতে শুরু করলেন। বাড়ির চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কোন্ বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত তিনি ভাবলেন, বাড়িটা নিয়ে কথা বললে কেমন হয়?

মি. আর বললেন—এই বাড়িটা ১৮৯০ সালে বানানো হয়েছিল, আমি কি ঠিক বলছি?

বৃদ্ধা জবাব দিলেন —হ্যাঁ, আপনার অনুমান সঠিক। ঐ বছরেই এই বাড়িটা তৈরি হয়।

মি. আর আরো বললেন —বাড়িটা ভারি সুন্দর তো। কতগুলো ঘর আছে। জানেন তো আজকাল আর কেউ এতো সুন্দর বাড়ি বানাতে চায় না।

বৃদ্ধা বললেন— আপনি ঠিকই বলেছেন। আজকালকার কম বয়েসীরা ছোটো ছোটো বাড়ি বানায়। তারা বাড়িগুলোকে ইটের খুপচি ঘর করে ফেলে। তারা চায় ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্ট। ইলেকট্রিক বরফের বাক্স। তারপর কেবল মোটর গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোও।

বৃদ্ধা একটু থামলেন। তারপর আরো বলে ফেললেন—এই বাড়িটা সত্যি সত্যি একটা স্বপ্নের বাড়ি। কত ভালোবাসা দিয়ে এটা তৈরি হয়েছিল। আমার স্বামী আর আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের কাজ দেখতাম। আমাদের কোনো সম্পত্তি ছিল না। আমার স্বামী তিলতিল করে পয়সা জমিয়ে বিরাট বাড়িটা বানিয়েছিলেন। সমস্ত পরিকল্পনা আমরা নিজেরাই

করেছিলাম।

মি. আর বুঝতে পারলেন, ভদ্রমহিলাকে সঠিক জায়গাতে আঘাত করা সম্ভব হয়েছে। বৃদ্ধা উঠে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। তিনি সারা জীবন ধরে যেসব ছোটো ছোটো জিনিস সংগ্রহ করেছেন, সেই স্মারকগুলো নানা ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। মি. আর সবকিছুরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন।

তিনি বললেন —বাঃ, চমৎকার কাজ করা শালতো! এটা কোথায় পেয়েছেন? পুরোনো আমলের চায়ের সরঞ্জাম। চীনামাটির পাত্র। ফরাসী কায়দার বিছানা আর চেয়ার। ইতালীয় তেলরঙের ছবি। রেশমী পর্দা। এটা হয়তো কোনো একসময়ে ফরাসী দুর্গে শোভা পেতো।

মি. আর এর কাছ থেকে এই প্রশংসা বাক্য শুনে ঐ ভদ্রমহিলা আরো উৎসাহিত হয়েছিলেন। এবার তিনি মি. আরকে নিয়ে একটি গ্যারেজে গেলেন। সেখানে একটা প্যাকার্ড যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। গাড়িটা প্রায় নতুন। দেখলেই বোঝা যায় খুব বেশি দিন রোদ-ঝড়-জল সহ্য করতে হয়নি তাকে।

বৃদ্ধা বললেন —আমার স্বামী মারা যাবার কিছুদিন আগেই গাড়িটা কিনেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আর গাড়িটাতে চড়িনি। আপনি তো ভালো জিনিসের কদর বোঝেন। ভাবছি, আপনাকেই আমি এই গাড়িটা উপহার দেবো।

মি. আর অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন— সে কি, পিসিমা, আপনি একী বলছেন? আপনার এই উদারতার প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। কিন্তু আপনার এই উপহার তো আমি নিতে পারবো না। আমি তো আপনার কোনো নিকট আত্মীয় নই। তাছাড়া আমার একটা গাড়ি আছে। আপনার কত আত্মীয় আছে। তারা এই উপহারটা পেলে সত্যি সত্যি খুশী হবে। হয়তো গাড়িটা তাদের কাজে লাগবে।

বৃদ্ধা এই কথা শুনে খুব ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন —আত্মীয়? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার অনেক আত্মীয় আছে বটে। কিন্তু তারা শকুনির মতো চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। তারা চাইছে, কখন আমি দু'চোখ বন্ধ করবো। আর তারা এই বিশাল সম্পত্তিটা নিয়ে মারামারি শুরু করবে। আমি কিছুতেই গাড়িটা তাদের হাতে দেবো না।

মি. আর বুঝতে পারলেন, এভাবে ভদ্রমহিলাকে রাগে আনা সম্ভব হবে না। তখন বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটা কাজ করুন। অনেকেই পুরোনো গাড়ি কেনাবেচা করে থাকে। আমি তাদের ঠিকানা আপনাকে দিতে পারি। আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। তাহলে গাড়িটা বেচে কিছু টাকা আপনার হাতে আসবে।

বৃদ্ধা এই কথাতে খুব রেগে গিয়েছিলেন। তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তিনি বললেন—মি. আর, আপনি কী ভাবছেন? আমাকে আপনি বুঝতে পারেননি। এই গাড়ি আমি কখনো বিক্রি করতে পারি? যে গাড়ি আমার স্বামী আমার জন্যে কিনেছিলেন, তাতে অজানা অচেনা মানুষেরা ঘুরে বেড়াবে, আমি তা সহ্য করবো কেমন করে? আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে এই গাড়ি কখনো বেচতে হবে আমাকে। আমার কি টাকার অভাব পড়েছে? না, আপনার কোনো ওজোর আপত্তি আমি শুনবো না। এই গাড়িটা আমি আপনাকে উপহার দেবো। কেননা আপনি ভালো জিনিসের কদর বোঝেন।

মি. আর নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন, এই উপহারটা না নিতে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর এহেন আচরণ বৃদ্ধার মনে কষ্ট দেবে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাঁকে ঐ গাড়িটা নিতে হয়েছিলো।

তাহলে? এই ঘটনা থেকে আমরা কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? আমরা বুঝতে পারি বৃদ্ধা বিরাট একটি বাড়িতে বাস করেন। সেখানে দামী জিনিসপত্র আছে। আছে ফরাসী

ছবি এবং চাপের সরঞ্জাম। কিন্তু কী নেই? নেই মর্যাদা এবং মনুষ্যত্ববোধ।

একদিন তিনি ছিলেন সবার প্রিয় এক যুবতী। ভালোবাসা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। ইউরোপের নানা দেশ ঘুরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে। তাঁর স্মৃতি চিহ্ন বহন করে ছিলেন। আজ তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন। যৌবনের দিন অস্তমিত হয়েছে। আজ তিনি নিঃসঙ্গ তার উপত্যকায় একলা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চাইছেন মানুষের সামান্য সাহচর্য, প্রশংসা এবং হৃদয়ের উষ্ণতা। কিন্তু কেউ তাঁকে তা দেয়নি। আর যখন তিনি তার সন্ধান পেলেন, তাঁর মরুভূমি হৃদয়ে ঝর্ণার মতো সবকিছু ঝরে পড়লো। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা তিনি পেলেন না। ঐ প্যাকার্ড গাড়িটা উপহার দিয়ে হয়তো সেই কৃতজ্ঞতার সামান্য কিছু প্রকাশ করতে চাইলেন।

জীবন থেকে নেওয়া আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

এই কাহিনীটি আমাকে বলেছেন ডোনাল্ড এম ম্যাকমোহন। তিনি নিউইয়র্কে লুইস অ্যাণ্ড ভ্যালেন্টাইন কোম্পানীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের শিল্পী। নিজের কাজের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ। তাঁর কথাতেই তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প শোনা যাক।

...বন্ধুত্ব লাভ ও প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে আমি একটি বেতার কথিকা শুনেছিলাম। এরপরেই আমি এক বিখ্যাত অ্যাটর্নির এস্টেটের ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকছিলাম।

বাড়ির মালিকের চমৎকার বাগানের সখ ছিল। আমি ওনাকে অযাচিতভাবে কিছু উপদেশ দিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম কোথায় রডোডেনড্রন লাগাতে হবে।

ভদ্রলোক আমার প্রতি খুবই খুশী হলেন। তাঁর কুকুর পোষারও সখ ছিল। আমার ধারণা ম্যাডিসন গার্ডেনে কুকুর প্রদর্শনীতে সেই কুকুরগুলি পুরস্কার পেতে পারে।

আমি এ বিষয়েও তাঁর সখের প্রশংসা করেছিলাম।

জজ সাহেবের মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন —কুকুরদের নিয়ে আমার খুব আনন্দ। আপনি ওদের থাকার ঘরটা একবার দেখবেন কি?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উনি কুকুরদের সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য বলে চললেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যোগ দিয়ে ঐসব কুকুর ছানারা যেসব পুরস্কার পেয়েছে সেগুলো আমাকে দেখালেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —আপনার কি কোনো ছোটো ছেলে আছে?

আমি জবাব দিলাম —হ্যাঁ, আছে।

জজ সাহেব এবার জানতে চাইলেন —একটা কুকুরছানা যদি আমি তাকে উপহার দিতে চাই—সে কি আপত্তি করবে?

আমি বললাম —না না, তাহলে তো সে আনন্দে একেবারে লাল হয়ে যাবে।

জজ সাহেব জবাব দিলেন —ঠিক আছে, আমি একটা ছোট্ট সাদা নরম তুলতুলে কুকুরছানা তাকে উপহার দিচ্ছি।

পরপর তিনি আমাকে কুকুরের বিষয়ে অনেক কথা বললেন। কীভাবে তাদের খাওয়াতে হবে। কীভাবে তাদের সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঘুরতে হবে, কীভাবে তারা রাতে বিশ্রাম নেবে, ইত্যাদি আরো কত কী। শুধু মুখের কথাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে কাগজে সব লিখেছিলেন। আমি দেখলাম, কুকুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর একঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় চলে গেছে। এতে আমার কী হলো? আমি একশো ডলার দামের কুকুর ছানাটি পেলাম। এর কারণ কী? আমি জজ সাহেবের সখ সম্বন্ধে আমার আন্তরিক ভালোবাসা জ্ঞাপন করেছিলাম।

কোডাকের বিখ্যাত জর্জ ইস্টম্যানের কথা আমরা সবাই জানি। তিনি স্বচ্ছ ফিল্ম আবিষ্কার করেন। এর ফলে চলচ্চিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। জীবনে উনি প্রায় একশো কোটি ডলার আয় করেছিলেন। এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। সফল ব্যবসায়ী হিসাবে নাম কিনেছিলেন। তা সত্ত্বেও আমি দেখেছি, উনিও প্রশংসার জন্যে অদ্ভুত স্থির চিত্তে অপেক্ষা করতেন।

কয়েক বছর আগের কথা। ইস্টম্যান তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্যে রচেস্টারে স্কুল অফ মিউজিক অঞ্চলে কিলবোর্ন হল নামে একটি নাট্যমঞ্চ তৈরি করেছিলেন। তখন নিউইয়র্কের সুপিরিয়র সিটিং কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেমস অ্যাডামসন। তিনি থিয়েটারের চেয়ার সরবরাহ করার অর্ডারটা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ইস্টম্যানের স্থপতিকে তিনি ফোন করেন। ইস্টম্যানের সাথে এক সাক্ষাতকারের অনুমতি চাইলেন।

অ্যাডামসন শুধু এটুকুই চেয়েছিলেন।

তাঁকে ইস্টম্যানের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। অ্যাডামসন দেখলো, ইস্টম্যান তাঁর ডেস্কের সামনে কিছু কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। একটু পরেই ইস্টম্যান মুখ তুললেন। চশমা খুলে স্থপতি আর মি. অ্যাডামসনের দিকে এগিয়ে এলেন।

মি. ইস্টম্যান বললেন —সুপ্রভাত, ভদ্রমহোদয়রা, বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি।

স্থপতি মি. অ্যাডামসনের পরিচয় দিলেন।

মি. অ্যাডামসন বললেন —আপনার জন্যে অপেক্ষা করার ফাঁকে আপনার চমৎকার অফিসের তারিফ করছিলাম। আমি বড্ড স্বপ্ন দেখতাম, এমন একটা সুন্দর ছিমছাম অফিস তৈরি করবো। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, আমি সারাজীবন ধরে অন্যের বাড়ি সাজিয়ে রাখার কাজই করে চলেছি। তবুও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এমন সুন্দর সাজানো অফিস আমি এর আগে কোথাও দেখিনি।

জর্জ ইস্টম্যান জবাবে বললেন —আপনি তো একটা ভালো কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এটা যখন বানানো হয়, তখন সত্যি এর সৌন্দর্যে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। কিন্তু এখন নানারকম কাজে আমাকে এতো ব্যস্ত থাকতে হয় যে অফিসের দিকে তাকাবার মতো ফুরসত পাই না।

অ্যাডামসন এগিয়ে এসে একটা প্যানেলে হাত রাখলেন। অ্যাডামসন বললেন—এটা ইংলিশ ওক কাঠে তৈরি। তাই নয় কি? ইতালীয় ওকের থেকে এর খাঁজগুলো একেবারেই আলাদা।

ইস্টম্যান জবাব দিলেন —হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন তো। ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করা ওক গাছ থেকে এটি তৈরি করা হয়েছে। কাঠের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক বন্ধু আমাকে এই পরামর্শটা দিয়েছিলেন।

এরপর ইস্টম্যান অ্যাডামসনকে সঙ্গী করে অফিসের নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়ালেন। এক-একটি জিনিসপত্রের ওপর হাত রাখলেন। কীভাবে দেয়ালে রঙ করা হয়েছে তা বোঝালেন। প্যানেলগুলো কেমন ত্যেরছা ভাবে বসানো হয়েছে এবং তার ফলে নান্দনিক কী কী পরিবর্তন হয়েছে সবকিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন।

ঘরটায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জর্জ ইস্টম্যান ইতিমধ্যেই তাঁর কিছু কিছু জনদরদী কাজের নমুনা দিচ্ছিলেন। তিনি রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। জেনারেল হাসপাতাল তৈরি করেছেন। অনাথ শিশুদের জন্যে ফ্রেন্ডলি হোম তৈরি করেছেন। এরই পাশাপাশি শিশু হাসপাতালে অনেক অর্থ দিয়েছেন।

মি. অ্যাডামসন বারে বারেই মি. জর্জ ইস্টম্যানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। তাঁর এইসব মানবদরদী কাজের জন্যে তারিফ করেছিলেন। এরপর জর্জ ইস্টম্যান একটা কাচের বাক্স খুললেন। একটি ক্যামেরা ব্যবহার করলেন। এই ক্যামেরাটি তিনি এক ইংরেজের কাছ থেকে কিনেছিলেন। প্রথম জীবনে এই ক্যামেরাটি তিনি ব্যবহার করতেন।

ইস্টম্যান তাঁর ছেলেবেলার গল্পকথা বলতে শুরু করলেন। ছেলেবেলায় তাঁকে নিদারুণ দুর্বিষহ ঘন জীবন কাটাতে হয়েছিল। ইস্টম্যান জানালেন, তিনি কীভাবে একটি বোর্ডের হাউস চালাতেন। বাবা-মার পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। পরবর্তীকালে একটি বীমা কোম্পানীতে কেরানীর কাজ করতেন। দৈনিকমাত্র পঞ্চাশ সেন্ট করে মাইনে পেতেন।

দারিদ্র্যের ভীষণ আঘাত তাঁকে বারবার সহ্য করতে হতো। তখন তিনি শপথ করেছিলেন যদি কখনো অনেক টাকা আয় করতে পারেন, তাহলে মাকে আর কাজ করতে দেবেন না।

তিনি আরো অনেক কথা বললেন। ইস্টম্যান বললেন, তিনি কীভাবে শুকনো ফটোগ্রাফীর প্লেট নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন। এখনো তেমন করে দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। কখনো কখনো সমস্ত রাত জেগে থাকেন। কখনো আবার কাজের ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেন। একই পোশাক পরে বাহাত্তর ঘণ্টা কাজ করেন।

জেমস অ্যাডামসন, জর্জ ইস্টম্যানের ঘরে ঢুকেছিলেন সকাল দশটা বেজে পনেরো মিনিটে। বলা হয়েছিল, তাঁকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল, একঘণ্টা কেটে গেছে দু'ঘণ্টা কেটে গেছে, তখনো তাঁরা দু'জনে পরম বন্ধুর মতো গল্প করে চলেছেন।

শেষ পর্যন্ত জর্জ ইস্টম্যান অ্যাডামসনের দিকে তাকিয়ে বললেন —আমি যখন শেষ জাপানে গিয়েছিলাম, তখন সেখান থেকে কয়েকটা চেয়ার কিনে নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলো বারান্দায় রেখেছি। রোদ্দুর লেগে রঙ চটে গেছে। তারপর নিজেই রঙ কিনে ওগুলো রঙ করেছি। দেখবেন নাকি, আমার কেরামতিটা? দেখলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, ওগুলো এক আনাড়ি হাতের কারুকাজ।

ঠিক আছে, চলুন বাড়িতে আমার সাথে মধ্যাহ্ন ভোজটা সারবেন। তারপর ঐ চেয়ারগুলো আপনাকে দেখাবো আমি।

অ্যাডামসন ইস্টম্যানের বাড়িতে গেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ হলো। ইস্টম্যান জাপান থেকে আনা চেয়ার দেখালেন। চেয়ারগুলোর দাম দেড় ডলারের বেশি নয়। কিন্তু যে জর্জ ইস্টম্যান ব্যবসাতে একশো কোটি টাকা আয় করেছেন তিনি নিজেই যে রঙ করতে পারেন, খবরটা জানাবার জন্যে ছটফট করছিলেন।

চেয়ারগুলোর জন্যে যে অর্ডার দেওয়ার কথা ছিল, তার মোট দাম নব্বই হাজার ডলার। অর্ডারটা শেষ পর্যন্ত কে পেয়েছিলেন বলে আপনাদের ধারণা? জেমস অ্যাডামসন, নাকি তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী?

এরপর মি. ইস্টম্যানের সাথে জেমস অ্যাডামসনের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

তাহলে? চিন্তা করুন তো? আমরা কোন্ জায়গা থেকে প্রশংসা করতে শুরু করবো।

নিজের বাড়িতেই এই কাজটা শুরু করা যেতে পারে। বাড়িতে আপনি স্ত্রীকে সাধারণত অবহেলা করেন, আপনার স্ত্রীর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভালো গুণ আছে। অথচ তার দিকে আপনি তাকিয়েও দেখেন না। পাশের বাড়ির কোনো সুন্দরী মেয়ের প্রতি অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমনটি করলে জীবনে দুর্বিষহ প্রহর নেমে আসবে।

ভাবুন তো, শেষ কবে স্ত্রীর সাথে হেসে কথা বলেছেন? কতদিন আগে?

কয়েক বছর আগের কথা। তখন আমি নিউব্রাজ উইকে বেড়াতে গেছি। মিরামিচির

একটি জলাশয়ে মাছ ধরছি। জায়গাটা কানাডার অরণ্য এলাকাতে অবস্থিত। দিনের পর দিন নির্জন তাঁবুর মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। গ্রামের একটি খবরের কাগজে পড়ছি। কাগজটা বারবার উল্টেপাল্টে পড়তে হতো আমাকে। বিজ্ঞাপন পর্যন্ত পড়ে ফেলতাম। ওখানেই ডরোথী ডিক্সের একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ঐ প্রবন্ধের শব্দগুলো আমাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যে আমিও ঐ প্রবন্ধের শব্দগুলো কেটে রেখে দিয়েছিলাম।

ডরোথী ডিক্সের কথা হলো, দাম্পত্য জীবনে কলহ সৃষ্টির কারণ কি? স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরকে প্রশংসা করেন না। তাঁরা গতানুগতিক জীবন কাটান।

এক্ষেত্রে ডিক্সের একটি উপদেশ আছে। তা হলো—প্রেয়সীকে চুমু দেওয়ার আগে কখনো বিয়ে করবেন না। বিয়ের আগে কোনো মেয়েকে প্রশংসা করা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পর সেটা করা উচিত। এর মধ্যে নিরাপত্তা লুকিয়ে আছে। বিয়েতে স্পষ্ট কথার স্থান নেই। বিয়ে হলো একটা কূটনৈতিক বোঝাপড়া।

আপনি যদি প্রতি দিনের বিবাহিত জীবন সুখে শান্তিতে কাটাতে চান, তাহলে কোনোভাবেই আপনার স্ত্রীর ঘর কন্যার কাজে মাথা গলাবেন না। তাঁর কাজের সাথে নিজের মায়ের তুলনা করবেন না। তিনি যেভাবে সংসারের সবকিছু সামলাচ্ছেন, তার প্রশংসা করবেন। তাঁর মতো একজন গুণসম্পন্না মহিলাকে বিয়ে করেছেন বলে নিজেকে ধন্যবাদ দেবেন। বলবেন তাঁর মধ্যে পেয়েছেন ভেনাস আর মিনার্ভার সম্মিলিত সৌন্দর্য। মাংস যদি শক্ত হয়ে যায় বা রুটি যদি পুড়ে যায়, তবুও অভিযোগ করবেন না। বরং মিনমিনে গলায় বলতে চেষ্টা করবেন, রান্নাটা আজ খুব একটা ভালো হয়নি তো। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে?

স্ত্রী সবকিছু বুঝতে পারবেন। তিনি আবার সযত্নে আপনার সেবা করতে শুরু করবেন।

কিন্তু এই কাজটা হঠাৎ করতে যাবেন না। তাহলে তাঁর সন্দেহ হতে পারে। যেমন, আজ অথবা আগামীকাল রাতে আপনি আপনার স্ত্রীর জন্যে একগোছা ফুল বা কিছু মিষ্টি নিয়ে এলেন। কখনো বলবেন না—এটা আমার আগেই করা উচিত ছিল। তাহলে আপনার বুদ্ধিমতী স্ত্রী আপনার কৌশল ধরে ফেলবেন। বরং আপনি মুখে হাসির টুকরো ছড়িয়ে দেবেন। প্রেমের কথা বলবেন। আর এভাবেই হয়তো আপনি বিবাহ বিচ্ছেদকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন।

কোনো মেয়েকে কখনো প্রেম নিবেদন করেছেন কি? প্রেমের খেলায় জিততে হলে আপনাকে কী করতে হবে? এই কৌশলটা অবশ্য আমার নয়। ডরোথী ডিক্সের লেখা থেকেই এটা আমি পেয়েছি।

তিনি একবার বিয়ে পাগল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভদ্রলোক তেইশ বার সুন্দরীদের হৃদয় এবং তাদের ব্যাঙ্কের তহবিল জয় করেছিলেন। অবশ্য এখানে জনান্তিকে জানিয়ে রাখি, বিয়ে পাগলা ঐ মানুষটির সাথে ডরোথী ডিক্সের দেখা হয়েছিল রুদ্ধ কারার অন্তরালে।

ডরোথী ডিক্স তাঁর কাছে সোজাসুজি জানতে চেয়েছিলেন, আপনি কীভাবে তেইশটি মহিলাকে বিবাহ করেছেন?

ভদ্রলোক জবাব দেন —এর মধ্যে কোনো রহস্য নেই। মেয়েটির সম্পর্কে অনর্গল কথা বলতে হবে। তার সমস্ত দোষগুলিকে গুণে পরিণত করতে হবে। বলতে হবে, আমার চোখে তুমিই জগত সভার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই কৌশল থাকে। ডিজরেলি একবার বলেছিলেন —যে কোনো পুরুষের সাথে দেখা হলে তার বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা শুনে যাবেন। ডিজরেলি ছিলেন

অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি এতো সুষ্ঠভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য চালিয়েছিলেন, এখনো তা আমাদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহলে, মানুষকে ভালোবাসতে গেলে যে গুণটি আপনাকে আয়ত্ব করতে হবে তা হলো —অপরের ব্যক্তিকে তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করার সুযোগ দিন। এই কাজটা আপনাকে আন্তরিক ভাবেই করতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরেই তো এই বইটা পড়ে চলেছেন। আসুন, এবার আমার কথা মতো বইটা বন্ধ করুন। পাইপের তামাক ঝেড়ে ফেলুন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মানুষটির ওপর তত্ত্বগুলো একবার প্রয়োগ করবেন নাকি? দেখবেন নাকি? যাদুকরী ক্ষমতা কতখানি আকাশচুম্বী হয়ে গেছে।

আসুন, অল্প কথায় ছ'টি নিয়ম বলে দেওয়া যাক।

প্রথম নিয়ম—অপরের সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম—সব-সময় হাসতে হবে। হাসির মাধ্যমে আমরা জীবনের অনেক সমস্যাকে দূর আকাশে পাঠাতে পারি।

তৃতীয় নিয়ম —মনে রাখতে হবে, যে কোনো মানুষের কাছে তার নিজের নামটি হলো পৃথিবীর সব থেকে প্রিয় শব্দ।

চতুর্থ নিয়ম —ভালো শ্রোতা হতে হবে। তারপরে যখন কথা বলবে তখন চুপ করে শুনতে হবে।

পঞ্চম নিয়ম —অন্যের আগ্রহের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে হবে।

ষষ্ঠ নিয়ম —নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাববেন না। বরং যার সাথে কথা বলছেন, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

আমি সুনিশ্চিত, ওপরে বর্ণিত এই দুটি নিয়ম যদি আপনি আন্তরিকভাবে পালন করেন, তাহলে অচিরেই আপনি জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে পা রাখতে পারবেন।

দশ

কখনোই আপনি তর্কে জিততে পারবেন না

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমি লন্ডন শহরে গেছি। সেখানে আমার একটা মূল্যবান শিক্ষা লাভ হয়েছিল।

তখন আমি ছিলাম স্যার রসস্মিথের ম্যানেজার। যুদ্ধের সময় স্যার রস প্যালেস্টাইনে অস্ট্রেলিয়ার এক দক্ষ বৈমানিক ছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তিনি পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা তিরিশ দিনে উড়ে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

এই জাতীয় কাজ যে কেউ করতে পারেন, আগে সেটা ভাবাই যায়নি। ব্যাপারটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সমস্ত খবরের কাগজের পাতায় ছবিসহ তাঁর এই উত্তেজক অভিযানের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয় সরকার তাঁকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের রাজা তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনিই ছিলেন ইউনিয়নে সব থেকে আলোচিত মানুষ।

পরবর্তীকালে তাঁকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের চার্লস লিন্ডবার্গ বলা হতো। আমি একরাতে স্যার রসের সম্মানে দেওয়া একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। নৈশভোজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি আমাকে কিছু গল্প শোনাচ্ছিলেন। তার মধ্যে

একটি উদ্ধৃতি ছিল।

ভদ্রলোক বললেন —ঐ উদ্ধৃতিটা বাইবেলে আছে। কিন্তু তাঁর ভুল হয়েছিল। আমি ভালো করেই এটা জানতাম। একেবারে সুনিশ্চিত। নিজের ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল। আমি কি খুব একটা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি? সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম কি? আমি কি তাঁর ভুল ধরলাম? কিন্তু দেখলাম, তিনি নিজের কথাতেই বারবার জোর দিচ্ছেন। তিনি শেক্সপীয়ার থেকে কোনো কথা বলে সেটি বাইবেলের উক্তি বলে চালাচ্ছেন। বারবার বলছেন এটা বাইবেলের অমুক পাতায় লেখা আছে।

ভদ্রলোক আমার ডানদিকে বসেছিলেন। আমার বাঁদিকে ছিলেন আমার এক পুরোনো বন্ধু। মি. ফ্রাঙ্ক গ্যামন্ড। গ্যামন্ড বহু বছর ধরে শেক্সপীয়ারের ওপর গবেষণা করছেন। অতএব, আমি এবং ঐ ভদ্রলোক মি. গ্যামন্ডের কাছে গেলাম। গ্যামন্ড যা বলবেন তাই মেনে নেওয়া হবে।

গ্যামন্ড সবকিছু শুনলেন তারপর টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ে সজোরে ধাক্কা মারলেন। বললেন —ডেল, তুমি ভুল বলছো। ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। এই উদ্ধৃতিটা বাইবেলেই আছে।

গ্যামন্ডের এহেন ব্যবহারে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় আমি প্রিয় বন্ধু গ্যামন্ডকে বললাম—ফ্রাঙ্ক তুমি তো জানতে এই উদ্ধৃতিটা শেক্সপীয়ার থেকে নেওয়া। তাহলে তুমি ওনার সামনে এমন আচরণ করলে কেন?

গ্যামন্ড হাসতে হাসতে জবাব দিলেন —হ্যাঁ কার্নেগী, আমি জানতাম বৈকি। হ্যামলেটের পঞ্চাশ পর্বের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে উদ্ধৃতিটা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ডেল, ভুলে যেও না আমরা একটা আনন্দ অনুষ্ঠানের অতিথি হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক যে ভুল বলছেন তা প্রমাণ করে আমার কিবা লাভ হতো। তাতে কি উনি তোমাকে পছন্দ করতেন? তাই আমি ঠিক কাজই করছি। আমার মনে হয়েছিল। এভাবে ওনার মুখ রক্ষা করা উচিত। উনি তো তোমার কোনো মতামত চাননি। তাই একের কী দরকার? জীবনে সবসময় বাঁকা পথ এড়িয়ে চলবে।

সবসময় বাঁকা পথ এড়িয়ে চলবে— এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অহেতুক ঝগড়া তর্ক করে কী লাভ?

একসময় আমি সবসময় তর্ক করতাম। কারো কথা যদি আমার মনোমতো না হতো, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নেড়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতাম।

একেবারে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। তখন আমি আমার ভাইয়ের সাথে নানা বিষয়ে তর্ক করতাম। যখন কলেজে ভর্তি হলাম, তখন তর্কশাস্ত্র ছিল আমার একটি প্রিয় বিষয়। অতএব, তর্ক করতেই আমার ভালো লাগতো। একের পর এক বিতর্ক সভায় যোগ দিতাম। আমার জন্ম হয়েছিল মিসৌরীতে, পরে আমি তর্ক বিদ্যা নিয়ে পড়িয়েছিলাম। এখন স্বীকার করতে লজ্জা করছে, এই বিষয় নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বই লেখার ইচ্ছাও জেগেছিল আমার মনে মধ্যে।

তখন থেকেই আমি অনেকের কথাবার্তা শুনেছি, সমালোচনা করেছি। দেখেছি এই সব কথা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

শেষ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঐ গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিটা হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম অযথা তর্ক করে কোনো লাভ নেই। বরং তর্ককে এড়িয়ে চলাই উচিত। তর্ক হলো বিষধর সাপ বা ভূমিকম্পের মতো।

যদি দশটি তর্কসভাতে যাবার সৌভাগ্য আপনার হয়ে থাকে, তাহলে নটির ক্ষেত্রে আপনি

কী দেখছেন? তর্কে অংশগ্রহণকারী দুই ব্যক্তি উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁরা আরো জোরে চিৎকার করেছেন। এইভাবে গলাবাজিতে বিরুদ্ধ পক্ষকে হারিয়ে দিতে চাইছেন।

কোনো তর্কে কেউ কখনো জিততে পারবেন না। কেননা তার একটা কারণ আছে। যদি আপনি হেরে গেলেন তাহলে তো হয়েই গেল। আর যদি আপনি জেতেন তাহলেও আপনাকে হারতে হবে। কথাটার মধ্যে একটু ধাঁধা লেগে আছে কি? যদি আপনি প্রমাণ করেন যে কারো কথাই ষোলো আনা ভুল, তাহলেই বা কী হবে? আপনার হয়তো দারুণ ভালো লাগবে। উপস্থিত সকলে আপনার বক্তব্যকে সামনে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু যে লোকটি হেরে গেলেন তাঁর কী হবে? তাঁকে আপনি ছোট প্রমাণিত করেছেন। আপনি তাঁর আত্মঅহমিকাতে আঘাত করেছেন। উনি কিছুতেই এই পরাজয় মেনে নেবেন না। উনি চাইবেন, কীভাবে ছলে-বলে কৌশলে আপনাকে আবার হারিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

একটি কবিতাতে পরিষ্কার লেখা আছে, কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু মেনে নিতে বললে সে কখনোই মেনে নেবে না। শত চেষ্টা করলেও আপনি তার মত পাল্টাতে পারবেন না।

এই প্রসঙ্গে আমি কোন নিউচুয়াল বীমা প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে পারি। এই প্রতিষ্ঠান তাদের বিক্রয় প্রতিনিধির জন্যে একটি আপ্তবাক্য লিখে রেখেছিলেন। তা হলো, কখনো কারো সাথে তর্ক করবেন না।

যিনি নিজেকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাঁর জীবনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো, কারো সাথে তর্ক না করা।

তিনি তর্কের মতো কোনো পরিবেশের সৃষ্টি করবেন না। তর্ক করে কারোর মন বদলানো যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কয়েকবছর আগে এক আহিরিশ ভদ্রলোক আমার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর নাম প্যাট্রিক জে ওহেয়ার। লেখা পড়াতে প্যাট্রিকের বিশেষ কোনো মন ছিল না। তবে যে কোনো বিষয় নিয়ে তিনি অনায়াসে তর্ক করতে ভালোবাসতেন।

একসময় তিনি সোফেয়ারের কাজ করতেন। তিনি আমার কাছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি কিছু ট্রাক বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। কথায় কথায় প্রকাশ হলো, ট্রাক বিক্রি করতে গিয়ে তিনি অনভিপ্রেত কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। মাঝে মধ্যেই তর্কে মেতে ওঠেন। সকলকেই তাঁর শত্রু বানিয়ে ফেলেছিলেন। যদি কেউ তাঁর বিক্রি করা ট্রাকের কোনো নিন্দে করতেন, তাহলে উনি ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। হয়তো গলা টিপতে বাকি রাখতেন।

উনি বারবার আমাকে ওনার এই মনোভাবের কথা বলেছেন। বলেছেন কিছুদিনের মধ্যেই ঐ কাজটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাহাতক আর সকলের সঙ্গে তর্ক ঝগড়া, মারামারি করা যেতে পারে।

আমি প্যাট্রিকের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, কি করে তাঁর মনটাকে পরিবর্তিত করবো?

এখন উনি নিউইয়র্কের হোয়াইট মোটর কোম্পানীর একজন সেরা বিক্রয় প্রতিনিধি। কি করে ওনার মনের এই পরিবর্তন হলো?

আসুন, আমরা মি. ওহেয়ার আর-এর কথাতেই সেটা শুনে নি।

...আমি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শুনি, সাদা ট্রাকগুলো একটুও ভালো নয়। বিশ পয়সায় দিলেও নেবো না। আমি অমুক কোম্পানীর লরী কিনবো।

আমি তার জবাবে কী বলি? ভাই একটু শুনুন। ঐ ট্রাক সত্যি ভালো। ওটা কিনলে আপনি ভুল করবেন না। ঐ কোম্পানীর লোকেরাও চমৎকার। সুভদ্র স্বভাবের।

যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে তর্ক করার মনোভাব নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একেবারে বোবা হয়ে যেতেন। তর্ক করার মতো কোনো অস্ত্র তাঁর হাতে থাকতো না। যে কোম্পানীর ট্রাককে তিনি সেরা বলছেন, সেটাই সমর্থন করলাম। তাহলে আর তর্ক হবে কী করে? আমি অপরের জিনিসকেই তো সেরা বলছি।

আগে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটতো না। চট করে আমি ক্ষেপে উঠতাম। তর্ক জুড়ে দিতাম। অন্য কোম্পানীর নিন্দা করতাম। আমার কোম্পানীর প্রশংসা কম করতাম।

এখন নিজেকে কেমন যেন বোকা বলে মনে হয়। তর্ক করতে গিয়ে জীবনের কতগুলো বছর অপব্যয় করেছি। এখন আমি মুখ বন্ধ রাখি। তাতে আশ্চর্য কাজ হয়।

বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, যাঁকে জ্ঞানী বুড়ো বলা হতো, তিনি একবার বলেছিলেন —প্রতিবাদ, তর্ক ইত্যাদি করলে তাৎক্ষণিক জয় হয়। কিন্তু সেই জয় বিরাট শূন্যতায় ভরা। তাতে অপরের হৃদয় কখনো পাওয়া যায় না।

অতএব আসুন, আমরা একটা সহজ সরল হিসাব করি। আপনি কি তাৎক্ষণিক জয় করায়ত্ত করতে চাইছেন? নাকি চাইছেন একটি দীর্ঘস্থায়ী জয়?

নিশ্চয়ই আপনি বলবেন, আমি দীর্ঘস্থায়ী জয়কেই মুঠোবন্দী করতে চাইছি।

বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্টে একবার একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির মর্মার্থ হলো এইরকম —এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন উইলিয়াম জে। যিনি তাঁর পথ চলার অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে মারা যান। তিনি নির্ভুল কাজ করেছিলেন। মৃত্যুর মতোই নির্ভুল। তবুও তিনি মৃত। যেন ভুল করেই মারা গিয়েছিল।

তর্কের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। হয়তো আপনি সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত আপনার কি লাভ হয়েছে? আপনি কি শত্রুপক্ষের হৃদয় জয় করতে পেরেছেন? তা কখনো সম্ভব নয়। যে কাজ করা সম্ভব নয়, সেই কাজ থেকে বিরত থাকাই উচিত তাই নয় কি?

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের অর্থ সচিব উইলিয়াম জি ম্যাকাডু দীর্ঘদিন ধরে সংসদীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন— আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, রাজনীতিতে তর্কের কোনো স্থান নেই। আমরা কোনো ভাবেই তর্ক করে বিরুদ্ধ মতবাদীদের পরাস্ত করতে পারবো।

খুব নরম করে মি. ম্যাকাডু বলেছেন —বুদ্ধিমান অথবা বোকা, যেই হোক না কেন, তর্ক করে কাউকেই হারানো যায় না।

ফেড্রারিক এস পারসন ছিলেন আয়করের এক অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি একঘণ্টা ধরে সরকারী পরিদর্শকের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। না হাজার ডলার এতে জড়িত ছিল। মি. পারসন বারবার বোঝাতে চাইছিলেন, যে টাকাটা আমি পাইনি, কোনোদিন পাব না, তার জন্যে কেন ন হাজার ডলার করে হিসাবে জমা দেবো?

পরিদর্শকও তর্ক জুড়ে ছিলেন। তিনি বললেন —কিছুতেই হবে না। এই টাকা আপনাকে দিতেই হবে।

মি. পারসন একবার স্মৃতি চারণ করে ঐ ঘটনাটার কথা আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভদ্রলোক খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মেজাজটা ছিল খুবই

কড়া। তাই যুক্তির ব্যাপারে যতই আমি নিত্য নতুন তথ্য খাড়া করার চেষ্টা করলাম, উনি ততই একগুঁয়ে হয়ে উঠলেন। আমি ঠিক করলাম বিষয়বস্তুর পরিবর্তন সাধন করে ওনাকে বশে আনতে হবে।

তাই আমি বললাম— আমরা একটা তুচ্ছ ব্যাপারে তর্ক করছি। আপনার অনেক জরুরী কাজ আছে। সে কাজগুলো খুব কঠিন। করের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছি। অনেক বই পড়েছি। আপনি সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানেন। আমার মনে হয়, আমি যদি আপনার মতো ব্যবহারিক কাজে হাত পাকাতে পারতাম, তাহলে আমার বিচার বুদ্ধিটা আরো পরিষ্কার হতো।

আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিলাম।

এর কী ফল হলো বলুন তো? আমি দেখলাম, পরিদর্শক তাঁর চেয়ারে সোজা হয়ে বসেছেন। তিনি ঝুঁকে পড়ে তাঁর কাজ সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা শোনালেন। এতে কতরকম জালিয়াতি, জুয়াচুরি হয়ে থাকে সেকথাও বললেন। তাঁর গলার স্বর বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে এলো, তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের কথা বললেন। যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন, আমার সমস্যা নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন। কয়েকদিন বাদে আমাকে এ বিষয়ে একটি চিঠি লিখে পাঠাবেন।

কয়েকদিন বাদে তাঁর চিঠিখানা আমার হাতে এসে পৌঁছালো। তিনি আমার আয়করের রিটার্নটা মেনে নিয়েছেন।

এই আয়কর পরিদর্শক যা করেছেন, সাধারণ মানুষ তাই করে থাকেন। তিনি চাইছিলেন নিজের গুরুত্ব বোঝাতে। যতক্ষণ মি. পারসন তর্ক করেছেন, ততক্ষণ তিনি বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যখনই তাঁর গুরুত্ব মেনে নেওয়া হলো, তর্ক শেষ হয়ে গেল, তিনি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি মি. পারসনের সমস্ত দাবী মেনে নিলেন। তাহলেই দেখলেন তো, সামান্য একটু বুদ্ধি করে পারসন কীভাবে অতগুলো টাকা বাঁচিয়ে ফেললেন।

এবার আমরা সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রধান ভৃত্য কনস্টান্টের কথা বলবো। তার একটা অদ্ভুত সখ ছিল। সে প্রায়ই নেপোলিয়ানের পত্নী জোসেফাইনের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলতো। পরবর্তীকালে কনস্ট্যান্ট নেপোলিয়ানের একটি ব্যক্তিগত জীবনী লিখেছিল। সেই জীবনী গ্রন্থের পাতায় পাতায় তার এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলা আছে, যা পড়লে এখনো আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।

এই বইতে কনস্ট্যান্ট স্বীকার করেছে, সে ইচ্ছে করেই বিলিয়ার্ড খেলাতে জোসেফাইনের কাছে হার স্বীকার করতো আর তাতেই জোসেফাইন দারুণ আনন্দ পেতেন।

কনস্ট্যান্টের কাছ থেকে আমরা কি একটা শিক্ষা নিতে পারি না? আমাদের ক্লায়েন্ট প্রেয়সী, স্বামী আর স্ত্রীদের কাছে থেকে এবার ছোটো খাটো সমস্ত বিষয়ে ইচ্ছে করেই হার স্বীকার করবে।

গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন ঘৃণাকে কখনো ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না। ভালোবাসার মাধ্যমেই আমরা ঘৃণাকে জয় করতে পারি।

একইভাবে আমরা বলতে পারি, কোনো ভুল বোঝাবুঝি তর্কের মাধ্যমে শেষ হতে পারে না। কূটনীতির মাধ্যমে আমরা তার অবসান ঘটাতে পারি। আলোচনার সময় সমমর্মিতার ভাব প্রকাশ করতে হবে। সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যে কোনো সমস্যাকে সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে তা অনেক সহজ সরল হয়ে যায়।

লিঙ্কন একবার এক তরুণ সামরিক অফিসারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেই অফিসারের দোষ ছিল, উনি সহকর্মীদের সঙ্গে সবসময় তর্ক করতেন। লিঙ্কন বলেছিলেন— যে মানুষ

নিজের উন্নতির চেষ্টা করতে চায়, সে কখনো কারো সাথে ঝগড়া করার মতো সময় পায় না। আর, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, সে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। কোনো পাগলা কুকুরের কামড় খাওয়ার চাইতে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কেননা কুকুরটাকে মেরে ফেললে তার কামড় তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

অতএব, নীচের এই নীতিটাকে আমরা সবাই মনে রাখবো —তর্কে জেতার সব থেকে বড়ো উপায় হলো তর্কে অবতীর্ণ না হওয়া।

এগারো

কীভাবে আমরা শত্রুতাকে এড়িয়ে যাবো

থিওডোর রুজভেল্ট তখন হোয়াইট হাউসে ছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিরাজ করছিলেন। তিনি একটি অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় স্বীকার করেছিলেন যদি তিনি আরাধ্য কাজের পঁচাত্তর ভাগ শেষ করতে পারেন—। তাহলেই আশাতীত কিছু করেছেন বলে মনে করবেন।

থিওডোর রুজভেল্টকে অনেকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আখ্যা দিয়েছেন। তিনি যখন পঁচাত্তর শতাংশ সফলতার আকাঙ্ক্ষী, তখন আপনার আমার ক্ষেত্রে এই শতাংশটা কত হবে?

আপনি যদি একশো বারের মধ্যে পঞ্চান্নবার ভুল না করে ঠিক করতে পারেন, তাহলে কী হবে? তাহলে আপনি ওয়ার্ল্ড স্ট্রীটে গিয়ে প্রত্যেক দিন দশলক্ষ ডলার আয় করতে পারবেন। সঙ্গে একটা প্রমোদ তরী কিনতে পারবেন। বিশ্ববিখ্যাত এক গায়িকাকে অনায়াসেই আপনার সহধর্মিণী হিসাবে বরণ করতে পারবেন।

আর, পঞ্চান্নবার ঠিক হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে কী হবে? তাহলে কি অন্যের ছিদ্র খুঁজবেন? অন্যেরা ভুল করেছে বলে তাকে আঘাত করবেন?

যে কোনো মানুষের গলার স্বর, কথা বলার ধরন, অঙ্গভঙ্গী দেখে আপনি চট করে বলতে পারবেন, সে ভুল করছে কিনা। ব্যাপারটা যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আপনার উচিত একজন সৎ সহকর্মী হিসাবে তখনই ঐ ভুলের অবসান ঘটানো।

কিন্তু, যদি তার ভুল আপনি ধরিয়ে দেন, তাহলে সেই লোকটি কী চাইবে? সে কি আপনার মত মেনে নেবে?

কখনোই সে তা করবে না। কেননা, তাকে আপনি সরাসরি আঘাত করেছেন। তার আকাশচুম্বী আত্মঅহমিকাকে মাটির ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। তার আত্মসম্মানকে নানাভাবে জর্জরিত করেছেন। সে হয়তো এখনকার মতো আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেবে। কিন্তু মনের মধ্যে সে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সে সুযোগ খুঁজবে। কীভাবে আপনাকে প্রত্যাঘাত করা যেতে পারে, সেই অপেক্ষাতে বসে থাকবে।

এরপর আপনি তাকে ইম্যানুয়েল কান্ট অথবা অন্য কোনো জগত বিখ্যাত দার্শনিকের তত্ত্বকথা শোনাতে পারেন। তবে তাতে তার চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। তার মত বদলাবে না। যেহেতু আপনি তার অনুভূতিকে আঘাত করেছেন তাই তার চোখে চিরদিনই আপনি একজন শত্রু হিসাবে বিরাজ করবেন।

কখনোই এভাবে এটা শুরু করতে চাইবেন না —এ ব্যাপারটা আমি আপনাকে প্রমাণ

করে দেখিয়ে দেবো।

এটা অত্যন্ত খারাপ।

অথবা এভাবে বলবেন না —দেখুন, আপনার থেকে আমার ঘটে অনেক বেশি বুদ্ধি আছে। যদি আপনাকে আমি কিছু জ্ঞান দিই, তাহলে হয়তো আপনার মত পাল্টে যাবে। এতে শেষ পর্যন্ত আপনার উপকারই হবে।

এটা অনেকটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করার মতো। এখানে অকারণে বিরোধিতা জাগিয়ে তোলা হয়। আর আপনার শ্রোতা লড়াইতে নেমে পড়তে চায়।

সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? আপনি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চান, তাহলে সেটা জানতে দেবেন না। আচরণের মধ্যে গোপন রাখবেন। এমন কৌশলে তার মত পালটাবার চেষ্টা করবেন সে যেন সেটা বুঝতে না পারে।

এক্ষেত্রে আমরা নীচের এই উদ্ধৃতিটা লক্ষ্য করতে পারি —পারলে অন্য কারোর চেয়ে জ্ঞানী হও, কিন্তু, সেকথা তাকে কখনো বলো না।

এটি আমার কথা নয়। লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন। মানুষকে এমনভাবে শেখাতে হবে, কোনো ভাবেই সে যেন আপনার এই চালাকিটা ধরে ফেলতে না পারে।

কুড়ি বছর আগে আমি যা বিশ্বাস করতাম, পরবর্তীকালে সেই বিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙে যেতে পারে। হয়তো আমি ভাবতাম, অঙ্কই হলো এই পৃথিবীর আসল নির্যাস। যখন আইনস্টাইনের লেখা প্রথম পড়ি, তখন সেটা আমার বিশ্বাস হতো না। কুড়ি বছর পরে এই বইটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনি হয়তো বিশ্বাস পোষন করবেন।

আগে যে সমস্ত ব্যাপারে আমি একশো ভাগ নিশ্চিন্ত ছিলাম এখন আর ততটা হতে পারি না।

একবার সক্রেটিস এথেন্সে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন —আমি একটা ব্যাপার জানি, সেটা হলো, আমি নিজেই কিছুই জানি না।

যাই হোক, আমি নিজেকে কখনো সক্রেটিসের থেকে বেশী বুদ্ধিমান বলে ভাবি না। কখনোই কোনো মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই না, সে ভুল করেছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে শেষ পর্যন্ত ভালো জিনিসই হয়।

কোনো মানুষ কোনো কথা বললে যদি সেটি আপনার কাছে অসত্য বলে মনে হয়, যদি মনে হয়, তার মধ্যে অজস্র ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তাহলেও তাকে সরাসরি মুখের ওপর আঘাত করবেন না।

আপনি হয়তো এইভাবে শোধরাবার চেষ্টা করতে পারেন —হ্যাঁ, একবার শুনুন। আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়েছিল। তবে আমার ভুলও হতে পারে। প্রায়শঃই আমার ভুল হয়। কিন্তু আমার ভুল হলে আমি কী করি বলুন তো? আমার ঐ ভুলটা শুধরে নেবার চেষ্টা করি। দেখা যাক, আপনার বক্তব্যের মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা। যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, আপনি কী আমাকে সেটা শুধরাবার সুযোগ দেবেন?

এই যে আপনি বারবার দোষ স্বীকার করলেন, অর্থাৎ কথায় কথায় বললেন যে আপনারও ভুল হয়, আপনারও প্রায় ভুল হতে পারে, এই শব্দবাক্যগুলি বিদ্যুতের মতো কাজ করলো। এইসব কথার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট যাদু লুকোনো থাকে। যাকে উদ্দেশ্য করে আপনি এইসব শব্দ প্রয়োগ করলেন, সে তখন আর তর্ক করতে পারবে না।

স্বর্গ-মর্ত্য বা পাতাল —যে কোনো জায়গাতেই এর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো মানুষ পাওয়া যাবে না। আপনি যা চাইছেন, তাই করায়ত্ত করতে পারবেন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

এবার একজন বিজ্ঞানীর কথা বলা যাক। আমি এবার, স্টেফানসনের সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম। তিনি হলেন বিখ্যাত আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিক। মেরু অঞ্চলে তিনি প্রায় এগারো বছর কাটিয়েছিলেন। তখন দু বছর মাংস আর জল ছাড়া কিছুই খাননি।

আমি তাঁর করা একটা পরীক্ষার বিষয়ে কথা বলেছিলাম, আমি জানতে চেয়েছিলাম, ঐ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি কী প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।

স্টেফানসন যা বলেছিলেন—সেই শব্দগুলো আমি এখনো ভুলতে পারি নি। ভবিষ্যতে হয়তো পারবো না।

তিনি বলেছিলেন— কোনো বিজ্ঞানী কখনো কিছু প্রমাণ করতে চান না। তিনি কেবল আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করার চেষ্টাই করতে থাকেন।

আপনি কি আপনার চিন্তাধারার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাববোধের স্ফুরণ ঘটাতে চান? ঠিক আছে, এটা বেশ ভালো ধ্যান-ধারণা। কিন্তু যদি আপনি কোনো বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান সম্মত ভাবে চিন্তা করতে না পারেন, সেই দোষ কিন্তু আপনার ওপরেই বর্তাবে।

আপনারও যে ভুল হতে পারে, একথাটা আগেই স্বীকার করে নিলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। এরকমটি করলে তর্কের অবসান হয়ে যায়। অপরকে আপনি সহজেই অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। আপনি যে ধরনের প্রগতিশীল মানুষ, আপনার শ্রোতাও তেমনটি হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর ফলে নিজের জীবনের ভুল ত্রুটিগুলিও সে স্বীকার করবে।

যখন আপনি জানেন, একজন মানুষ ভুল করছে, তখন কি তার মুখের ওপর এই কথাটি বলা উচিত? তাহলে এর কি কুপ্রভাব হবে।

এখানে একটা নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলা যাক। মি. এস., তাঁর পুরো নামটা আমি বলছি না, তিনি নিউইয়র্কের এক তরুণ অ্যাটর্নি। একবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ মামলাতে অংশ নিয়েছিলেন। বিষয়টার সাথে অনেক টাকা এবং অনেক মানুষের মানসম্মান জড়িত ছিল। তার সাথে ছিল আইনের ধারা-উপধারা গুলির সূক্ষ্ম প্রয়োগ।

যখন বিতর্ক চলছিল, সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি এগিয়ে এলেন। তিনি মি. এসকে বিশেষ একটি আইনের ধারা ছ'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা মনে করিয়ে দিলেন।

মি. এস একটু থমকে বিচারপতির দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ মুখের ওপর বললেন —হুজুর, এইরকম কোনো আইন তো নেই। হয়তো আপনার ভুল হচ্ছে।

পরবর্তীকালে মি. এস আমার একটি ক্লাসে বলেছিলেন —আমার কথায় সমস্ত ঘরে স্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হচ্ছিল, তাপমাত্রা যেন শূন্য ডিগ্রিতে নেমে গেছে। আমার কথাই ঠিক ছিল। বিচারপতি ভুল বলেছিলেন। আমি সেই ভুলটা তাঁকে ঠিক সময়ে ধরিয়ে দিয়েছিলাম।

এতে কী হয়েছিল? তিনি কি আমার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন? তা কিন্তু হয়নি। তবে, আমি এখনো বিশ্বাস করি, আইনটা আমার পক্ষেই ছিল। আর আমি একথাও জানি, সেদিন বিতর্কে অংশ নিয়ে যেভাবে কথা বলেছিলাম, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তা করতে পারিনি, তা সত্ত্বেও আমি সে মামলাতে জিততে পারিনি। আমি একটা দারুণ ভুল করে বসেছিলাম। একজন শিক্ষিত এবং জ্ঞানী বিচারপতির মুখের ওপর তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারি, আমার পরিশীলিত এবং প্রাজ্ঞ মনোভাব আমাকে শিখিয়েছে, এমনটি করা আমার কখনোই উচিত হয়নি, আমার উচিত ছিল সে করেই হোক বিচারপতির সাথে আপোষ সূত্র রচনা করা। ঐ মামলায় জিতে আমার মক্কেলের মান এবং টাকা বাঁচানো।

খুব অল্প সংখ্যক মানুষই যুক্তির ধার ধারে। আমরা বেশীর ভাগই একচোখো এবং একপেশে ধরনের হয়ে থাকি। আমরা আগে থেকেই একটা কল্পিত ধারণা করে নিই। সেটার মধ্যে ঈর্ষা, সন্দেহ, ভীতি, হিংসা আর অহমিকা বোধের প্রচ্ছন্ন প্রকাশ থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের ধর্ম, চুলের ছাঁট, সমাজতন্ত্রবাদ বা ক্রাগ সম্পর্কে ধারণাকে বদলাতে চাই না। এক্ষেত্রে কেউ যদি আমার সামনে বিতর্কের ঝড় তোলে, তাহলে সেই লোকটির প্রতি আমি অকারণে সন্দেহ পোষণ করি। আমি ভাবিইনি কোথা থেকে এলেন, আমার আজন্মের সংস্কারকে এভাবে আঘাত করতে?

তাহলে? এখন আপনি অসহায়। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, কীভাবে আমি একটি মানুষকে ত্রুটিমুক্ত করবো। আসুন নীচের অংশটি দয়া করে প্রতিদিন সকালে একবার করে পড়ুন। এটি প্রফেসার জেমস হার্ভে রবিনসনের আলোচিত একটি বইয়ের অংশ। বইটির নাম দি মাইন্ড ইন দ্য মেকিং।

আমরা মাঝে মাঝে কোনোরকম বাধা বা আবেগ ছাড়াই আমাদের মন বদলে ফেলি। কিন্তু যদি আমাদের ভুল দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় আমরা ভুল করছি, তাহলে আমাদের হৃদয় বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠার ব্যাপারে আমরা অবিশ্বাস্য রকম অমনোযোগী থেকে যাই। আবার, যদি কেউ সেই বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত করে তাহলে আমরা নিরন্তর প্রয়াসে সেই আঘাতকে রুখে দিতে চাই। এটি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তবে এই ধারণাগুলো কোনোভাবেই আমাদের আপনার একান্ত নয়। এখানে আর একটি আবেগের কথা বলতে হবে। সেটি হলো অহংবাদ। অহম বোধকে কখনোই বেশি জায়গা দেওয়া উচিত নয়।

আমার —ছোট্ট এই শব্দের মধ্যে মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে আছে। এর ভেতর উপলব্ধি এবং প্রাজ্ঞতা মিলেমিশে গেছে। এটি ধীরে ধীরে আমি থেকে বহুত্বে পর্যবসিত হয়। আমার বাড়ি, আমার নাম, আমার গাড়ি, আমার গয়না, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার কুকুর, আমার দেশ, আমার ভগবান —যাই বলি না কেন আমরা, আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমিত্ব কেমন ভাবে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করছে।

এর আর একটি রহস্য আছে। পৃথিবীর জানা বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস বা ধারণা নিয়ে কেউ আপত্তি তুললে আমার সঙ্গে সঙ্গে রেগে যাই। অথবা আমাদের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে বিশ্বাসকে নিয়ে পথ চলতে শিখেছি, সেই বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়েও থাকে, তবুও তার মূলে কুঠারাঘাত করলে আমাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আমরা চাই, চিরদিনই এই বিশ্বাসকে পাথেয় করে আমাদের জীবন পথের পথিক হবো। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। এ বিষয়ে কেউ সামান্যতম উষ্মা প্রকাশ করলে আমরা রেগে যাই। আমরা যুক্তিবোধের মধ্যে আমাদের কথার প্রমাণ খুঁজে বেড়াই। মিথ্যে অহমিকাবোধকে অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরি।

এবার আমি আর একটি গল্প বলি। গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা। একবার আমি একজন আর্ট ডিরেক্টারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি মানুষের ঘর সাজানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁকে ইন্টারনাল ডিজাইনার বলা যেতে পারে। তিনি আমার ফ্ল্যাটটা ভালো ভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। যখন বিল পেলাম, তখন আমার দুটি চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

ক'দিন বাদে আমার এক বন্ধু এসে সব দেখে গেলেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে কত খরচ হয়েছে জানতে চাইলেন। আমি সব কথা বলে দিলাম। তিনি আঁতকে উঠে বললেন, ও কি! এ যে সাংঘাতিক! আমার মনে হচ্ছে ঐ ভদ্রলোক তোমাকে বেশ ঠকিয়েছেন।

কথাটা সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি। বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু বেশীরভাগ লোক লজ্জার ভয়ে সত্যি কথাটা স্বীকার করতে চায় না। নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় যেটাকে সত্যি বলে আমার মনে হয়, সেটি সকলের সামনে বলে দেওয়া উচিত।

আমিও তখন নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম।

আমি বলেছিলাম —বন্ধু, সবসেরা জিনিস সব থেকে সস্তায় কখনো মেলে না। আর, কেউ কেউ ঘর সাজানোর জন্যে অতিরিক্ত খরচ করতেই পারে, তাতে তোমার দুঃখের কী কারণ হলো?

মনে মনে তখন কিন্তু আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। যে টাকা হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে, সেটা তো আর আমার পাশে ফিরে আসবে না।

পরের দিন আর একজন বন্ধু এলেন। তিনি আমার ফ্ল্যাট দেখে খুবই খুশী হলেন। মনের খুশীর আবেগ তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন —মনে হচ্ছে, আমাকেও ঐ লোকটির সাহায্য নিতে হবে।

এবার আমার প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। আমি ভাবলাম, তার মানে? আমি যে খরচটা করেছি, সেটা কি যুক্তিযুক্ত হয়নি? বড্ড বেশী খরচ করে ফেলেছি নাকি? আরো কিছু জিনিস কিনবো কিনা ভাবতে ভাবতে সময়টা চলে গেল।

আমরা যখন ভুল করি, সেগুলো নিজেদের কাছে স্বীকার করা উচিত। আমরা কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হই। হয়তো নিজেদের বিবেকের কাছে হাঁটু গেড়ে সবকিছু স্বীকার করলে মনটা পরিষ্কার হয়ে যায়। শরীরের ভেতরের এই তীব্র অনুভূতির বিস্ফোরণ না ঘটলে মনটা অকারণে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

গৃহযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার বিখ্যাত সম্পাদক হোরেস গ্রীলে ছিলেন লিঙ্কনের নীতির বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন ঠাট্টা, তামাশা এবং তর্কের মধ্যে দিয়েই তিনি লিঙ্কনের মত পরিবর্তন করতে পারবেন। তিনি মাসের পর মাস, এবং বছরের পর বছর ধরে এই প্রয়াস চালিয়েছিলেন। যে রাতে বুথ লিঙ্কনকে গুলি করে হত্যা করেন, সেদিনও তিনি তাঁর কাগজে লিঙ্কনকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। ব্যাঙ্গাত্মক শব্দের মাধ্যমে লিঙ্কনের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই তিক্ততার ফল কী হয়েছিল? মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত কি লিঙ্কন গ্রীলের সাথে একমত হয়েছিলেন? কখনোই নয়। বরং নিজের সম্পর্কে এইসব লেখাগুলি পড়তে পড়তে লিঙ্কনের মন আরো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর প্রদর্শিত পথ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না, এমন একটি কঠিন কঠোর মতবাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

মানুষকে নিয়ে চলার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় আমাদের মনে রাখতেই হবে। যদি কেউ নিজেকে চালনা করতে এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী তাঁর অবশ্যই পাঠ করা উচিত। আমার মনে হয়, এতো খোলাখুলি ভাবে কেউ তার ফেলে আসা জীবনের ওপর আলোকপাত করতে পারেননি। এটিকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে বিবেচনা করে থাকি।

ফ্রাঙ্কলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, কীভাবে তিনি বিরক্তিকর কয়েকটি অভ্যেসকে ত্যাগ করেছিলেন। কীভাবে তিনি নিজেকে আমেরিকার ইতিহাসের অতি ভদ্র, শান্ত এবং কূটনীতি সম্পন্ন এক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

একদিন, সে সময়ে, ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন এক উড়নচণ্ডী যুবক। তিনি মাঝে মধ্যেই একটি আলোচনা সভাতে যেতেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু তাঁকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে কতগুলো সত্যি কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

কথাগুলো ছিল এইরকম —তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি সকলের সাথে বৃথা তর্ক যুদ্ধে লেগে পড়ো কেন? এই স্বভাবটাকে পাল্টে ফেলো, তোমার বন্ধুরা বেশ বুঝতে পেরেছে, তুমি না থাকলে তাদের আড্ডা আর কি গল্পের সময়টা ভালোভাবে কেটে যায়। তোমার আর কি মনে হয়, তুমি সবজান্তা? বাক্যবাগীশ? তোমার মাথায় আর কিছু ঢোকানো যাবে না। বাস্তবিক তোমাকে বোঝাতে গেলে উল্টে গোলমালের সৃষ্টি হয়। তুমি যা সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছো, তাই নিয়ে এগিয়ে যাও। তাছাড়া তুমি তো এখনো কিছুই শিখতে পারোনি। তোমাকে দেখলে আমাদের দয়া আর করুণা হয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কী করলেন? আগে হলে তিনি হয়তো চীৎকার করে এইসব কথার বিরুদ্ধচারণ করতেন। তিনি কিন্তু বুঝতে পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্যে বন্ধু যে কটুব্যাক্যগুলি প্রয়োগ করেছে, সেখানে সে কখনোই সত্যের অপলাপ করেনি।

এবার তিনি নিজেকে পাল্টালেন। তিনি বুঝলেন এভাবে দিন কাটালে ভবিষ্যত অন্ধকার। সময় মতো নিজেকে সংশোধন করতে না পারলে পরে অনেক অসুবিধার সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি উদ্ধত ধরনটাকে একেবারে বদলে ফেললেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লিখেছেন —আমি নিয়ম করে ফেললাম, কখনো অন্যের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়বো না। নিজের মতামত জাহির করার চেষ্টা করবো না। তাছাড়া এমন কোনো কথা বলবো না যাতে অন্যের মনে আঘাত লাগতে পারে।

...আমার ধারণা আমিই ভাবছি, এই ভাবে কথা বলতে শুরু করবো। কারো কথায় সরাসরি বাধা দেবো না। বাধা দিলে যদি কোনো ফল না হয়, তাহলে সেই বাধা দিয়ে লাভ কী? আমি বিনম্রতার শিক্ষাগৃহে ভর্তি হলাম। চরিত্রটাকে আরো নমনীয় করে তুললাম। সব রকম অবস্থার সাথে যাতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। তখন আমি তারই অনুশীলন শুরু করলাম। আমার ভুলের সংখ্যা অনেক কমে গেল। বন্ধুরা যারা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে এলো। তাদের সান্নিধ্যে বিকেলগুলো ভালোভাবেই কাটতে থাকলো।

...এরকম রীতিনীতি আমি আয়ত্ত করে ফেললাম। সেটা আমার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য জাপক হয়ে উঠলো। গত পঞ্চাশ বছরে কারো সাথে আমার কোনো ঝগড়া হয়নি। আমার মুখ থেকে একটিও কুবাক্য প্রকাশিত হয়নি। আর আমার এই অভ্যাসের জন্যই আমি বিপুল সংখ্যক জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলাম, পুরোনো মত বদল করাটাই উচিত। তাই আপনারাও, যদি কখনো এমন কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে যান, তাহলে আমার পথ অনুসরণ করবেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করবেন। আমি কি এটা ঠিক করেছি? আয়নার সামনে চুপটি করে বসে থাকবেন। দেখবেন আয়নাতে আপনার মুখের কি ধরনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। সেখানে রাগ, ক্রোধ, উষ্মা ইত্যাদি আবেগ বা অনুভূতির স্ফুরণ আছে কিনা। যদি থাকে, ধীরে ধীরে সেগুলি উৎপাটিত করার চেষ্টা করবেন। তবেই সফলতার চাবিকাঠি আপনার মুঠোবন্দী হবে।

বেন ফ্রাঙ্কলিনের এই কৌশলকে আমরা কীভাবে ব্যবসার কাজে লাগাতে পারি?

আসুন, এখানে দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। কীভাবে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আপনি ব্যবসার ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করতে পারবেন।

নিউইয়র্কের ১১৪, লিবার্টি স্ট্রীট। সেখানে এফ জে ম্যাহনি তেল ব্যবসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি বিক্রি করে থাকেন। তিনি লঙ আইল্যান্ডের একটি বড়ো মক্কেলের জন্যে কাজের বায়না করেছিলেন। কাজটির জন্যে একটা খসড়া দেওয়া হয়েছিল। খসড়াটা গৃহীত হয়। কাজ শুরু হয়।

তারপরেই একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। ক্রেতা ভদ্রলোক তার বন্ধুদের সঙ্গে

কাজটি নিয়ে আলোচনা করেন। বন্ধুরা তাঁকে সাবধান করে দেন, তাঁরা বলেন, তুমি একটা মারাত্মক ভুল করছো। তোমার ওপর কিছু বাজে মাল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অন্যায়, এটা ঠিক নয়।

বন্ধুদের কথায় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মি. ম্যাহনিকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, সরি মি. ম্যাহনি। যা বায়না দিয়েছি, সেটা আমি নিতে পারবো না।

মি. ম্যাহনি তখন কী করলেন? তিনি সমস্ত ব্যাপারটা সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ঐ ভদ্রলোকের বন্ধুরা ওকে ভুল বুঝিয়েছে—। তিনি লঙ আইল্যান্ডে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। তাঁর অফিসে ঢুকলেন। ভদ্রলোক ছুটে এসেছেন। তিনি এতো রেগে গেছেন যে ঘুসি পাকিয়ে মি. ম্যাহনিকে মারতে গেলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক বকাবকি করলেন ম্যাহনিকে। কথা শেষ হলো এইভাবে, বলুন এ ব্যাপারে কী করতে চাইছেন?

মি. ম্যাহনি শান্ত ভাবে বললেন —আপনি যা চাইবেন আমি তাই করবো। আপনি পয়সা দিয়ে জিনিসটা কিনছেন সুতরাং তার ভালো মন্দ সম্পর্কে সব জানবার অধিকার আপনার আছে। তা যাই হোক, কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে। যদি আপনি মনে করেন, আপনি ঠিক, তাহলে আমি কাজটা বাতিল করবো। ইতিমধ্যে আমরা দু'হাজার ডলার খরচ করে ফেলেছি। সেটা নয় আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হিসাবে ধরবো। আপনাকে খুশী করার জন্য ঐ দু'হাজার খরচ করতে আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি। তবে আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে চাই। আপনার কথামতো জিনিস তৈরি হলে সে দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আর যদি আমাদের পরিকল্পনা মতো জিনিস তৈরি হয়, তাহলে তার ত্রুটির সব দায়ভার আমরাই গ্রহণ করবো।

এই শেষের কথাগুলো ভদ্রলোককে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। তিনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন। তিনি জানলেন —ঠিক আছে, কাজ করে যান। তবে আপনাদের কাজ যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ভগবান আপনাদের সাহায্য করবেন।

ম্যাহনি বললেন —আপনি আরো দু'দুটো কাজ এবছরই আমাকে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। সেটা দেবেন তো?

ভদ্রলোক আর কিন্তু অপমান করেননি, তিনি ঘুসি উঁচিয়ে তেড়ে আসেননি। ম্যাহনির এই শান্ত স্বভাব তাঁর আবেগকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল।

এর থেকে আমরা কী বুঝতে পারছি? আমরা বুঝতে পারছি, প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করতে গেলে ধৈর্য্য এবং প্রজ্ঞা বজায় রাখতে হয়। ম্যাহনি তখন যদি তর্ক করতেন, তাহলে কী হতো? তাহলে মামলা হতো। তিক্ততার সৃষ্টি হতো। অনেক টাকা খরচ হতো। ম্যাহনি একটি ভালো মক্কেলকে হারাতেন। আপনি জেনে শুনে কী এই ভুলের ফাঁদে পা দেবেন? যদি আপনি একজন সফল সচ্ছল ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন দেখে থাকেন তাহলে কখনো এই কাজ করবেন না।

এখানে আর একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। মনে রাখবেন, আমি যেসব কথা বলছি, তা কিন্তু আমাদের জীবনে সত্যি সত্যি ঘটেছিল। এর মধ্যে গল্পের কোনো স্থান নেই।

আর ভি কাউলে ছিলেন নিউইয়র্কের বিরাট একটি কাঠের কোম্পানীর সেলসম্যান। তাকে একজন দক্ষ কাঠ পরিদর্শকের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তিনি কতগুলি অনভিপ্রেত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মধ্যেই ঐ ভদ্রলোকের সাথে কাউলের লড়াই বেঁধে যেতো, জোর তর্ক হতো। এই তর্কে কাউলে জিততেন। কিন্তু

এতে কোনো লাভ হতো না। কেননা কাঠের পরিদর্শকেরা বেসবল-এর জেলার বিচারকের মতো। তাঁদের কোনো ধারণা একবার হয়ে গেলে সেই ধারণা তাঁরা কখনো বদলাতে চান না।

মি. কাউলে একদিন বুঝতে পারলেন, এই তর্কে তিনি জয়লাভ করছেন। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত কী হচ্ছে? তার প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ডলার ক্ষতি হচ্ছে। তাই এবার তিনি ঠিক করলেন, আর আগের মতো ঝগড়াঝাটিতে যাবেন না। কাজের কৌশল পাল্টাতে হবে। এর ফল কী হলো? আসুন, আমরা আর ডি কাউলের নিজের মুখে শুনি।

...এক সকালে ঝনঝন করে আমার অফিসের টেলিফোন বেজে উঠলো। ওপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এক উত্তেজিত অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর, ঐ কণ্ঠস্বরের মালিক উষ্মা প্রকাশ করে বললেন —আমরা তাঁর কারখানায় যে একগাড়ি কাঠ পাঠিয়েছি সেগুলি একদম বাজে। তাঁর প্রতিষ্ঠান ট্রাক থেকে মাল নামানো বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা যেন এখনই চাতাল থেকে সব কাঠ সরিয়ে নিয়ে চলে যাই।

ভেবে দেখুন কী অবস্থা। ট্রাক থেকে চারভাগের একভাগ কাঠ নামানো হয়ে গেছে। তখন কাঠ পরিদর্শক জানালেন যে কাঠের মান শতকরা ৫৫ ভাগের নীচে। এই অবস্থায় তারা ঐ কাঠ নিতে পারবেন না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছে গেলাম। মনে মনে ভাবছি, কীভাবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করবো। সাধারণ অবস্থায় পড়লে আমি কাঠ বাছাই করার নিয়ম উল্লেখ করতাম। কাঠ পরিদর্শককে বোঝাতে চাইতাম, সবই ঠিক আছে। তিনি অযথা ভুল করছেন। তিনি এইভাবে আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছেন। তিনি ভুল নিয়ম প্রয়োগ করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজেকে সংশোধন করে নিলাম। আমি ভাবলাম, এখন নতুন কোনো পন্থায় পা রাখতে হবে।

আমি যখন কারখানায় পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, সেই কাঠ পরিদর্শক বেশ লড়াই-এর মেজাজে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন তখন তিনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

এবার আমি ধীরে ধীরে যে গাড়ি থেকে কাঠ নামানো হচ্ছিল সেখানে চলে গেলাম। আমি তাদের অনুরোধ করলাম। সব কাঠ নামাতে দেওয়া হোক। তাহলেই আমি ব্যাপারটা ভালো ভাবে বুঝতে পারবো। পরিদর্শককে আমি বললাম, বাতিল কাঠগুলো এক জায়গাতে এবং ভালো কাঠগুলো অন্য জায়গাতে রাখতে।

বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলাম। পরিদর্শক ভদ্রলোক ভীষণ কড়া। বাছাই করার সাধারণ নিয়মনীতিগুলি তিনি একেবারেই মানছেন না। এই কাঠগুলি ছিল বিশেষ ধরনের সাদা পাইন কাঠ। আমি এও বুঝলাম, পরিদর্শক শুধু কাঠ সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছেন। তবে সাদা কাঠের স্বভাব চরিত্র কিছুই জানেন না।

সাদা কাঠ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এটি ছিল, আমার একটি প্রিয় বিষয়।

আমি কি তাঁর সঙ্গে লড়াই করলাম? তিনি কেন সাদা কাঠগুলিকে বাতিল করছেন সে বিষয়ে জানতে চাইলাম? না, আমি মোটেই তা করিনি। আমি শুধু সব দেখতে দেখতে দুটি একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। আমি একবারও বলিনি, তিনিই ভুল করেছেন। কোন কাঠ কেন খারাপ, তাও জানতে চাইনি। আমি কেবল বোঝাতে চাইলাম, ভবিষ্যতে যখন আবার আমরা কাঠ সরবরাহ করবো, তখন যেন তাঁকে খুশী করতে পারি।

বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পথে আমাদের আলাপ আলোচনা এগিয়ে চললো। আমি সহযোগিতার ভঙ্গিতে বারবার মাফ চাইলাম। আমি বললাম —স্যার, যদি এই কাঠ আপনাদের কাজে না লাগে, তাহলে এখুনি আমি এটা সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো।

কথাবার্তার মধ্যেই ভদ্রলোককে মোলায়েম করতে পেরেছিলাম। আমাদের ভেতরের তিক্ত সম্পর্কটা অনেকটা কেটে গেল। ভদ্রলোক বুঝলেন, বাতিল কাঠগুলোর সবগুলোকে একেবারে বাতিল করা উচিত হয়নি। এর মধ্যে কিছু কিছু দামী কাঠ আছে। আমি সতর্ক ছিলাম, যাতে উনি আমার কথা বলার আসল অভিপ্রায়টা ধরতে না পারেন।

আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত ভাব ভঙ্গি পাল্টে গেল। রণং দেহী মেজাজটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি অকপটে আমার কাছে স্বীকার করলেন সাদা পাইন কাঠের চরিত্র সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। গাড়িতে তা নামানোর সময় তিনি আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন। আমি সব ব্যাখ্যা করলাম। এই ধরনের কাঠ কেন পাঠানো হয়েছে, তারও একটা যুক্তি সঙ্গত উত্তর খাড়া করলাম।

শেষ পর্যন্ত কী হলো? যখনই একটি কাঠ বাতিলের সারিতে রাখা হচ্ছিল, ভদ্রলোকের মুখে শোকাচ্ছন্ন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি নিজেকে অকারণে দোষী ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, যে ধরনের কাঠের দরকার ছিল, তারা সেই কাঠ অর্ডার দেননি। সুতরাং মাল সরবরাহকারী হিসাবে আমার কোনো দোষ নেই।

অবশেষে কী হলো? আমি বিদায় নেবার পর পরিদর্শক গাড়ি বোঝাই সব কাঠ আবার যাচাই করলেন। সবটাই নিয়ে নিলেন। আর আমি পুরো টাকার চেক পেয়ে গেলাম।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, সামান্য একটু কৌশলে কত কাজ হলো। যেহেতু আমি কখনো তাঁর ভুল ধরিয়ে দিইনি, তাঁর আকাশছোঁয়া আত্ম-অহমিকায় আঘাত করিনি, তাতেই আমি শেষ পর্যন্ত লাভ করতে পেরেছিলাম। এতে আমাদের প্রতিষ্ঠান দেড়শো ডলার লাভ করেছিল। আর লাভ করেছিল তাঁর সাথে চিরন্তন সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি।

একটা কথা বলতে চাইছি, অনেক বছর আগে যীশু বলেছিলেন —তোমার শত্রুর সঙ্গে চট করে একমত হয়ে যাও।

আপনার মক্কেল, স্বামী বা শত্রুর সাথে কখনো তর্ক করবেন না। যদি তিনি কোনো ভুল আচরণ করে থাকেন, তাহলে সাবধানে তাঁর মত পাল্টাবার চেষ্টা করবেন। কখনোই সরাসরি তাকে আঘাত করবেন না। তাঁর আত্মগর্বী মনোভাবকে মাটিতে লুটিয়ে দেবেন না। দেখবেন, এই কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে আপনি কতখানি লাভবান হচ্ছেন।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বাইশশো বছর আগে মিশরের বৃদ্ধ রাজা আখোটি তাঁর ছেলেকে কিছু সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ পরিবর্তিত পৃথিবীর পটভূমিতে সেই উপদেশগুলিকে সোনার অক্ষরে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। চার হাজার বছর আগে বৃদ্ধ রাজা আখোটি মদ পান করার ফাঁকে তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন —কৌশলী হও। এতে তোমার সুবিধে হবে।

অতএব, অন্যকে নিজের মতে নিয়ে আসার দু'নম্বর নিয়মটি হলো —অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। কখনো ভুলেও বলবেন না, সে ভুল করছে।

বারো

যদি কখনো ভুল করে থাকেন তাহলে অকপটে তা স্বীকার করবেন!

এবার আমরা মানুষের স্বভাব চরিত্রের একটি স্পর্শকাতর দিকের ওপর পা ফেলতে চলেছি। এই জীবনে আমরা কখনো সখনো ভুল করে থাকি। যদি আমরা যথাসময়ে তা

স্বীকার না করি তাহলে সেই ভুল মারাত্মক হয়ে ওঠে।

আমাদের চরিত্রকে একে রবারের মতো কমনীয় রাখতে হবে। পাইন গাছের মতো তা উদার হবে। বাতাসের মতো বেগবান, তবেই আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো।

আমি বৃহত্তর নিউইয়র্কের প্রায় মাঝখানটাতেই থাকি। আমার বাড়ির এক মিনিট হাঁটাপথের দূরত্বে ভারি চমৎকার জঙ্গল আছে।

বসন্তকালে সেখানে প্রকৃতি অপরূপা হয়ে ওঠে। জাম গাছে ফল ধরে। কাঠ-বেড়ালিরা এখানে-সেখানে বাসা বেঁধে বাচ্চাদের নিয়ে খেলা দেখে। ঘোড়ার মাথার সমান উঁচু দীর্ঘ ঘাস জন্মায়।

এই সুন্দর অকলঙ্কিত একখণ্ড বনের নাম দেওয়া হয়েছে ফরেস্ট পার্ক। সত্যি সত্যি সেটা তার সমস্ত জঙ্গী দস্যিপনা নিয়ে ইট, কাঠ, পাথরের নগরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

কলম্বাস যেদিন বিকেলে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তখন এই জঙ্গলটি যেমন ছিল, অস্পর্শিত এবং অনাঘ্রাত—এখনো তেমনটিই রয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই আমি বৈকালিক অবসরে ঐ জঙ্গলে বেড়াতে যাই। আমার সঙ্গী থাকে ছোট্ট বুলডগ রেক্স। রেক্স খুব নিরীহ ধরনের হাউন্ড কুকুর। তাই তাকে আমি শেকলে বেঁধে নিয়ে যাই না। কেননা, ওখানে কারো সাথে দেখা হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

একদিন আমার বরাত খারাপ। পার্কে দেখা হয়ে গেল ঘোড় সওয়ার এক পুলিশের সঙ্গে। পুলিশ ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্তৃত্ব দেখাতে তৎপর হয়ে উঠলেন।

তিনি আমাকে বেশ ধমকের সুরে বললেন —এ কী? আপনি এভাবে কুকুরের শেকল খুলে তাকে পার্কে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? জানেন, আপনি একটা বেআইনী কাজ করেছেন।

আমি নম্রভাবে বললাম —হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু আমার কুকুর তো কারো ক্ষতি করে নি, তাই।

—আপনি কী ভাবছেন? আপনি কী জানেন তাই নিয়ে আইন মাথা ঘামাতে চায় না। কুকুরটা হঠাৎ কোনো কাঠ বেড়ালীকে মেরে ফেলতে পারে। কোনো বাচ্চা ছেলেকে কামড়াতে পারে। সে যাই হোক, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ভদ্রবংশের সন্তান। সম্ভ্রান্ত পরিবারের। এবার আপনাকে ছেড়ে দিলাম ভবিষ্যতে যদি আপনি আপনার কুকুরকে শেকল না বেঁধে এখানে নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। জজের কাছে গিয়ে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে।

আমি ভীরু গলায় বললাম —স্যার। এবারের মতো মাফ করে দিন। ভবিষ্যতে আমি কখনো আপনার আদেশ অমান্য করবো না।

তাঁর আদেশ আমি তামিল করেছিলাম। এরপর যখনই ঐ জঙ্গলে বেড়াতে যেতাম, অনিচ্ছুক রেক্সের গলায় শেকল পরিয়ে দিতাম। সে গরর গরর শব্দ করে তার অনিচ্ছা প্রকাশ করতো। শেষ পর্যন্ত সেও আমাকে শান্তভাবে অনুসরণ করতো।

এবার, আবার রেক্সকে শেকল খুলে সেখানে নিয়ে গেলাম। কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন আবার ফাঁদে পড়ে গেলাম। সেদিন বিকেলবেলা, পাহাড়ের কোলে ঐ আইন রক্ষক ভদ্রলোকের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তিনি ঘোড়ার পিঠে ছিলেন। রেক্স খোলা অবস্থায় সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুণছি। আমি বুঝতে পারছি এখনই একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। পুলিশকে আর কথা বলার সুযোগ আমি দিলাম না। আমি নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে জবাবদিহি করতে শুরু করলাম।

আমি বললাম —অফিসার, আপনি আমাকে হাতে নাতে ধরেছেন। আমি দোষী। আমার কোনো অজুহাত নেই। কোনো ওজর আপত্তি আমি দেখাতে চাইবো না। আপনি আমাকে এক সপ্তাহ আগে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আপনি বারবার করে বলেছিলেন, আমি যেন ভবিষ্যতে রেক্সকে শেকল বাধা অবস্থায় এই জঙ্গলে নিয়ে আসি। তা না হলে আপনি আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

পুলিশ কর্তাটি হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন। তাঁর ঔদ্ধত্যের পরিচয় কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তিনি বললেন —ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি, এই ছোট্ট নরম তুলতুলে কুকুরটিকে শেকল বেঁধে রাখলে মন খারাপ হয়ে যায়। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না, তখন এমনটি করতে ইচ্ছে হয়, তাই নয় কি?

আমি বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোক এবার আমার কথার ফাঁদে পা দিয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি বিচক্ষণ মানুষ। এ লোভ সামলানো যায় না। তবুও একজন সৎ নাগরিক হিসাবে আমার উচিত ছিল আইনের ধারাগুলি মেনে চলা।

পুলিশটি জানালেন— ঠিক আছে, এই কুকুর তো কারো ক্ষতি করবে না।

আমি বললাম —না স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন না। কুকুরের জাত তো। ও তো আর মানুষ নয়। সামনে একটা ছোট্ট নধর কাঠবেড়ালিকে দেখলে থাবা দিয়ে সেটাকে মেরে ফেলতে পারে।

উনি বললেন— বুঝেছি, আপনি ব্যাপারটাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। ঠিক আছে, ওকে পাহাড়ের ধারে ছুটোছুটি করতে দিন। আমি যেন না দেখি। তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

পুলিশটি এবার নিজের আত্ম-গরিমা দেখাতে চাইছিলেন। আমি যখন নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেই বিচারকের আসনে বসে গেলাম। তিনি কেমন যেন দমে গেলেন। তিনি দয়া প্রদর্শন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

আমি যদি রুখে দাঁড়াতাম। আমি যদি আইনের ধারা-উপধারার ব্যাখ্যা চাইতাম। তাহলে কী হতো? তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি গ্রেপ্তার করা হতো। জজ সাহেবের সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হতো।

আমি প্রথমেই তর্কের পথ পরিহার করেছিলাম। আমি স্বীকার করেছিলাম, আমারই ভুল হয়েছে। আমি করজোড়ে মার্জনা চাইছি। এই স্বীকৃতির মধ্যে আন্তরিকতার ছোয়া ছিল। কৌশল কাজ করেনি। এতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

লর্ড চেস্টারফিল্ডও বোধহয় এতোখানি মহত্ব দেখাতে পারতেন না। যেমনটি দেখিয়ে ছিলেন আইনের রক্ষক ঐ ঘোড়সওয়ার। অথচ এক সপ্তাহ আগে তিনি আমাকে চোখ পাকিয়ে কড়া কড়া কথা বলেছিলেন। আইনের ভয় দেখিয়েছিলেন।

যদি আপনি কখনো এই জাতীয় অবস্থার সম্মুখীন হন তাহলে কী করবেন? তাহলে আমার মতো প্রথমেই হাত কচলে দোষ স্বীকার করে নেবেন। দেখবেন, তাতেই অর্ধেক কাজ হয়েছে। অপরের মুখ থেকে খারাপ কথা শোনার আগে নিজেই নিজেকে খারাপ কথার চাবুকে শাসন করুন। আত্মসমালোচক হয়ে ওঠাটা এই পৃথিবীর অন্যতম বড়ো কাজ। এটা আমরা করতে পারি না বলেই পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হই।

অন্যেরা আপনার সম্বন্ধে যা ভাবছে বা ভাবতে পারে, সেগুলো আগে থেকে আপনিই ভেবে ফেলুন। তারপর দেখবেন, অন্ধকারের কালো মেঘ কোথায় উড়ে যাচ্ছে। এমনটি করলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়। একশোবারের মধ্যে নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে আপনি জয়যুক্ত হন। আপনি লোকটিকে অবশ্যই নিজের বশে আনতে পারেন। যেমন পুলিশ

ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

এবার ফার্দিনান্দ ওয়ারের নামে এক কর্মার্শিয়াল আর্টিস্টের কথা বলি। তিনি এক বদমেজাজী ক্রেতাকে এই কৌশলে বধ করেছিলেন।

নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি আমাকে অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নামী মানুষদের ছবি আঁকতে গেলে তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়।

তাঁর কথাতে বলা যাক —কিছু কিছু শিল্প সম্পাদক টিনি, তাঁরা যে কাজ দিচ্ছেন, চোখের পলক ফেলার আগে সেই কাজ করে দিতে হবে। এতো তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। আমি এমন একজন শিল্প সম্পাদককে জানতাম, তিনি ছোটোখাটো ভুল ধরে অসীম আনন্দ পেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর অফিস থেকে ভীষণ রেগে বেরিয়ে আসতাম। সেটা অবশ্য তাঁর সমালোচনার জন্যে নয়। কাজ খারাপ হলে সেটি তো সমালোচিত হবে। তার জন্যে আমি আগে থেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখতাম। কিন্তু তিনি যেভাবে আমাকে আক্রমণ করতেন, অভদ্রতার একশেষ। সেটি আমার ভালো লাগতো না।

সম্প্রতি ঐ ভদ্রলোককে আমি কিছু কাজ করে দিয়েছিলাম, তিনি আমাকে টেলিফোন করে তাঁর অফিসে যেতে বললেন। তিনি জানালেন কিছু ভুল হয়েছে।

তিনি বললেন, আমি এইসব ভুল করেছি। আমি এতোদিন ধরে সযত্নে যা শিখেছিলাম, সব যেন ভুলে গেলাম। আমার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো।

আমি বললাম—আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি। আমার এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। বহুকাল ধরেই আমি আপনার ছবি আঁকছি। সুতরাং আপনার চাহিদা কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার। যাই হোক, যা হয়েছে তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আমি সত্যি আন্তরিকভাবে লজ্জিত।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করলেন। আগের সেই রাগী ভাবটা কোথায় উঠে গেল। তিনি বললেন —হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এই ভুলটা এমন কিছু বেশি নয়। একটু সতর্ক হলেই এটাকে ফেরানো যেতো।

আমি তাকে বাধা দিলাম —যে কোনো ভুলেই বাজে খরচ আসবে। তাছাড়া অনেকটা সময় নষ্ট হবে। ক্লায়েন্টরা খুশী হবে না। এটা কি কখনো করা উচিত।

তিনি আবার আমাকে বাধা দিলেন। আমার খুবই ভালো লাগছিল। এই প্রথম আমি নিজেই নিজের সমালোচনা করলাম। আর এর ফল হয়েছিল ভীষণ ভালো।

আমি বললাম, সত্যি আমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আপনি তো আমাকে অনেক কাজ দেন। ঠিক মতো পয়সাকড়ি মিটিয়ে দেন। অবশ্য আপনি চাইবেন, আমার কাছ থেকে সেরা কাজটি পেতে। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এমনটি আর হবে না। তাছাড়া, এই ছবিগুলো আমি আবার নতুন করে এঁকে দেবো।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শেষের এই কথাগুলি শুনে তিনি যেন প্রায় আঁতকে উঠলেন। তিনি বললেন —না না, এই কাজ আপনাকে আর করতে হবে না। সামান্য একটু অদল-বদল করলেই আমাদের ক্লায়েন্টরা নিয়ে নেবে। আমার ভুলে তাঁর কোনো অর্থ ক্ষতি হয়নি। এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই।

তাহলে কী প্রমাণিত হলো? তিনি আমাকে আত্মসমালোচনা করাতে চেয়েছিলেন। আমি এইভাবে যেন তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে নিই।

তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি বিদায় নেবার আগে আমাকে একটা চেক দিলেন। কমিশনের টাকাটাও আমার হাতে তুলে দিলেন। তাহলে কী হলো? কৌশল করে আমি কেমন তাঁর মন পাল্টে দিলাম।

বোকারাই কেবল নিজের ভুল প্রকাশ করতে চায় না। বেশীর ভাগ বোকারাই এমনটি করে থাকে। তারা ভাবে, নিজের ত্রুটি স্বীকার করলে সে বুঝি অন্যের কাছে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু একদম এর উল্টো।

নিজের ভুল মেনে নিলে মহত্ব প্রকাশ পায়। ভালো কাজও হয়। আর একটা গল্প শোনা যাক।

ইতিহাসে রবার্ট লী সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। তিনি যে ভাবে গেটিসবার্গ আক্রমণের ব্যর্থতা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তার তুলনা কোথায়? এতে তিনি মহৎ হয়ে আছেন। অথচ, এই ব্যর্থতার জন্যে আমরা কোনো মতেই তাঁকে দোষারোপ করতে পারি না। এই ব্যর্থতা এসেছিল তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি পিকেটের জন্যে।

পিকেট কে ছিলেন? তিনি ছিলেন এক রূপবান যুবা পুরুষ। তাঁর মাথার দু'পাশে সোনালী চুলের বন্যা ছিল। কাঁধ অব্দি সে চুল নেমে গিয়েছিল। ইতালী আক্রমণের সময় নেপোলিয়ান যেমন রোজ রণক্ষেত্র থেকে তাঁর প্রেমিকাকে একটি করে প্রেমপত্র লিখতেন, পিকেটও তাই করতেন। সেনাবাহিনীর ওপর ছিল তাঁর কঠিন কঠোর নিয়ন্ত্রণ। সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর কথা মেনে চলতেন।

গেটিসবার্গ আক্রমণ করার জন্যে পিকেটের সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছে। তখনই একটা অঘটন ঘটে গেল। লুকোনো স্থান থেকে বিরুদ্ধ দলের সেনারা বেরিয়ে এলেন। তাঁরা অতর্কিতে পিকেটের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। পাঁচ হাজারের মধ্যে চার হাজার সেনার মৃত্যু হলো। পিকেটের বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সামান্য ভুল আর অসতর্কতার ফলে এতো বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল।

লী ব্যর্থ হলেন। উত্তরে এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেল। দক্ষিণের রাস্তা ইতিমধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাতে লী অত্যন্ত ভেঙে পড়েন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডেভিস জেফারসনের কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন—। আমার থেকে যোগ্য এবং তরুণ কাউকে যেন সেনাবাহিনীর প্রধান পদে বসানো হয়।

লী ইচ্ছে করলে নিজেকে ঢেকে রাখতে পারতেন। পিকেটের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারতেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে এটা করা তাঁর উচিত হবে না। এমনটিই তিনি মনে করেছিলেন। আর তার ফল কী হয়েছে? তাঁর ফলে তাঁকে আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর নায়কের সম্মান দিয়েছি।

তিনি ছিলেন মহৎ। অন্যকে দোষারোপ করার ইচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে জাগেনি। পিকেট যখন ফিরে এলেন, তখনো তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি বারবার বলেছিলেন —পিকেট, এই ঘটনায় তোমার কোনো হাত নেই। আমার উচিত ছিল রণক্ষেত্রে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করা। তাহলে এই ঘটনা আর ঘটতো না। যাক, ভবিষ্যতে যাতে এমনটি আর না ঘটে, তার জন্যে এখন থেকেই আমাদের তৈরী থাকতে হবে।

বিশ্বের ইতিহাসে এমন স্বীকারোক্তির ঘটনা খুব একটা বেশী ঘটেনি। বিশেষ করে রণক্ষেত্রে সৈনিকেরা সাধারণত আত্মম্ভরী হয়ে থাকেন। পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয়—এমন একটি কষ্ট কল্পনা বিশ্বাস করেন।

এলবার্ট হাবার্টকে মনে আছে তো? তিনি এমন একজন নীতিবাগীশ লেখক ছিলেন, তাঁর এক-একটি রচনা জাতিকে কাঁপিয়ে তুলতো। তাঁর লেখার খোঁচায় অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে পড়েন। কিন্তু হাবার্টের ব্যক্তিগত চরিত্রটি ছিল চমৎকার। কথায় কথায় তিনি যে কোনো বিরুদ্ধবাদীকেও স্বপক্ষে নিয়ে আসতে পারতেন।

একবার এক ক্রুদ্ধ পাঠক জানান, তিনি কিছুতেই হাবার্টের মতের সাথে একমত হতে পারছেন না। তিনি হাবার্টকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করেছিলেন।

হাবার্ট তাঁর চিঠিখানা পড়লেন। অন্য কোনো লেখক হলে হয়তো প্রচণ্ড রেগে যেতেন। হাবার্ট কিন্তু একটুও রাগ করলেন না। তিনি বললেন —চিন্তা করে দেখলাম, আমার নিজের মত আপনার সাথেই মিলে যাচ্ছে। আমি যা লিখেছি, তা সবসময় আমার পছন্দ হয়, এমনটি ভাবতেন না কিন্তু। এছাড়া আপনি যে আমার লেখাটা নিয়ে এতোটা সময় ব্যয় করেছেন তাঁর জন্যে আপনাকে আমি আকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর একটি কথা, ভবিষ্যতে এদিকে এলে দয়া করে আমার বাড়িতে একবার আসবেন। তাহলে লেখাটি নিয়ে আপনার সাথে মত বিনিময় করা যেতে পারে। দূর থেকেই আমি আমার সখ্যতার হাত বাড়িয়ে দিলাম। আপনার বিশ্বস্ত।

এরকম চিঠি পাওয়ার পর ক্রুদ্ধ পাঠক আর কী করবেন? তিনি কি রাগ পুষে রাখবেন? নাকি তিনি কখন হাবার্টের বাড়িতে যাবেন, সেই কথা চিন্তা করে দিনগুলি কাটাবেন।

তাহলে? অন্যকে বশ করতে গেলে আপনাকে আত্মসংযমী হতে হবে। আত্মগরিমা ভুলে যেতে হবে। যে কোনো ভুল সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। বিশ্বাস করুন, এতে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয়।

প্রাচীন সেই প্রবাদটা মনে আছে তো? লড়াই করলে যথেষ্ট ফল পাবেন না, নরম হলেই আশাতীত ফল পেতে পারেন। তাহলে এবার আমরা তিন নম্বর নিয়মটা বলে নিই—যদি আপনি ভুল করেন, তাড়াতাড়ি সেই ভুল স্বীকার করে নিন।

তের

শুভবুদ্ধির পথ ধরে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাবো?

মনে করুন, কোনো কারণে আপনি খুব রেগে গেছেন।

তখন আপনি কী করেন?

চোখের সামনে যাকেই দেখতে পেলেন, তাকে রাগ করে দু-চারটে কথা শুনিয়ে দিলেন।

আপনি ভাবলেন, এতে আপনার মনের ওপর চেপে থাকা পাথরটা সরে গেল। মনটা হাল্কা হলো। আপনি আবার নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়লেন।

কিন্তু আপনি কি একবার ভেবেছেন, যে মানুষটিকে অযথা এতোগুলি কটু কথা শোনালেন, তার মন কেমন হলো? সে তো আর মন খারাপ করে বসে ছিল না। নেহাত আপনার সামনে এসে পড়েছিল তাই। তাকে এভাবে বলির পাঁঠা করা কি উচিত হলো আপনার পক্ষে?

দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে এমন ঘটনা প্রায় ঘটে যায়। আসুন, আমরা এর ওপর একটা যুক্তি নির্ভর আলোচনা করি।

উইন্ড্রো উইলসন একবার বলেছিলেন—যদি আপনি আমার দিকে ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে আসেন তাহলে কী দেখবেন?

তাহলে দেখবেন, আমি দুটি ঘুষি নিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

এর বদলে যদি আপনি আমাকে বলেন, আসুন উইন্ড্রো সাহেব, পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা আলোচনার টেবিলে বসে সমাধানের পথে এগোতে পারে। তাহলে আপনার আমার সমস্যাই বা তেমনভাবে সমাধানের পথ ধরে এগোবে না কেন?

তাহলে কী হবে? তাহলে আমাদের মত বিরোধ অনেক কমে যাবে। দেখা যাবে, প্রথমে আমরা পরস্পরকে শত্রু ভেবে এসেছিলাম। এখন দেখছি, আমাদের মধ্যে বন্ধুতার সম্পর্কে অনায়াসে স্থাপন করা যেতে পারে।

একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে সহজেই আমরা ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে চাপা দিতে পারি।

শুধু উইন্ড্রো উইলসন নয়, আরো অনেকের বক্তব্য হলো এইরকম। আমরা জন ডি রকফেলার জুনিয়ারের কথা বলতে পারি। ১৯১৫ সালে রকফেলার ছিলেন কলোরাডোর সব থেকে ঘৃণিত মানুষ। আমেরিকার শিল্প জগতে তখন দেখা দিয়েছে নিদারুণ দুর্দান্তিকাল। একটি ধর্মঘট দু'বছর ধরে চলেছে। শ্রমিকেরা অত্যন্ত রেগে গেছে। কলোরাডো লৌহ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার মুখে। রকফেলার এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। সৈন্যবাহিনীকে ডাকতে হলো। সৈনিকেরা মাঝে মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে। একটির পর একটি কারখানাতে আগুন দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। পুলিশ গুলি চালালো। ধর্মঘটীদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হলো। বলা যেতে পারে, সে এক দারুণ দুঃসময়।

এই সময়ে কী ঘটলো? রকফেলার হঠাৎ সমস্ত ধর্মঘটীদের সপক্ষে এনে ফেললেন। কিন্তু কীভাবে? আসুন, সেই আপাত অবিশ্বাস্য কাহিনীটি বলা যাক।

কয়েক সপ্তাহ ধরে রকফেলার ধর্মঘটীদের মাঝে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রতিটি বক্তৃতার আগে শত্রুতার বাতাবরণ সৃষ্টি হতো। কিন্তু দেখা গেল, রকফেলার যখন কথা বলছেন, শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন শব্দ ব্যবহার করছেন, শ্রমিকদের অসন্তোষ অনেকখানি কমে গেছে।

দেখতে দেখতে রকফেলারের কিছু অনুগামী জুটে গেল। যারা এতোদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল, তাঁদের চোখে রকফেলার ছিলেন এক ঘৃণিত শোষক, তাদের কাছে রকফেলার হঠাৎ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন। দেখা গেল, মজুরী বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকেরা আর রক্তাক্ত পথের পথিক হতে চাইছে না। এমন কি কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুড়সুড় করে কারখানায় যোগ দিলো।

আসুন, এই বক্তৃতার ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা যাক। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ অনুধাবন করলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন, কীভাবে রকফেলার উগ্র ধর্মঘটীদের সপক্ষে এনেছিলেন।

এখানে একটা কথা শুনিয়ে রাখা যাক। শ্রোতা হিসাবে রকফেলারের সামনে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন রকফেলারের দারুণ সমালোচক। এমন কি তারা রকফেলারকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দেবার কথা বলেছিল। বলা হয়েছিল, বাগে পেলে এই লোকটিকে ইটের আঘাতে রক্তাক্ত করে মারা হবে।

রকফেলার কিন্তু এতোটুকু ভয় পাননি। কোনো ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে সঙ্গে নেননি। পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নেননি। তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন, মনে হচ্ছিল, তিনি বুঝি স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। অথবা সমাজসেবা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন।

রকফেলার প্রথমেই বলেছিলেন —আপনাদের সামনে আসতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত বলে মনে করছি।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, বক্তৃতার নামে রকফেলার বোধহয় তাদের ভর্ৎসনা করবেন। এমন কিছু কথা বলবেন যাতে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে।

রকফেলার সে পথ দিয়ে গেলেন না। তিনি বললেন— আপনাদের বাড়িতে আমি পা রেখেছি। আপনাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সাথে পরিচিত হয়েছি। তাই বলা যেতে পারে, এখানে আমি কিন্তু এক অপরিচিত হিসাবে আসিনি। আমি এসেছি সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে। যাতে পারস্পরিক সম্পর্কটা আরো সুন্দর এবং সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

রকফেলার আরো বলেন —এটি আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সারাজীবন এই মুহূর্তটির আমি স্মৃতিচারণ করবো। জীবনে এই প্রথম আমি আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রতিনিধি, অফিসার আর সুপারিটেনডেন্টদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমি অত্যন্ত গর্বিত। জীবনে কোনোদিন এই মুহূর্তটিকে ভুলতে পারবো না। এই সভা যদি দু'সপ্তাহ আগে অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো আমার আবেগ এতোটা উচ্ছ্বাকাঙ্খী হতো না। কেননা, দুঃখের সঙ্গে বলছি, তখনো পর্যন্ত আমি আমার প্রতিষ্ঠানের অনেককেই চিনতাম না।

কিন্তু গত দু'সপ্তাহ ধরে অনেকের বাড়িতে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দক্ষিণের কয়লাখনি অঞ্চলের সমস্ত শিবির গুলিতে ভ্রমণ করেছি। ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সাথে সাক্ষাত করেছি। শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের সকলের সাথে কথা বলেছি। তাই, অপরিচিতির বাঁধন কেটে গেছে। পারস্পরিক বন্ধুতার মধ্যেই আমি এসেছি। আপনাদের সামনে আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত শব্দের উপহার পৌঁছে দেবো বলে।

যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানের অফিসার এবং কর্মচারী প্রতিনিধিদের সভা, অতএব, বলা যেতে পারে, আপনাদের অশেষ অনুগ্রহেই আমাকে এখানে ভাষণ দেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি অনুভব করছি, আপনাদের সাথে জড়িয়ে থাকা অন্তরঙ্গতাই আজ আমাকে এখানে এনেছে। বলতে গেলে, স্টকের মালিক এবং অংশীদারদের পক্ষেই আমি কথা বলতে এসেছি।

রকফেলারের ভাষণ পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন, কী সুকৌশলে তিনি বিরুদ্ধবাদীদের হাত করে ফেললেন।

এখন ভাবুন তো, যদি রকফেলার অন্য কোনো বক্তব্য রাখতেন তাহলে কী হতো? যদি তিনি শ্রমিকদের সাথে তর্ক জুড়ে দিতেন? শ্রমিকেরা রক্তাক্ত আন্দোলন করছে বলে তাদের ভৎর্সনা করতেন? তাহলে সেখানে এক রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। হয়তো রকফেলার তর্কশাস্ত্র থেকে নানা উদাহরণ টেনে আনতেন। বাক্যবাণে বিদ্ধ করতেন শ্রমিক নেতাদের। কিন্তু কিছু তো ফল পেতেন না। পারস্পরিক বৈরীতা আরো বেড়ে যেতো। ক্রোধ আকাশচুম্বী হতো। ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটে যেতো।

সুতরাং, আমরা এই কথাটা সবসময় মনে রাখবো —যদি কোনো মানুষকে আপনি আপনার অনুগামী করতে চান, তাহলে তার সাথে ভালোভাবে কথা বলুন। কখনো হুকুম করবেন না। একটা কথা মনে রাখতে হবে। তাহলো, কখনোই হুকুম করে মানুষের মন জয় করা যায় না। কিছুতেই আপনি এভাবে কাউকে আপনার ধারণার অনুগামী করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলে আমরা হয়তো বিরুদ্ধবাদীদের কিছুটা নমনীয় করতে পারবো।

আজ থেকে একশো বছর আগে আব্রাহাম লিঙ্কন ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন। এটি একটা পুরোনো প্রবাদ, এক গ্যালন দুর্গন্ধ যুক্ত পদার্থে যত মাছি এসে বসে তার থেকে অনেক বেশি মাছি বসে এক ফোঁটা মধুর ওপর। মানুষের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। আপনি যদি কোনো মানুষকে আপনার মতের অনুবর্তী করতে চান, তাহলে প্রথমেই তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। ওহে ভায়া, আমি তোমার প্রকৃত বন্ধু। তখন কী হবে? তখন ব্যাপারটা ঐ

এক ফোঁটা মধুর মতোই হবে। আপনি ঐ মানুষটিকে আকর্ষণ করতে পারবেন। এভাবেই তার মনের ভেতর ঢুকে পড়তে পারবেন।

এখন ব্যবসায়ীরা এটা বুঝতে পেরেছেন। এখন আর তাঁরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন না। কথায় কথায় পুলিশ ডেকে ধর্মঘট তুলে দেন না।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা হোয়াইট মোটর কার কোম্পানীর কথা বলতে পারি। এই কোম্পানীর আড়াই হাজার কর্মচারী মাইনে বাড়াবার জন্যে ধর্মঘট করেছিল। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট রবার্ট এফ ব্লাক কখনোই ধর্মঘটীদের নিন্দে করেননি। তিনি কোনো ভীতি প্রদর্শনের পথ ধরেননি। আগে যেমনটি করা হতো, ধর্মঘট মানেই সাম্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, তিনি তাও বলেননি। বরং তিনি ধর্মঘটীদের প্রশংসা করেছিলেন।

খবরের কাগজে তিনি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এই বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে বলা ছিল—শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিকেরা তাদের যন্ত্র নামিয়ে রেখেছে।

শুধু কী তাই? ধর্মঘটীদের তিনি কয়েক ডজন বেসবল প্যাড আর দস্তানা কিনে দিয়েছিলেন। যাতে তারা ফাঁকা মাঠে খেলাধুলাতে মেতে উঠতে পারে। এভাবেই তাদের মন এবং মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কী হলো? প্রেসিডেন্ট ব্ল্যাকের এই আচরণ ধর্মঘটী নেতাদের মন ভিজিয়ে দিয়েছিল। অনেকে প্রেসিডেন্টের বন্ধু হয়ে পড়ে। তারা নিজেরাই ঝাঁটা, বুরুশ এনে কারখানা সাফ করতে শুরু করে দেয়। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন তো? যে ধর্মঘটীরা বেশি টাকা মাইনের দাবীতে অনশন আন্দোলনে মেতে উঠেছিল তারা স্বতঃপ্রণোদিত কারখানা সাফ করছে। এমন কথা কোথাও শোনা গেছে কী? আমেরিকার শ্রমিক ধর্মঘটের ইতিহাসে বোধ হয় এমন ঘটনার আর উদাহরণ পাওয়া যাবে না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ধর্মঘট মিটে গিয়েছিল। কোনোরকম মনোমালিন্য বা বিদ্বেষ ছাড়াই এটি সম্ভব হয়েছিল।

এবার আমি ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁকে অনেকে গ্রীক দেবতা বলে ডাকতেন। জিহোবার মতোই কথা বলতেন তিনি। একজন সফল আইনজীবী হতে গেলে যে সমস্ত গুণের সমাহার দেখা যায়, ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের মধ্যে তার সবক'টি ছিল।

তিনি সওয়াল করতেন বন্ধুত্বপূর্ণ পথে। তিনি বলতেন, এই বিষয়টা জুরীরা ভেবে দেখলে ভালো হয়, অথবা ভদ্রমহোদয়রা, আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। আশা করি, আপনি আপনার শুভবুদ্ধির কাছে বিচার চাইবেন। যদি মনে হয় আমার মক্কেল নির্দোষ, তাহলে আপনারা সেইভাবে রায় দেবেন। আর যদি মনে হয়, একটু থামতেন তিনি জুরীদের দিকে তাকাতেন, তাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতেন। তারপর বলতেন, আমার মক্কেল অপরাধী, তাহলে আইনে যা আছে তাই বলবেন। আমি কোনো আলাদা কথা বলতে বলছি না।

বুদ্ধি করে তিনি কোনো চাপ দিতেন না। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাব জুরীদের প্রভাবিত করতেন। এভাবেই একটির পর একটি মামলাতে জিতে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার আইনজগতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

আপনিও এই কাজ করতে পারেন। ধর্মঘট মীমাংসা করার জন্যে অথবা আইনী লড়াইতে জয়লাভ করার জন্য আপনাকে এই পথের পথিক হতেই হবে। সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। দেখা যাক, কীভাবে আমরা এই ব্যবহারকে আয়ত্ব করতে পারি এবং জীবন যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি।

প্রথমে আমি ও এল স্টীবের কথা বলবো। স্টীব একজন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি তাঁর ভাড়া

কমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল, বাড়িওয়ালাকে সহজে বশ করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্ট্রব আমার সাথে একবার দেখা করেছিলেন। তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

তিনি বললেন —আমি বাড়িওয়ালাকে লিখেছিলাম, লিজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেবো। আসল কথাটা হলো, আমি ফ্ল্যাটটা ছাড়তে ইচ্ছুক ছিলাম না। যদি ভাড়া কমানো যায় অথবা যে ভাড়া আমি দিই সেই ভাড়াতেই থাকতে পারি, তাহলে সেখানে থেকে যেতাম। অবস্থাটা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। বাকি ভাড়াটেরা কেউ তাদের প্রয়াসে সফল হয়নি। সকলেই আমাকে বলেছিল, মালিকের হৃদয় জয় করা সহজ নয়। লোহার মতো কঠিন তাঁর হৃদয়।

আমি নিজেকে বললাম—আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের কৌশল শিখেছি। আমি সবার ওপর এটা প্রয়োগ করে সফল হয়েছি। আর আমি বাড়িওয়ালাকে বশীভূত করতে পারবো না।

আমার চিঠি তাদের হাতে পৌঁছে গেছে। বাড়িওয়ালা তাঁর সেক্রেটারীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি চার্লি সোয়াবের কায়দায় দরজার সামনে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম। বলতে গেলে, একটু বেশীই সম্মান প্রদর্শন করলাম। বলা যেতে পারে, ভালোবাসার টানে তাঁদের একেবারে ভাসিয়ে দিলাম। আমি একবারও বললাম না, স্যার, ভাড়াটা বড্ড বেশী। আমি শুরু করলাম, এই ফ্ল্যাটে কত আরাম আর বিনোদনের উপকরণ সাজানো আছে একথা বলে। আমি তাঁর আন্তরিক প্রশংসা করলাম। বাড়িটা তিনি যেভাবে বানিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর নন্দন শিল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেছে —একথাও তাঁকে মনে করালাম। আমি বললাম, স্যার, আমার একবছর এখানে থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

ভদ্রলোক এরকম ব্যবহার আশা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, আমি বোধ হয় তাঁকে অপমান করবো। অন্য ভাড়াটেরা যেমনটি করে থাকেন। একে একে চোদ্দটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। অনেকেই চিঠিতে তাঁকে গালাগালি দিয়েছিল। অনেকে জোর জবরদস্তির কথা বলেছিল। একজন লিখেছিল, তিনি লীজ ছেড়ে দেবেন, যদি ওপরের ভদ্রলোকের নাক ডাকা বন্ধ না হয়।

দেখা গেল, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর আনন্দের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, আপনার মতো ভদ্রলোক পাওয়াটা তো স্বপ্নের ব্যাপার।

আমি না চাইতে তিনি ভাড়া কিছুটা কমিয়ে দিলেন। আর, আমি যে অর্থ দিতে চেয়েছিলাম, তিনি তাতেই রাজী হলেন।

বিদায় নেবার সময় তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—। আচ্ছা মিস্টার, বাড়িটাতে আর কী কী পরিবর্তন করলে আপনার ভালো লাগবে?

তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে তাঁর মতো একজন লৌহ কঠিন মানুষকেও নিজের কৌশলে বশীভূত করা গেল। আমি যদি অন্য ভাড়াটের মতো কৌশল করে ভাড়া কমানোর চেষ্টা করতাম, তাহলে কী হতো? তাঁরা যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, আমিও তেমন ব্যর্থ হতাম। আমি বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের ফলে জয়লাভ করলাম।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এবার এক মহিলার গল্প বলছি। তার নাম মিসেস ডরোথী ডে। তিনি লঙ-আইল্যান্ডের গার্ডেন সিটিতে থাকেন। মস্ত নামী এক মহিলা। সমাজসেবার কাজে যুক্ত থাকেন।

মিসেস ডে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তারই এক জায়গাতে তিনি লিখেছেন —আমি সম্প্রতি কিছু বন্ধুকে একটি ডিনারের আসরে ডেকেছিলাম। এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই জরুরী ছিল।

আমি চেয়েছিলাম, ভালো ভাবে যেন পার্টিটা উতরে যায়। হোটেলের প্রধান পাচক এমিলকে ডাকলাম। আমাকে সাহায্য করার কথা বললাম। কিন্তু আসল দিনে এমিলকে কোথাও পেলাম না। প্রতিবার সে আমাকে সাহায্য করে। এবার একেবারে ডুবিয়ে দিলো। তাহলে বুঝতে পারছেন, ডিনারের পদগুলো মোটেই ভালো হলো না। এমিল একজন পরিবেশনকারীকে পাঠিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর কাজে লোকটির কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে সব থেকে মানী অতিথিকে সবার শেষে পরিবেশন করছিল। একবার সে কিছু অখাদ্য খাবার পাতে দিয়ে দিলো। মাংসটাও ছিল খুবই শক্ত। আলুগুলো আঠালো। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আমার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেল। আমি রেগে কাঁই হয়ে গেলাম। হাসি মুখে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মনে মনে গজরাতে লাগলাম। এমিলকে একবার পাই। তারপর তার একদিন কী আমার একদিন। মনের সুখে তাকে গালাগাল দেবো। গায়ের ঝাল ঝাড়বো।

...ব্যাপার ঘটেছিল বুধবার। পরের দিন মানবিক সম্পর্ক নিয়ে একটা বক্তৃতা শুনলাম। শুনতে শুনতে বুঝতে পারলাম, এমিলকে গালাগাল দিয়ে আমার কিছুই হবে না। সে আরো বেশী অসন্তুষ্ট হবে। ভবিষ্যতে আমি তার কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য পাবো না। এবার আমার মন শান্ত হলো। আমি নিজেকে এমিলের অবস্থানে বসালাম। তার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে চাইলাম। সে খাবার বা রান্না করেনি। সে একজন বোকা পরিবেশনকারীকে পাঠিয়েছে, তার জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা উচিত কী?

...নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো আমার। আমি তাড়াহুড়ো করে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন মন পরিষ্কার করতেই হবে।

আমি ভাবলাম, এমিলের সাথে দেখা হলে প্রথমেই তাকে প্রশংসা করবো। দেখবো, আমার প্রশংসা শুনে সে আত্মগ্লানিতে ভুগছে কিনা।

পরের দিনই আমার স্বপ্ন সফল হলো। এমিলের সঙ্গে দেখা হলো। এমিলকে দেখে মনে হলো, সেও বোধহয় লড়াই করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। আমি বললাম, দেখো এমিল, তুমি হচ্ছো নিউইয়র্কের সবার সেরা পাচক। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না, কেন এমনটি হলো। তুমি কী কোথাও কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে? তুমি তো আমার সাথে এমন ব্যবহার কখনো করো না। আর দেখো, আমার বলতে খারাপ লাগছে, তুমি যাকে পাঠিয়েছিলে, পরিবেশনের ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অবশ্য এর জন্যে তোমাকে দোষারোপ করছি না। তুমি কী তার মনের মধ্যে ঢুকবে? আমি ভাবছি, এমিল, ভবিষ্যতে আমি আবার যখন এইভাবে ডিনারের আসর বসাবো, তুমি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকবে তো?

মন কালো মেঘ সরে গেল। এমিল হাসলো। তারপর বললো —সঠিক বলেছেন মাদাম। রান্না ঘরেই আসল গণ্ডগোলটা হয়। অবশ্য কাল যা ঘটেছে তার জন্য আমি মার্জনা চাইছি। এটা কিন্তু আমার দোষ নয়।

আমি বললাম —আমি অন্য একটা পার্টির ব্যবস্থা করছি। এমিল, সেই পার্টিতে আমি তোমার উপস্থিতি প্রার্থনা করছি। আমি চাইছি শুরু থেকে শেষ অব্দি তুমি থাকবে। নিজের হাতে সবকিছু দেখবে। তাহলে আর আমাকে চিন্তা করতে হবে না।

এমিল বললো —হ্যাঁ, মাদাম, এবার আর আমার মোটেই ভুল হবে না।

কমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল, বাড়িওয়ালাকে সহজে বশ করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্ট্রব আমার সাথে একবার দেখা করেছিলেন। তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন।

তিনি বললেন —আমি বাড়িওয়ালাকে লিখেছিলাম, ডিল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দেবো। আসল কথাটা হলো, আমি ফ্ল্যাটটা ছাড়তে ইচ্ছুক ছিলাম না। যদি ভাড়া কমানো যায় অথবা যে ভাড়া আমি দিই সেই ভাড়াতেই থাকতে পারি, তাহলে সেখানে থেকে যেতাম। অবস্থাটা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। বাকি ভাড়াটেরা কেউ তাদের প্রয়াসে সফল হয়নি। সকলেই আমাকে বলেছিল, মালিকের হৃদয় জয় করা সহজ নয়। লোহার মতো কঠিন তাঁর হৃদয়।

আমি নিজেকে বললাম—আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের কৌশল শিখেছি। আমি সবার ওপর এটা প্রয়োগ করে সফল হয়েছি। আর আমি বাড়িওয়ালাকে বশীভূত করতে পারবো না।

আমার চিঠি তাদের হাতে পৌঁছে গেছে। বাড়িওয়ালা তাঁর সেক্রেটারীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি চার্লি সোয়াবের কায়দায় দরজার সামনে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালাম। বলতে গেলে, একটু বেশীই সম্মান প্রদর্শন করলাম। বলা যেতে পারে, ভালোবাসার টানে তাঁদের একেবারে ভাসিয়ে দিলাম। আমি একবারও বললাম না, স্যার, ভাড়াটা বড্ড বেশী। আমি শুরু করলাম, এই ফ্ল্যাটে কত আরাম আর বিনোদনের উপকরণ সাজানো আছে একথা বলে। আমি তাঁর আন্তরিক প্রশংসা করলাম। বাড়িটা তিনি যেভাবে বানিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর নন্দন শিল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেছে —একথাও তাঁকে মনে করালাম। আমি বললাম, স্যার, আমার একবছর এখানে থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

ভদ্রলোক এরকম ব্যবহার আশা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, আমি বোধ হয় তাঁকে অপমান করবো। অন্য ভাড়াটেরা যেমনটি করে থাকেন। একে একে চোদ্দটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। অনেকেই চিঠিতে তাঁকে গালাগালি দিয়েছিল। অনেকে জোর জবরদস্তির কথা বলেছিল। একজন লিখেছিল, তিনি লীজ ছেড়ে দেবেন, যদি ওপরের ভদ্রলোকের নাক ডাকা বন্ধ না হয়।

দেখা গেল, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর আনন্দের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, আপনার মতো ভদ্রলোক পাওয়াটা তো স্বপ্নের ব্যাপার।

আমি না চাইতে তিনি ভাড়া কিছুটা কমিয়ে দিলেন। আর, আমি যে অর্থ দিতে চেয়েছিলাম, তিনি তাতেই রাজী হলেন।

বিদায় নেবার সময় তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—। আচ্ছা মিস্টার, বাড়িটাতে আর কী কী পরিবর্তন করলে আপনার ভালো লাগবে?

তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে তাঁর মতো একজন লৌহ কঠিন মানুষকেও নিজের কৌশলে বশীভূত করা গেল। আমি যদি অন্য ভাড়াটের মতো কৌশল করে ভাড়া কমানোর চেষ্টা করতাম, তাহলে কী হতো? তাঁরা যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, আমিও তেমন ব্যর্থ হতাম। আমি বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের ফলে জয়লাভ করলাম।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এবার এক মহিলার গল্প বলছি। তার নাম মিসেস ভরোধী ডে। তিনি লঙ-আইল্যান্ডের গার্ডেন সিটিতে থাকেন। মস্ত নামী এক মহিলা। সমাজসেবার কাজে যুক্ত থাকেন।

মিসেস ডে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তারই এক জায়গাতে তিনি লিখেছেন —আমি সম্প্রতি কিছু বন্ধুকে একটি ডিনারের আসরে ডেকেছিলাম। এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই জরুরী ছিল।

আমি চেয়েছিলাম, ভালো ভাবে যেন পার্টিটা উতরে যায়। হোটেলের প্রধান পাচক এমিলকে ডাকলাম। আমাকে সাহায্য করার কথা বললাম। কিন্তু আসল দিনে এমিলকে কোথাও পেলাম না। প্রতিবার সে আমাকে সাহায্য করে। এবার একেবারে ডুবিয়ে দিলো। তাহলে বুঝতে পারছেন, ডিনারের পদগুলো মোটেই ভালো হলো না। এমিল একজন পরিবেশনকারীকে পাঠিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর কাজে লোকটির কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে সব থেকে মানী অতিথিকে সবার শেষে পরিবেশন করছিল। একবার সে কিছু অখাদ্য খাবার পাতে দিয়ে দিলো। মাংসটাও ছিল খুবই শক্ত। আলুগুলো আঠালো। যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আমার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেল। আমি রেগে কাঁই হয়ে গেলাম। হাসি মুখে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মনে মনে গজরাতে লাগলাম। এমিলকে একবার পাই। তারপর তার একদিন কী আমার একদিন। মনের সুখে তাকে গালাগাল দেবো। গায়ের ছাল ছাড়বো।

...ব্যাপার ঘটেছিল বুধবার। পরের দিন মানবিক সম্পর্ক নিয়ে একটা বক্তৃতা শুনলাম। শুনতে শুনতে বুঝতে পারলাম, এমিলকে গালাগাল দিয়ে আমার কিছুই হবে না। সে আরো বেশী অসন্তুষ্ট হবে। ভবিষ্যতে আমি তার কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য পাবো না। এবার আমার মন শান্ত হলো। আমি নিজেকে এমিলের অবস্থানে বসালাম। তার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে চাইলাম। সে খাবার বা রান্না করেনি। সে একজন বোকা পরিবেশনকারীকে পাঠিয়েছে, তার জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা উচিত কী?

...নিজের ওপর ভীষণ রাগ হলো আমার। আমি তাড়াহুড়ো করে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন মন পরিষ্কার করতেই হবে।

আমি ভাবলাম, এমিলের সাথে দেখা হলে প্রথমেই তাকে প্রশংসা করবো। দেখবো, আমার প্রশংসা শুনে সে আত্মগ্লানিতে ভুগছে কিনা।

পরের দিনই আমার স্বপ্ন সফল হলো। এমিলের সঙ্গে দেখা হলো। এমিলকে দেখে মনে হলো, সেও বোধহয় লড়াই করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। আমি বললাম, দেখো এমিল, তুমি হচ্ছো নিউইয়র্কের সবার সেরা পাচক। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না, কেন এমনটি হলো। তুমি কী কোথাও কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে? তুমি তো আমার সাথে এমন ব্যবহার কখনো করো না। আর দেখো, আমার বলতে খারাপ লাগছে, তুমি যাকে পাঠিয়েছিলে, পরিবেশনের ব্যাপারে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। অবশ্য এর জন্যে তোমাকে দোষারোপ করছি না। তুমি কী তার মনের মধ্যে ঢুকবে? আমি ভাবছি, এমিল, ভবিষ্যতে আমি আবার যখন এইভাবে ডিনারের আসর বসবো, তুমি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থাকবে তো?

ঘন কালো মেঘ সরে গেল। এমিল হাসলো। তারপর বললো —সঠিক বলেছেন মাদাম। রান্না ঘরেই আসল গণ্ডগোলটা হয়। অবশ্য কাল যা ঘটেছে তার জন্য আমি মার্জনা চাইছি। এটা কিন্তু আমার দোষ নয়।

আমি বললাম —আমি অন্য একটা পার্টির ব্যবস্থা করছি। এমিল, সেই পার্টিতে আমি তোমার উপস্থিতি প্রার্থনা করছি। আমি চাইছি শুরু থেকে শেষ অব্দি তুমি থাকবে। নিজের হাতে সবকিছু দেখবে। তাহলে আর আমাকে চিন্তা করতে হবে না।

এমিল বললো —হ্যাঁ, মাদাম, এবার আর আমার মোটেই ভুল হবে না।

পরের সপ্তাহে আমি আবার একটি পার্টির ব্যবস্থা করলাম। এমিল আর আমি মেনু ঠিক করেছিলাম। আমি একবারও আগের ভুলের কথা উল্লেখ করিনি।

আমি হল ঘরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, টেবিলে দু-ডজন লাল আমেরিকান গোলাপ ফুল রাখা আছে। পুইন মেরী অথবা কালো মহারানীকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলো। এমন যত্ন করলো আমার অতিথি অভ্যাগতরা অবাক হয়ে গেলেন। খাবারগুলো ছিল নরম এবং সুস্বাদু। পরিবেশনে কোনো ত্রুটি ছিল না। একজনের বদলে চারজন একসঙ্গে পরিবেশন করছে। শেষে এমিল নিজে আইসক্রীম দিলো।

এবার বিদায় নেবার সময় হয়েছে। নানা অতিথিরা আমাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন। একজন তো বললেন —আপনি কী ঐ পাচককে বশ করেছেন নাকি?' এর আগে অনেক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছি। অনেক পাচক দেখেছি। কিন্তু এতো যত্ন আত্তি কোথাও দেখিনি তো?

শুনে আমার মন খুশীতে ভরে উঠলো। ভাগ্যিস আমি এমিলের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করিনি। তাহলে আমার কী হতো? তাহলে আমি কী আগের পার্টিটাকে ফিরে পেতাম? তা তো হতোই না বরং এমিলের মতো এক পাচককে হারাতাম।

আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আর আন্তরিক প্রশংসা এমিলকে জয় করেছিল। সে সত্যি সত্যি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

অনেক বছর আগে আমি খালি পায়ে স্কুলে যেতাম। মিসৌরির উত্তর-পশ্চিমের কোনো একটি জঙ্গল পার হতাম। তখনই সূর্য আর বাতাসের শক্তি নিয়ে একটি নীতিগল্প পড়েছিলাম।

একবার তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। সূর্য নিজেকে সব থেকে বেশি শক্তিশালী হিসাবে প্রমাণ করেই ছাড়বে। বাতাস সূর্যের এই অহঙ্কার মানতে চাইছে না। বাতাস বলছে, আমিই পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী।

এবার ঠিক হলো, তারা দু'জনেই প্রমাণ করবে। দেখতে হবে, সত্যি সত্যি কার জোর বেশী।

বাতাসের কাজ প্রথম শুরু হলো। কোট গায়ে দিয়ে একটি বুড়ো লোক এগিয়ে চলেছে। বাতাস বললো, আমি বাজি রাখছি সূর্যমশাই, আমি তোমার থেকেও তাড়াতাড়ি ওর গায়ের কোট খুলে দেবো।

সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেল। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। বাতাস জোরে বইতে শুরু করলো। মনে হলো যেন দিগন্ত রেখায় প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। বাতাস যতই তার শক্তি বাড়াতে থাকে, লোকটি ততই কোটটিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে।

শেষ পর্যন্ত বাতাস হাল ছেড়ে দিলো। হতাশ হলো।

এবার সূর্য বেরিয়ে এলো মেঘের আড়াল থেকে। সূর্য একবার দয়ালু দৃষ্টিতে তাকালো। লোকটির সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিলো। সে কপালে মুছে গায়ের কাপড়টি খুলে ফেললো। সূর্য হাসতে হাসতে বললো —বাতাস, এই পরীক্ষা থেকে কী প্রমাণিত হলো বলো তো? প্রমাণিত হলো, রাগ আর শক্তির থেকে দয়ালু ভাব অনেক ক্ষমতাশালী।

এই নীতি গল্পের বাকা গুলোতে আমি সারাজীবন মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। পরবর্তীকালে বুঝেছি, এর থেকে সত্যি কথা আর হতে পারে না।

বোস্টন শহরে এই গল্পটার সারাংশ প্রমাণিত হলো, বোস্টনে ডঃ এ. এইচ. বি. একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছিলেন। তিনি ছিলেন এক নামকরা চিকিৎসক। তিরিশ বছর বাদে, আমি আমার কথা বলার ক্লাসে তাঁকে একজন ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলাম। এখানে আমি ডঃ বি-

এর কথা বলি।

বোস্টনে তখন সংবাদপত্রে নানাধরনের ডাক্তারির বিজ্ঞাপন ছাপা হতো। এইসব বিজ্ঞাপনে মানুষের বিভিন্ন গোপন রোগ সারানোর ফন্দি ফিকিরের উল্লেখ থাকতো। ডাক্তারেরা মিথ্যে মিথ্যে কথা লিখে সম্ভাব্য রোগীদের আকর্ষণ করতেন। তার পুরুষত্ব হারাবার ভয় দেখিয়েও মানুষকে আতঙ্কিত করতো। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল মান্ধাতা আমলের। তারা জোর করে লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতো। এর ফলে অনেক রোগীর মৃত্যু হতো।

কিন্তু ডাক্তারদের কোনো শাস্তি দেওয়া যায়নি। কেননা, তাদের রাজনৈতিক খুঁটির জোর ছিল খুবই বেশী। অবশ্য মাঝে মধ্যে দু-একজনকে ধরা হতো। সামান্য জরিমানা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসতে পারতো।

অবস্থাটা গুরুতর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বোস্টনের অনেক নাগরিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। গীর্জার পাদ্রীরা বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। খবরের কাগজেও নানা চিঠি প্রকাশিত হলো। নাগরিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী মহিলা সমিতি, গীর্জা, তরুণদের ক্লাব ডাক্তারদের এই শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চাপের ফলে কোনো আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হলো না।

ডঃ বি তখন ছিলেন বোস্টনের সৎ—নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান। এই সমিতি নানাভাবে ঐ পাষণ্ড পিশাচ ডাক্তারদের প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন কী হবে? অনেক ভেবে চিন্তে ডঃ বি এমন কিছু করতে চাইলেন, যা বোস্টনের কেউ কখনো ভাবেনি। তিনি দয়ালুভাব, সহানুভূতি আর প্রশংসা দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করলেন। সংবাদপত্র প্রকাশকদের কাছে আবেদন জানালেন এখন থেকে কেউ যেন আর ঐ প্রতারণা মূলক বিজ্ঞাপন না ছাপেন।

তিনি দি বোস্টন হেরাল্ডের সম্পাদককে লিখলেন —কাগজটাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি। সম্পাদকীয় চমৎকার। পরিবারের পক্ষে একটি আদর্শ পত্রিকা। এমন কী নিউ ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতেও এর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কাগজ নেই।

কিন্তু, আপনার কাগজে এমন কিছু বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যা আমার উঁচু মাথা হেঁট করে দিয়েছে। আমার এক বন্ধুর অল্প বয়েসের মেয়ে আছে। সেদিন আপনার কাগজে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দেখে সে আমার কাছে তার অর্থ জানতে চেয়েছিল। সত্যিই, এতে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, তার রহস্য আমি ঐ কিশোরী কন্যাকে কী করে বোঝাই?

আমার মতো অবস্থা হয়েছে আরো অনেক পরিবারের। কেননা এটি একটি পারিবারিক পত্রিকা। আটি থেকে আশি —সব বয়সের পাঠক-পাঠিকারা বোস্টন হেরাল্ড পড়তে ভালোবাসে। তাই আপনাকে বলছি, আপনি অনুগ্রহ করে এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আর ছাপবেন না। তা না হলে আমরা সত্যি সত্যি ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হবো।

আবার আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কাগজের এতো সুনাম আছে। এটিকে আমরা এক আদর্শ কাগজের স্থান দিয়েছি। কিন্তু এর পাতায় পাতায় এমন বিজ্ঞাপন দেখে আমরা সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। অনেক পাঠকও আমার মতো এই কাগজটি পড়তে ভয় পাচ্ছেন।

হেরাল্ডের প্রকাশক ডঃ বি-কে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানা ডঃ বি ক্লাসে আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিরিশ বছর এই চিঠিখানা ডঃ বি তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। এই

চিঠিখানার তারিখ হলো ১৯০৪ সালের ১৩ অক্টোবর।

এ বি এইচ, এম. ডি, বোস্টন মাস।

প্রিয় মহাশয়, এ মাসের ১৯ তারিখের চিঠি জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আপনি সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে চিঠিখানা লিখেছেন। কিন্তু আমার মনে হলো, প্রকাশক হিসাবে এই চিঠির উত্তরটা আমাকেই দিতে হবে।

সোমবার থেকে দি বোস্টন হেরাল্ডের সব রকম আপত্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তবে হয়তো আমরা সবগুলি এখনই বন্ধ করতে পারবো না। কিছু আইনগত অসুবিধা আছে। তবে আমরা দেখবো, ভবিষ্যতে যেন এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত না হয়। এখন থেকে যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, সেগুলো ভালোভাবে সম্পাদিত এবং সংশোধিত করে তবেই প্রকাশ যোগ্য করে তোলা হবে।

আপনার চিঠির জন্যে আরো একবার আপনাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটি আমাদেরকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে।

ইতি ঃ

আপনার বিশ্বস্ত ডবলিউ এ ন্যাসকেল, প্রকাশক।

তাহলে কী দেখা গেল? দেখা গেল, বুদ্ধি করে উনি কত সুন্দর একটা সমাধান করলেন।

ঈশপের কথা মনে আছে কি? ঈশপ ছিলেন গ্রীকদেশের এক ক্রীতদাস। তিনি ক্রোনাসের রাজসভা থেকে অনেক কিছু নীতি গল্প লিখেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগে। মানব চরিত্র সম্পর্কে ঈশপ যে মন্তব্য করেছেন, আজও বোস্টন বা বার্মিংহামের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। ইতিমধ্যে প্রায় পঁচিশটি শতক কেটে গেছে। পৃথিবীর সর্বত্র বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু ঈশপের আপ্ত বাক্যগুলি এখনো আগের মতোই খাঁটি এবং সময়ানুগ আছে। সূর্য ঢের বেশী তাড়াতাড়ি আপনার কোট খুলে দিতে পারে। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বা প্রশংসা অন্য কোনো উপায়ের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ করে।

তাহলে আমরা কি লিঙ্কনের সেই কথায় ফিরে যাবো না —এক ফোঁটা মধু, এক গ্যালন তেতো জিনিসের থেকে অনেক বেশি মাছিকে আকর্ষণ করে?

এই অধ্যায় থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হলো, তাকে আমরা এইভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি— বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দিয়েই দিন শুরু করতে হবে। মনে রাখবেন, সখ্যতা অনেক শত্রুকে কাছের করে নেয়। আপনাকে এক অদ্ভুত আনন্দের অধিকারী করে তোলে।

চোদ্দ

সক্রেটিসের রহস্য

যে কোনো মানুষের সাথে কথা বলা শুরু করার আগে আপনি মনে মনে তার একটা অনুশীলন করুন।

সম্ভাব্য বিষয়গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করুন। প্রথম ভাগে থাকবে, যে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে ঐ ভদ্রলোকের মনোমালিন্য হবে সেগুলি। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে, যেগুলিতে আপনারা সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন সেইগুলি।

আমার অভিমত হলো, সেই কথাগুলোই আগে বলা উচিত, যেখানে মতের মিল আছে। আর যেখানে মতের মিল নেই সেই কথাগুলি পরে বলবেন।

প্রথমেই বিপক্ষ মানুষটিকে হ্যাঁ বলতে দিন। যতদূর সম্ভব তাকে না বলতে দেবেন

না।

অধ্যাপক ওভার স্ট্রীট তাঁর "ইনফ্লুয়েনসিং হিউম্যান বিহেভিয়ার" নামে একটি বইতে এই ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোনো লোক একবার না বলে, তাহলে সেই না-কে হ্যাঁ-তে পরিণত করাটা খুব কঠিন কাজ। কোনো লোক যদি একবার না উচ্চারণ করে, তাহলে তার সমস্ত আত্ম—অহমিকা ঐ শব্দটির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। তাঁকে আর কিছুতেই হ্যাঁ-এর পথে নিয়ে আসা যায় না।

সে হয়তো বুঝতে পারে, এভাবে না বলাটা তার ঠিক হয়নি। তবুও অহমিকাবোধ এতো বেশী থাকে যে সে না-কে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। এটিকেই বোকার মতো আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। আগে অন্য মানুষটিকে হ্যাঁ বলতে সুযোগ দিন। না বলার সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

দক্ষ বক্তারা প্রথমেই বার কয়েক হ্যাঁ বলতে পারেন। এইভাবে তিনি সমস্ত শ্রোতাকে মানসিক দিক থেকে নিজের মতে নিয়ে আসেন। এটা অনেকটা বিলিয়ার্ড বলের মতো। বলটিকে সজোরে ধাক্কা মারুন। এখন কী হবে? সেটি একদিকে ধাক্কা খেয়ে অতি দ্রুত বিপরীত দিকে চলে যাবে।

এই মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যখন কোনো মানুষ একবার না উচ্চারণ করেন, তখন সেই না শব্দটির মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত দেন। ব্যাপারটা বাতিলের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। অবশ্য এই বাতিল করার মধ্যেই তিনি আত্ম-অহমিকা লাভ করেন। শারীরিক যন্ত্র, স্নায়ু পেশী সব কিছুকেই তিনি বাতিল করে দিতে ভালোবাসেন।

আবার যদি কেউ হ্যাঁ বলেন, তাহলে বাধা দেবার কোনো ঘটনাই ঘটে না। শরীরের সমস্ত কোষগুলির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। মনে হয়, এই ভদ্রলোক হয়তো একদিন আমার জন্যে শুভ সংবাদ নিয়ে আসবেন। অথবা তিনি আমার জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন করবেন।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রথমে হ্যাঁ বলবেন। তারপর যদি সত্যি সত্যি না বলার দরকার হয়ে থাকে, তাহলে নেহাত অপারগ হয়ে না উচ্চারণ করবেন।

ব্যাপারটা আমরা সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না। আমরা ভাবি, না বলার মাধ্যমেই আমাদের অহমিকা বোধ প্রকাশিত হয়। আমরা অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারি।

আসলে কিন্তু ঘটনাটা তা হয় না। যেমন, বিপ্লবীরা রক্ষণশীলদের অকারণে চটিয়ে দেয়। এতে এক আশ্চর্য আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইঙ্গিত সফলতা পায় না। এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তাৎক্ষণিক। সফলতাটা অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে ক্রিয়াশীল রাখে।

কোনো ছাত্র, ক্রেতা, শিশু, স্বামী বা স্ত্রীকেই গোড়াতেই না বলতে দিন। দেখবেন হাজার অধ্যবসায়ের মাধ্যমেও আপনি তার মত পরিবর্তন করতে পারছেন না। কোনোদিন সে আপনার সুরে সুর মিলিয়ে হ্যাঁ বলবে না।

এই হ্যাঁ বলার কৌশলটা জানতে হবে। এই কৌশল প্রয়োগ করে নিউইয়র্কের গিনিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জেমস এভারসন তাঁর জীবনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তিনি এক বিখ্যাত মক্কেলকে হারাতে হারাতে আবার সামলে নিয়ে এসেছিলেন।

ঐ ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে এসেছিলেন। মি. এভারসন লিখেছিলেন —আমি তাঁকে একটা ফর্ম ভর্তি করতে বলেছিলাম। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর তিনি আনন্দের সঙ্গে দিলেন।

আগে হলে হয়তো আমি তাঁকে অ্যাকাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হতাম না। আমি বলতাম

—না মহাশয়, সব ক'টি প্রশ্নের সঠিক জবাব না পেলে আমি তো অ্যাকাউন্ট খুলবো না।

ইতিমধ্যে আমি মানবিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি বুঝতে পারছি, হয়তো কোনো কারণে উনি ওনার অতীত জীবন সম্পর্কে সব খবর জানাতে চাইছেন না। তাহলে এখন আমার কী করা উচিত? আমার উচিত আমার মনোভাবকে আর একটু নমনীয় করা। ওনার সাথে কথা বলা। উনি যাতে আরো কিছু তথ্য দেন সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

আমি তাই করতে শুরু করলাম। আমি ঠিক করলাম, একটু বুদ্ধিমানের মতো কাজ করতে হবে। ব্যাঙ্ক ওনার কাছ থেকে কী চাইছে, সে খবর পরে নিলেও চলবে। এখন দেখা যাক, উনি কী চান?

আমি তাই আবার গোড়া থেকে শুরু করলাম। আমি বললাম, ঠিক আছে, যদি আপনার কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে সব খবর দেবার দরকার নেই।

যাই হোক, কিন্তু কয়েকটা বিষয় তো পরিষ্কার হওয়া দরকার। যেমন, উনি, ঈশ্বর না করুন, হয়তো আপনার মৃত্যু হয়ে গেল, তাহলে?

আপনি যে টাকা জমা রাখবেন তার উত্তরাধিকারী কে হবে? ব্যাঙ্কের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনিও কী চাইবেন না, আপনার পরিবারের কেউ এই টাকাটা পান? এবং যিনি পাবেন, তিনি আপনার মনমতো মানুষ হবেন?

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ এডারসনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, কথাটার মধ্যে অনেকটা গুরুত্ব লুকিয়ে আছে। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তা চাইবো।

এবার এডারসন বুঝতে পারলেন, তাঁর টোটকাতে কাজ হতে শুরু হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে? ওনার নামটা তো এখানে বসাতেই হবে স্যার। তা না হলে আমরা কী করে বুঝবো, যে আপনি কাকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেছেন?

তিনি আবার বললেন —হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এরপর ভদ্রলোকের মনোভাব একেবারেই বদলে গেল। এডারসন তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হলেন, তাঁর স্বার্থেই এইসব খবরগুলো দেওয়া দরকার। এর মধ্যে ব্যাঙ্কের স্বার্থ বলতে কিছুই নেই। আমানতকারী টাকা জমা রাখবেন। সেই টাকা তিনি কাকে দেবেন, কী ভাবে সেই টাকাটা দেওয়া হবে, এই খবর না জানালে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরবর্তীকালে কিছু করা সম্ভব হবে না।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে তাঁর সম্পর্কে সমস্ত খবর দিয়েছিলেন। এর ফলে, একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতিকে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। এডারসনের পক্ষেও অ্যাকাউন্ট খোলা সহজ হয়েছিল। বিরোধীতার অবসান ঘটে গেল। একটি পরিসমাপ্তি দেখা দিলো সুখের গ্রেস্কোপটে।

এবার ওয়েটিং হাউসের এক সেলসম্যান যোসেফ অ্যাডিসনের কথা বলা যাক। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন অনেক ছোটো ছোটো মণিমুক্তো লুকোনো আছে।

তিনি বলেছিলেন, একটি প্রতিষ্ঠান একজন মক্কেলকে তাদের পণ্য বিক্রি করতে চাইছিলো। কাজটা হয়তো খুবই সহজ। কিন্তু যে করেই হোক, কাজটা খুব জটিল হয়ে গিয়েছিল। আমার পূর্বসূরী দশ বছর চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমাকে ঐ এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হলো। আমিও তিন বছর ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো অর্ডার যোগাড় করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত কী হলো? ওনার দশ এবং আমার তিন, মোট তেরো বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে আমরা মাত্র কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে পেরেছিলাম। তখনো আমি হাল ছেড়ে দিইনি। আমি জানতাম, যদি আমি আমার কাজে লেগে থাকতে পারি, আর ভাগ্য একটু সহায় হয়, তাহলে আমি সফলতা

অর্জন করবোই।

পরের সপ্তাহে আবার খোলা মনে সেখানে গেলাম। চিফ ইঞ্জিনীয়ার আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর ধরনটা কেমন বাঁকা বাঁকা লাগলো আমার কাছে। তিনি বললেন —অ্যাডিসন, তোমাদের বাকি জিনিসগুলো আমরা মোটেই কিনতে পারবো না।

তাঁর এই কথাতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কেন স্যার? কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলবেন কী?

তিনি বললেন, তোমার মোটরগুলি অল্প কাজ করলেই গরম হয়ে যায়। তখন আমি আর হাত রাখতে পারি না।

আমি মানতাম, এক্ষেত্রে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না। আমার অতীত অভিজ্ঞতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছিল। অর্থাৎ আমাকে সব ব্যাপার মেনে নিতে হবে।

অন্যায়ের সাথে করমর্দন করতে হবে। আমি ঠিক তাই করলাম।

আমি বললাম —ঠিক আছে মি. স্মিথ, আমি আপনার কথা শতকরা একশো ভাগ মেনে নিচ্ছি। যদি এই মোটরগুলি সত্যি সত্যি কাজের অযোগ্য হয়ে ওঠে, তাহলে এগুলো কেনা মোটেই উচিত হবে না। কিন্তু আপনি সেই মোটর তো কিনবেন, যেখানে মোটরগুলো আইন অনুযায়ী বানানো হয়। তাই নাকি।

তিনি স্বীকার করলেন —হ্যাঁ।

এবার আমি ধীরে ধীরে আমার আসল অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করতে শুরু করলাম। মোটর তৈরির ব্যাপারটা আমার খুব ভালোই জানা ছিল। এ বিষয়ে আইনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আমি জানতাম।

আমি বিনীতভাবে বললাম —তাহলে, বৈদ্যুতিক মোটর তৈরীর সমিতি এ ব্যাপারে একটি নিয়ম প্রবর্তন করেছে। আপনি কি সে বিষয়ে অবগত আছেন?

তিনি বললেন —হ্যাঁ, আমি সব কিছু জানি।

তাহলে? ওখানে পরিষ্কার বলা আছে যে মোটর যখন চলমান অবস্থায় থাকে তখন তার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৭২ ডিগ্রি ফারেনহাইট হবে। আর ঘরের তাপমাত্রার সাথে এই তাপমাত্রাকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

তিনি বললেন —তোমাদের মোটর আরো বেশী গরম হয়ে যায়।

আমি জানতাম, তা কখনোই হয় না। কেননা আমাদের প্রতিটি মোটরকে বারবার পরীক্ষা করে, তবেই বাজারে ছাড়া হয়। এ বিষয়ে আমাদের মালিক কোনোরকম আপোস করেন না। তবুও আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে তর্ক জুড়ে দিলাম না।

আমি বললাম —আপনার কারখানার ঘর কোরকম গরম?

উনি বললেন —৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

তাহলে? ঘরের তাপমাত্রা যদি ৭৫ ডিগ্রি হয়, আর তার সঙ্গে আরো ৭২ ডিগ্রি যোগ করেন তাহলে মোট ১৪৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা দাঁড়াচ্ছে, ১৪৭ ডিগ্রিতে যদি হাত রাখেন, তাহলে তো হাতে প্রচণ্ড গরম লাগবে। তাই নয় কী?

এবারও তাঁকে হ্যাঁ বলতে হলো।

আমি বললাম, একটা অনুরোধ করবো?

তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি, আমি এতোক্ষণ তাঁর সাথে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছে।

তিনি বললেন —কী অনুরোধ?

আমি বললাম —স্যার, যখন মোটরটা এতো গরম হয়ে যায়, তখন সেটাকে হাত দিয়ে ধরার কী দরকার আছে।

তিনি বুঝতে পারলেন। কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে। তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করে নিলেন। আরো বেশ কিছুক্ষণ আমরা কথাবার্তা বললাম। তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে ডেকে আরো পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের অর্ডার দিলেন।

তাহলে? বহুলক্ষ টাকার ব্যবসা নষ্ট করার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, একজন ক্লায়েন্টের সাথে কীভাবে কথা বলা উচিত। সেলসম্যানের আসল কাজ হলো, যে করেই হোক ক্লায়েন্টের মুখ থেকে হ্যাঁ এই শব্দটা শোনা। এই কাজে যে সেলসম্যান যতখানি সফল সে তত তাড়াতাড়ি তার মালিকের সুনজরে পড়তে পারে এবং কোম্পানীর আয় বাড়ানোর পথ প্রশস্ত করতে পারে।

সক্রেটিস ছিলেন এথেন্সের একজন তার্কিক মানুষ। চল্লিশ বছরের টাক মাথা মানুষ হয়েও তিনি উনিশ বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় সক্রেটিসের নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে। মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে সক্রেটিস একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। তার মৃত্যুর তেইশ শতাব্দী পরেও তাঁকে সম্মান জানানো হয়। বলা হয় তিনি ছিলেন প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবী।

সক্রেটিসের কৌশলটি কেমন ছিল? তিনি কী সবাইকে বলতেন যে তারা ভুল করেছে। না, সক্রেটিস এ ধরনের মানুষ ছিলেন না। তিনি আরো বেশী চালাক ছিলেন। তাঁর পুরো কৌশলটিকে আমরা সংক্ষেপে সক্রেটিসের পদ্ধতি নামে অভিহিত করতে পারি। এর প্রথমেই ছিল মানুষকে হ্যাঁ বলিয়ে নেওয়া। এর শেষেও ছিল মানুষকে হ্যাঁ বলিয়ে নেওয়া।

তিনি বিরোধীদেরও সহজে তাঁর দলে টানতে পারতেন। তিনি একজন মানুষকে দিয়ে সব স্বীকার করাতেন। বিরোধী হ্যাঁ বলতে বলতে এমন অবস্থায় চলে আসতো, অবাক হয়ে দেখতো, যেসব বিষয় নিয়ে তারা সক্রেটিসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সেগুলোকেও হ্যাঁ বলেছে।

তাহলে আর বিরোধের মূল প্রতিপাদ্য ব্যাপার কোথায় রইলো?

সক্রেটিসের এই তথ্যটা এখনো প্রয়োগ করা যেতে পারে। চীনাদের একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে —যে শান্তভাবে চলে, সে অনেক দূর যেতে পারে।

পাঁচ হাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে তার এই জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে।

তাহলে? মানুষকে যদি জয় করতে চান, আমার পাঁচ নম্বর উপদেশটা মনে রাখবেন —অপর ব্যক্তিকে গোড়াতেই হ্যাঁ বলিয়ে নিন। তাহলে দেখবেন, কোনো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না।

পনের

অভিযোগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন

এই পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কথায় কথায় অভিযোগ করতে ভালোবাসেন। তরকারিতে বেশি নুন হলে তাঁরা তো অভিযোগ করবেনই। নুন ঠিক হলেও তাঁরা বলেন, হায়, আর একটু বেশি ভাগিস দেওয়া হয়নি। তাহলে মুখটা একেবারে তেতো হয়ে যেতো।

তাঁরা গায়ে গা লাগিয়ে ঝগড়া করতে ভালোবাসেন। তাঁদের নিয়ে সমাজে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার সৃষ্টি হয়। তাই, এই অধ্যায়ে আমরা শেখাবো, কীভাবে অভিযোগ করার সময় আরো একটু বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

বেশীরভাগ মানুষ অন্যকে স্বমতে আনতে গিয়ে বড্ড বেশী বকবক করে ফেলেন। বিশেষ করে বিজ্ঞানের প্রতিনিধিরা এই দোষে দোষী। আগে অন্যদের কথা বলতে দিন। নিজের ব্যাপারটা তিনি আপনার থেকে অনেক ভালো জানেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁকে প্রশ্ন করুন তাকে কিছু বলতে দিন। তবেই তো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

হয়তো আপনার সাথে তার মতের মিল হবে না। মনোস্তাত্ত্বিকেরা তাই বলে থাকেন— প্রতিটি মানুষ জীবন এবং পরিবেশ সম্পর্কে একটি পৃথক ধারণা নিয়ে বসবাস করে থাকেন। চট করে এই ধারণা পাল্টানো যায় না। তাই বাধা দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা মারাত্মক। তিনি আপনার কোনো কথাই শুনবেন না। নিজের সবকথা বলা না হলে তার বয়েই গেছে আপনার বকবকানি শুনতে। অতএব প্রথমেই ধৈর্য ধরে তার সমস্যার কথা শুনতে হবে। তাকে সবকিছু বলার সুযোগ দিতে হবে। নিজের কথা শেষ হবার পর তিনি কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাবেন। সব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার ছোঁয়া রাখতে হবে। তবেই তো আপনি এই কাজে সফল হবেন।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই কৌশল কীভাবে কাজে লাগাবেন—দেখা যাক। কয়েকটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক।

কয়েক বছর আগের কথা। আমেরিকার অন্যতম এক মোটর গাড়ি তৈরীর প্রতিষ্ঠানে এই ঘটনাটা ঘটেছিল। গাড়ি সাজানোর কিছু উপকরণের দরকার পড়েছিল। তিনটি বড়ো প্রতিষ্ঠান এর জন্যে কাগজের নমুনা তৈরী করেছিল। সবই মোটর কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীরা পরীক্ষা করলেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এবার জানানো হলো, তারা যেন নির্দিষ্ট দিনে অর্ডার পাওয়ার জন্যে আবেদন পত্র দাখিল করে।

এক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জি বি আর। তিনি যখন ঐ কোম্পানীতে পৌঁছলেন, তখন তাঁর গলায় ব্যথা হয়েছিল। মোটর প্রতিষ্ঠানের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি বললেন —আমার গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি ফিসফিস করে কথা বলতে পারছিলাম না। আমাকে একটি কামরাতে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার পারচেজিং সেলসের প্রধান আর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট পাশাপাশি চেয়ারে বসেছিলেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফিসফিসানি গন্ধ ছাড়া আমার গলা থেকে আর কোনো আওয়াজ বেরিয়ে এলো না।

তারা আমার সামনে উপবিষ্ট ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটুকরো কাগজে লিখতে বাধ্য হলাম —ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা বলার শক্তি নেই। আমি বাকশক্তিহীন।

প্রেসিডেন্ট বললেন —ঠিক আছে, আমি আপনার হয়েই কথা বলছি। তিনি তাই করলেন। তিনি আমাদের কোম্পানীর পাঠানো নমুনাগুলি দেখিয়ে প্রশংসা করলেন। বেশ চমৎকার কথাবার্তার মাধ্যমে সেগুলির গুণ বুঝিয়ে দিলেন। আর যেহেতু প্রেসিডেন্ট আমার পক্ষ নিয়েছিলেন, তাই অন্যরাও আমাকে সমর্থন জানালেন। আমি কেবল মাঝে মধ্যে হেসে মাথা নাড়লাম। আর কিছু করতে পারিনি। আর কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

এই আশ্চর্য সভা এভাবেই শেষ হয়ে গেল। আমি দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অফিসে ফিরে এলাম। আমি ভাবলাম, কিছুতেই বোধহয় আমার মাল অর্ডার হবে না। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, প্রায় একলক্ষ ষাট হাজার ডলারের কাপড়ের অর্ডার দেওয়া হলো। আমার জীবনে এতো বড়ো অর্ডার আমি আর কখনো পাইনি।

আমি জানতাম, আমার গলার সুর বন্ধ না হয়ে গেলে ঐ অর্ডার আমি পেতাম না।

যেহেতু আমার কতগুলো ভুল ধারণা ছিল। আমি গিয়েই জিনিসগুলো কেমন তা নিয়ে চিৎকার করতে শুরু করতাম। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে থাকা ঐ চারজন মানুষকে নিজের মতে আনার আপ্রাণ প্রয়াসে ব্রতী হতাম। তার ফল কী হতো? তার ফল হতো মারাত্মক। তাঁরা ভাবতেন এক বাক্যবাগীশ মানুষ এসে আমাদের সকালটা নষ্ট করে দিয়ে গেলেন। এনার কোম্পানীকে বিশ্বাস করা যেতে পারে? যতটা গুণ তার থেকে বকবকানি বেশী।

তাহলেই দেখছেন পাঠক-পাঠিকারা, গলার স্বর স্তব্ধ না হলে ঐ বিক্রয়ের প্রতিনিধি কিছুতেই তাঁর কাজে সফল হতেন না। এই ব্যাপারটা সবসময় মনে রাখতে হবে।

এবার ফিলাডেলফিয়ার ইলেকট্রিক কোম্পানীর জোসেফ এস ওয়েব-এর কথা বলা যাক। তিনিও একই রকম আবিষ্কার করেছিলেন। একসময় তিনি পেনসিলভেনিয়ার ওয়ান্দাজ কৃষকদের গ্রামে ভ্রমণ করেছিলেন।

মি. ওয়েব জেলার প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করেছিলেন— এরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে না কেন?

জেলার প্রতিনিধি বলেছিলেন, —এরা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ওদের কোনো জিনিস বিক্রি করা সম্ভব নয়। ওরা সেই প্রাচীন মান্ধাতা আমলের জীবনধারাকে আকড়ে ধরে আছে। কোম্পানীর ওপর হাড়ে চটা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি স্যার, কিন্তু সব বৃথা।

ওয়েব ভাবলেন, হতেও পারে, কিন্তু আর একবার চেষ্টা করতে দোষ কী? তিনি একটি খামার বাড়ীর দরজায় ধাক্কা মারলেন। দরজাটা একটুখানি ফাঁক হলো। ভেতর থেকে একটা মুখ বেরিয়ে এলো।

তিনি বৃদ্ধা মিসেস ড্রাকেনব্রড।

মি. ওয়েব বুঝতে পারলেন —ভদ্রমহিলার মন জয় করতে হবে। বাইরে একজন অচেনা অতিথি দাঁড়িয়ে আছে দেখেও ড্রাকেনব্রডের মুখে কোনো ভাবান্তর এলো না। তিনি আমার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করলেন।

মি. ওয়েব বুঝতে পেরেছিলেন, ড্রাকেনব্রডের সাথে জেলার প্রতিনিধির দেখা হয়ে গিয়েছিল। মি. ওয়েব বুঝতে পারলেন, কোনো কারণে ঐ বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা জেলার প্রতিনিধিকে সহ্য করতে পারছেন না।

একটুখানি চিন্তা করে মি. ওয়েব আবার দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজাটা আবার খুলে গেল। তিনি বললেন —মিসেস ড্রাকেনব্রড, আমি দুঃখিত। আমি ঝামেলার সৃষ্টি করেছি। তবে একটা ব্যাপার সুনিশ্চিত, এবার কিন্তু আমি বিদ্যুৎ বেচতে আসিনি। আমি ক'টা ডিম কিনতে চাইছিলাম।

মিসেস ড্রাকেনব্রড অবাক হয়ে গেলেন। তিনি একটু ফাঁক দিয়ে সন্দেহ ভরা চোখে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন।

তখনো মি. ওয়েব বলে চলেছেন —দেখলাম, আপনার বাড়ির খামারে কয়েকটা চমৎকার ডোমিনিক জাতের মুরগী খেলা করছে। কয়েক ডজন টাটকা ডিম পাবো কি?

এবার দরজাটা আর একটু খুললো।

ভদ্রমহিলার আগ্রহ জেগে উঠলো। তিনি জানতে চাইলেন —এগুলো যে ডোমিনিক জাতের, আপনি কী করে বুঝলেন?

মি. ওয়েব জবাব দিলেন —আমি যে মুরগী পালন করি। তবে একটা কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। এমন সুন্দর ডোমিনিক মুরগী আমি কোথাও দেখিনি। আপনি নিজেই এগুলো দেখাশুনা করেন তাই না কি?

ভদ্রমহিলার তবুও সন্দেহ গেল না। তাহলে নিজের মুরগীর ডিম নিজে করেন না কেন?

আমার লে হর্নগুলো সাদা ডিম পাড়ে। আর আপনার অবশ্যই জানা আছে, সাদা ডিমের থেকে লাল ডিম দিয়েই ভালো কেক তৈরী হয়। আমার স্ত্রী আবার চমৎকার কেক বানাতে পারেন।

শুরু হলো এস ওয়েবের আসল খেলা। ধীরে ধীরে তিনি ভদ্রমহিলার মন জয় করলেন।

ইতিমধ্যে মিসেস ড্রাকেনব্রড বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বেশ ভালো ব্যবহার করার জন্য তৈরি হয়েছিলেন তিনি। মি. ওয়েব ভেতরে ঢুকলেন। চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। চমৎকার একটা ডেয়ারী তৈরী হয়েছে।

তিনি আরো বললেন— আমার কিন্তু মনে হয়, আমি বাজি ধরতে পারি। আপনি আপনার স্বামীর দালালির চেয়ে এই মুরগীর থেকে আরো বেশী টাকা রোজগার করেন।

এটাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বেশী আয় করেন। সেই কথাটা ফলাও করে মি. ওয়েবকে বলতে চাইলেন। তবে বড়ো দুঃখের কথা, তাঁর স্বামীর মাথায় এই সরল সত্যটা কিছুতেই ঢোকে না। তিনি প্রচণ্ড আত্মম্ভরী এবং অহঙ্কারী। পদে পদে মিসেসকে হেয় করার চেষ্টা করেন।

ভদ্রমহিলা দুই ভদ্রলোককে তাঁর মুরগীর খোঁয়াড়ে নিয়ে গেলেন। মি. ওয়েব সবকিছু পরীক্ষা করে দেখলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, মহিলা নানা ধরনের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আন্তরিকভাবে সব কিছুর প্রশংসা করলেন। তাঁকে কিছু কিছু উপদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা আরো সহজ সরল হয়ে উঠেছেন। তিনি আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আমার পাশের বাড়িতে একজন মুরগীর খামারে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করেছেন। এতে কী কোনো লাভ হয়?

এর ফল কী হলো? দু'সপ্তাহ বাদে আবার মি. ওয়েবের সাথে মিসেস ড্রাকেনব্রডের দেখা হলো। মি. ওয়েব দেখলেন, মুরগীর খোঁয়াড়ে মুরগীগুলো আনন্দে কোঁকর কোঁকর কোঁ করে ডাকছে। তিনি অনেক অর্ডার পেয়েছিলেন। আর ডিমও কিনতে থাকেন। দু'জনেই সুখী হয়েছিলেন। একজন বিদ্যুৎ বেচে এবং অন্যজন ডিম বেচে।

এই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা থেকে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি? তাহলো, কখনোই কোনো লোকের ওপর নিজের অনুভূতি চাপিয়ে দেবেন না। আগে তাকে মুখ খুলতে দিন। তাঁর সমস্যাগুলো আন্তরিকভাবে শোনার চেষ্টা করুন। তারপর যদি মনে হয়, সমাধানের কোনো রাস্তা আপনার হাতে আছে, তবেই তার সাথে সমাধানের গল্প বলবেন। তা না হলে চুপটি করে থাকুন। সবকিছু শুনে চোখ বন্ধ করে চলে আসুন।

এই ঘটনা থেকে আমরা হয়তো নীচের আপ্ত বাক্যটি স্মরণ করতে পারি—পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাদের কিছুই বিক্রি করা যায় না। তবুও অপেক্ষা করতে হবে, কখন তারা আপনার কাছ থেকে কিছু কেনার জন্য অর্ডার দেবেন।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক হেরাল্ড টি পত্রিকার অর্থনৈতিক পাতায় একটি বড়ো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, অসামান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন মানুষ দরকার।

চারলি টি কুর্বোলিস এই বিজ্ঞাপনের উত্তর পাঠিয়েছিলেন। একটি নির্দিষ্ট বক্স নম্বরে। কিছুদিন বাদে তাঁকে চিঠি পাঠানো হলো। বলা হলো, তিনি যেন অমুক সময়ে সাক্ষাতকারের জন্যে যান।

চারলি কী করলেন? তিনি প্রথমে ওয়াল স্ট্রীটে গেলেন। সেখানে গিয়ে ঐ কোম্পানী সম্পর্কে সবকিছু জানলেন। তারপর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বললেন —আপনার মতো বিরাট সুনাম যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ডাকে আসতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে অত্যন্ত

সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। যদি কোনোভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি যুক্ত হতে পারি তাহলে আমার সৌভাগ্য আকাশ ছুঁয়ে যাবে। আমি শুনেছি, আঠাশ বছর আগে আপনি মাত্র একটি ডেস্ক আর একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এটা কি সত্যি? রূপকথার গল্পের মতো আপনার এই উত্তরণ ঘটলো কেমন করে?

✓প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে একটি দুর্বল জায়গা আছে। তা হলো, ফেলে আসা অতীতের স্মৃতিচারণ করা। পথের ধারে শুয়ে থাকা ভিখারী থেকে রাজপ্রাসাদের মালিক পর্যন্ত সকলেই এক অদ্ভুত মেষ মেদুরতায় ভোগে। এইবার শুরু হলো ঐ ভদ্রলোকের ভেঙে পড়ার পালা।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। বললেন, কীভাবে মাত্র চারশো ডলার আর একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। কীভাবে প্রতিদিন অনন্ত হতাশা এবং নিরন্তর অপমানের সাথে লড়াই করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন। তারা ষোলো ঘণ্টা করে কাজ করেছেন। প্রতিটি রবিবারেও অফিসে এসেছেন। আজ কীভাবে তিনি ওয়ালস্ট্রীটের সব থেকে বিখ্যাত মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এই ধরনের রেকর্ডের জন্যে তিনি গর্বিত। এই গর্বে তাঁর অধিকার আছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি কুবেলিসকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন। এমন কী তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টকে ডেকে বললেন —আমরা এই ধরনের একজন মানুষকেই খুঁজছিলাম।

মি. কুবেলিস সহজ ভাবেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়োগ কর্তার সম্পর্কে সবকিছু জেনে নিয়েছিলেন। আর তাঁর দেওয়া শর্তগুলি পালন করেছিলেন। এইভাবেই তাঁরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

✓সত্যি কথা হলো, যার সাথে আপনি দেখা করছেন তার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব কিছু জানা থাকলে কথা বলতে খুবই সুবিধে হয়।

✓একজন ফরাসী দার্শনিক লা রোসফোকো বলেছিলেন— আপনি যদি শত্রু চান তাহলে বন্ধুদের অতিক্রম করুন। আর যদি বন্ধু চান তাহলে কী করবেন? তাহলে দেখুন, বন্ধুরা যেন আপনাকে অতিক্রম করে যায়।

কথাটার মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। যখন বন্ধুরা আমাদের অতিক্রম করে থাকেন, তখন তাঁদের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি। আর যখন আমরা বন্ধুদের অতিক্রম করে চলে যাই, তখন তাঁদের মনের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা এবং চাপা ঈর্ষার জন্ম হয়।

✓জার্মানিদের মধ্যে একটি প্রবাদ খুবই জনপ্রিয়। সেটি হলো এইরকম —অন্য লোকেদের বিপদে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহল আসল আনন্দ। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে —অন্যের বিপদে আমরাই আসল আনন্দ পেয়ে থাকি।

✓এই কথাটি জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনে রাখবেন। আপনাদের কোনো কোনো বন্ধু আপনাদের কানেলায় যত বেশী আনন্দ পান, আপনাদের সুখে তার একশো ভাগের একভাগ পান না। কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু এটাই হলো জীবনের স্বীকৃত সত্য। যিনি যত তাড়াতাড়ি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তিনি জীবনে চলার পথে তত তাড়াতাড়ি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন।

অর্থাৎ, জয়কে করায়ত্ত করতে গেলে কী করতে হবে? আসুন, আমরা সেই পথের পথিক হই। আমরা আরো নম্র হবো। আমরা সব সময় কাজ করবো। আব্রাহাম লিঙ্কনের আসল কৌশলটা জানা ছিল। একজন আইনজ্ঞ একবার লিঙ্কনকে সাক্ষীর কাঠগড়াতে বলেছিলেন —আপনি আমেরিকার এক বিখ্যাত লেখক, কী তাই তো? এটা কি সত্যি?

লিঙ্কন নম্রভাবে জবাব দিয়েছিলেন, আমার যোগ্যতার থেকে অনেক বেশী সম্মান আমি

পেয়েছি। তাই বিখ্যাত কী অখ্যাত, এই সব বিশেষণে নিজেকে ভূষিত করতে চাইছি না।

আমাদের নম্র হওয়া উচিত। সব সময় মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীতে আমি যে অবস্থানে আজ দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে আমরা নিজস্ব কৃতিত্বের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও কম দায়ী নয়। হয়তো পরিবেশ এভাবে আমাকে সাহায্য না করলে আজ আমি কোথায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতাম।

আরো একটা সত্যি কথা মনে রাখা দরকার। আগামী এক শতকের মধ্যে সকলে আমাকে ভুলে যাবে। নিজের কৃতিত্ব জাহির করার পক্ষে এ জীবনটা বড্ড ক্ষণস্থায়ী। তাই অন্যকে কথা বলতে দিন। সবসময় ভাববেন, নিজের প্রশংসা পাবার মতো কোনো কিছু আপনি অর্জন করেছেন কিনা?

আপনার সঙ্গে একজন মূর্খের পার্থক্য কতটুকু, সেটা কি আপনি বোঝেন? বেশী নয়। জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের এক আলপিন নিকেল মাপের আয়োডিন। কোনো চিকিৎসক যদি আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এই আয়োডিনটা বের করে নেয় তাহলে আপনি মূর্খের মতো আচরণ করবেন। সামান্য এক টুকরো আয়োডিনই সবকিছু বদলে দিয়েছে। তাই তার জন্যে গর্ব করে কী লাভ?

✓আসুন, এবার আমি মানুষের মন জয় করার ছ'নম্বর নিয়মটা শিখিয়ে দিই —তাহলো, অপর ব্যক্তিকেই বেশী কথা বলতে দিন।

ষোল

কীভাবে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে

আপনি নিজে যা আবিষ্কার করেন তার ওপর আপনার বিশ্বাস আছে কি? নাকি অন্য লোক আপনাকে যা জানায়, সেটা আপনি অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন?

এই সহজ সরল প্রশ্নটার উত্তর দিলে আপনি মানুষ চরিত্র সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবেন। এই পৃথিবীতে এটাই হলো স্বীকৃত সত্য। তা হলো, আমরা সবসময় নিজের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করি। যদি সেটা ভুলও হয়ে থাকে, তাহলেও সেটাকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। তাইতো ইচ্ছে করে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা না করাই ভালো।

এখানেও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ফিলাডেলফিয়ার মি. অ্যাডলফ সেলৎজ একসময় আমার ক্লাসের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি বিক্রয় প্রতিনিধিদের আরো বেশী উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একবার সেলসের একটা সভা ডেকেছিলেন। সকলের মতামত নিয়েছিলেন। আর এক একটি মত ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে থাকেন। তারপর তিনি বলেন —আপনারা আমার কাছে যা চাইছেন, তাই পাবেন। এবার আমাকে বলতে দিন। আমি একজন মালিক হিসাবে আমার সেলসম্যানদের কাছ থেকে কোন্ কোন্ গুণ আশা করছি!

উত্তর চলে এলো। সকলেই চিৎকার করে বললেন —বশ্যতা, সততা, কর্মচেষ্টা, সাধুতা, দলবদ্ধতা, সারাদিন আট ঘণ্টা কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ নিজের থেকে আবার চোদ্দ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল। এবার নতুন উদ্যম আশায় কাজ শুরু হলো। মি. সেলৎজের বিক্রি দারুণভাবে বেড়ে গেল।

মি. সেলৎজ বুদ্ধি করে এই সভার পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কিন্তু নিজস্ব মতামত

সেলসম্যানদের ওপর, চাপিয়ে দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি। তিনি ওদের মুখ খুলতে দিয়েছিলেন। আর তাতেই দেখা গেল, এক-একজন, বিক্রয় প্রতিনিধি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী সুন্দর স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সেই স্বপ্নকে সফল করার উপায়টা না জানা থাকায় সে শেষ পর্যন্ত বিফল হয়ে যায়।

মি. সেলংজ আসল জায়গাতেই আঘাত করলেন। তিনি স্বপ্নকে আকাশচুম্বী করে দিলেন।

কোনো মানুষই ভাবতে চায় না যে তাকে কিছু বিক্রি করা হয়েছে। অথবা তাকে কোনো কিছু করতে বলা হয়েছে। আমরা সবসময় এই কথা ভেবে আনন্দিত হই, আমরা নিজের ইচ্ছাতেই ওটা কিনেছি। অথবা নিজের ইচ্ছাতেই কাজ করতে চাই। নিজের ইচ্ছা বা ধরনের ওপর আমাদের এতোখানি বিশ্বাস লুকিয়ে আছে।

যেমন ইউনিয়ন ওয়েসনের ব্যাপারটাই দেখা যাক। তিনি লক্ষ লক্ষ ডলার লোকসান দিয়েছিলেন। তিনি কাপড় তৈরির প্রতিষ্ঠানে নক্সার জন্যে ছবি আঁকতেন। তিন বছর ধরে ঐ প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করেছেন। তাঁর একটি ছবিও বিক্রি হয়নি। ঐ কোম্পানীর চেয়ারম্যান বার বার মি. ওয়েসনের ছবি দেখতেন, আর বলতেন, না, এতে হবে না। এইটা এমন ভাবে পাল্টাতে হবে।

দেড়শো বার ব্যর্থ হবার পর মি. ওয়েসন বুঝতে পারলেন, হয়তো তাঁর কর্ম পদ্ধতির মধ্যেই কোনো আদি গলদ রয়ে গেছে। এভাবে কাজ করলে তিনি কখনোই কোনো সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের মন জয় করতে পারবেন না। একদিন সন্ধ্যায় তিনি মানবিক ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভাবতে নতুন পথের পথিক হলেন।

রাতে তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি এবার ছবিগুলি সম্পূর্ণ করলেন না। প্রতিটি ছবি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে দিলেন। পরের দিন সকালে সেগুলি নিয়ে গেলেন সম্ভাব্য ক্রেতার অফিসে। গদগদ কণ্ঠস্বরে বললেন —মি. এফ, আমার এই ছবিগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে। আপনি যদি বলেন, কিভাবে সম্পূর্ণ করবো তাহলে কাজের খুব সুবিধা হয়।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। এ তো এক নতুন কায়দা। বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করার চিন্তা।

তিনি বললেন —ঠিক আছে। এগুলো আমার কাছে কয়েক দিনের জন্যে রেখে যান মি. ওয়েসন। ক'দিন পর দেখা করবেন।

ওয়েসন অপেক্ষা করতে থাকেন দুরুদুরু বুকে। মনের ভেতর আশা-নিরাশার দোলা। নির্দিষ্ট দিনে আবার তিনি চেয়ারম্যানের ঘরে গেলেন। চেয়ারম্যান পরামর্শসহ ছবিগুলো ফেরত দিলেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী ওয়েসন আঁকা শেষ করলেন। তারপর কী হলো? তাঁর সবকটি ছবি সাদরে গৃহীত হলো।

ন-মাস আগেকার কথা। এখন তিনি সারাদিন এতো অর্ডার পাচ্ছেন যে এঁকে এঁকে হাত ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। ওয়েসন কমিশন হিসাবে ষোলোশোর বেশি ডলার করে আয় করছেন। আমাকে একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এবার আমি আমার আসল খুঁতটা ধরতে পেরেছি। এতোদিন আমি আমার ইচ্ছেটা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। এখন চেয়ারম্যানের ইচ্ছেতেই আমি ছবি আঁকছি। অতএব, তিনি আর না বলতে পারছেন না।

এটাই হলো আসল কথা। এই কথাটা ভালোভাবে মনে রাখলে বিক্রি করার কাজে আপনি আশাতীত সাফল্য লাভ করবেন। কেননা, আপনি মনে রাখবেন, যদি আপনি বিক্রেতার ভূমিকাতে অবতীর্ণ হন, তাহলে পদে পদে আপনাকে ঠকতে হবে। আপনি একজন

ক্রেতা সাজুন। কীভাবে? যখন কোনো মানুষকে কিছু বেচতে যাবেন তার কাছ থেকে তার বুদ্ধি ক্রয় করুন। তার জীবনীশক্তি, তার ইচ্ছা, তার অনিচ্ছে, তার বিরক্তি, তার ঘৃণা। তাহলেই দেখবেন ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং আপনি কখন তার অজান্তে তাকে অনেক কিছু গছিয়ে দিয়েছেন। সে বেচারী বুঝতেই পারছে না।

থিওডোর রুজভেল্ট যখন নিউইয়র্কের গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করতেন। তিনি বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতেন। শুধু কথার কথা নয়, যখনই কোনো উঁচু পদ খালি হতো, তিনি প্রথমেই বিরোধী নেতাদের ডাকতেন। তাঁদের আহ্বান করতেন। এই পদে যোগ্যতম একজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতেন।

হয়তো কেউ মিস্টার ক-এর নাম প্রস্তাব করতেন। অমনি রুজভেল্ট বলতেন, না, উনি খুব ব্যস্ত মানুষ। ওনাকে এই পদে বসালে ওনার রাজনৈতিক ক্ষমতা কমে যাবে। জনসংযোগের জন্যে উনি আর উপযুক্ত সময় পাবেন না।

বিরোধীরা তাঁর কথার সারবত্তা বুঝতে পারতেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত খ-এর নাম প্রস্তাব করতেন।

অমনি রুজভেল্ট বলতেন—শ্রীযুক্ত খ? তিনি তো শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাঁর পক্ষে এই কাজটা করা কি সম্ভব হবে?

এই ভাবে শ্রীযুক্ত গ, শ্রীযুক্ত ঘ বাতিল হবার পর শ্রীযুক্ত ঙ-কে রুজভেল্ট তাঁর পদে বসাতেন। এতে কী হতো? এতে বিরোধী দলের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বজায় থাকতো। তিনি তাদের চাপিয়ে দেওয়া প্রথম নামটি গ্রহণ করতেন না। আবার বিরোধীরা ভাবতেন, রুজভেল্ট বোধহয় সত্যি সত্যি তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তা না হলে তিনি তো তাঁর দলের কাউকে ঐ পদের জন্যে মনোনীত করতে পারতেন। তাহলে? রুজভেল্ট কতো কুশলী খেলোয়াড় ছিলেন, বুঝতে পারছেন তো!

এক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে, যে কোনো কাজ করার সময় বিরুদ্ধ পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সেই পরামর্শ মতোই যে আপনি বলবেন, এমনটি হবে না। আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে। ওদের সখ্যতা অর্জিত হবে। এভাবেই তো আপনি জীবনের এক সফল কৃতি পুরুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন।

এবার লন্ড আহিল্যান্ডের একটি কথা বলি। একজন গাড়ির দালাল তার জিনিস বিক্রি করতে গিয়ে একই কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক বিভিন্ন গাড়ির কারবার করতেন। দেখা গেল, তিনি আর কোনো গাড়ি শেষ পর্যন্ত আর বিক্রি করতে পারছেন না। সম্ভাব্য ক্রেতা প্রতিটি গাড়িতেই ত্রুটির পর একটি খুঁত বের করছেন। কোনোটি নড়বড়ে, কোনোটির চাকা বসে যাচ্ছে, কোনোটির দাম বড্ড বেশী।

এই অবস্থায় বিহ্বল হয়ে ঐ ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার কাছে কিছু সাহায্য চাইলেন। আমি তাঁকে সেই পুরোনো প্রবাদটাই আবার শুনিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম—মিস্টার, আপনি গাড়িটা বিক্রি করার কোনোরকম চেষ্টা করবেন না। দেখবেন আপনার ক্লায়েন্ট কখন এটা কিনে নিয়ে যাবে। কী ভাবে একজন অনিচ্ছুক মানুষকে ইচ্ছুক মানুষে পরিণত করতে হয় তার কিছু ওষুধ আমার জানা ছিল। আমি সাবধানে সন্তর্পণে ঐ ভদ্রলোককে সেই ওষুধগুলো বলেছিলাম।

এবার কাজ শুরু হলো। পরবর্তী ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার সময় উনি নিজেকে একেবারে পাল্টে ফেললেন। তিনি সোজাসুজি বললেন—স্যার, এই গাড়িটার কত দাম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করছেন। দেখুন তো, এর মধ্যে কোনো খুঁত আছে কিনা। তাহলে আমি সেগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করবো।

যে ক্রেতা এসেছিলেন, তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন খুবই খুঁতখুঁতে। ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলি গ্যারেজ ঘুরে এসেছেন। সব জায়গায় বিক্রয় প্রতিনিধির মুখের লম্বা চওড়া শব্দ শুনে রেগে গেছেন। কিন্তু এখানে এসে তার মনটা একেবারে পাল্টে গেল।

এমন একজন দালালের সাথে কথা বলতে ভালোই লাগলো তাঁর। তিনি অনেক উপদেশ দিলেন। মিস্টার সবকিছু শুনলেন। শেষ পর্যন্ত শান্ত মুখে বললেন—স্যার, আমাকে মাত্র সাতটা দিন সময় দিন। আমি আপনার মনের মতো করে গাড়িটাকে সাজিয়ে দেবো। তারপর আপনি এটা নেবেন তো?

ক্রেতা ভদ্রলোক আরো খুশী হলেন। তাঁর মুখে এক গাল হাসি দেখা দিলো। তিনি পকেট থেকে হাত দিয়ে বেশ কিছু ডলার বের করলেন। মিস্টারের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—আহা, আপনি আমার মুখের কথায় কাজ করবেন কেন? এটা আমার হিসাবে রাখুন। আমি কথা দিচ্ছি, ঠিক সাতদিন বাদে এসে এই গাড়িটা আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাবো। কিন্তু হ্যাঁ, আবার একগাল হেসে তিনি বললেন, আমি যেমনটি বলেছি, তেমনটি করতে হবে কিন্তু। বুঝতেই তো পারছেন, আমার স্ত্রীকে উপহার দেবো। কোথাও কোনো খুঁত থাকলে সে কিন্তু চলে যাবে।

এবার মিস্টার কাজ শুরু করলেন। সাতদিন পর গাড়িটি সুন্দর করে সাজিয়ে ক্রেতাকে দিলেন। উভয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, পরে যখনই কোনো ক্রেতা আসতেন, মিস্টার এভাবেই তাঁর সাথে ব্যবহার করতেন। সেই ক্রেতার মাথায় বিচারকের পোশাক চাপিয়ে দিতেন। ক্রেতা ভদ্রলোক আর কী করেন? আমতা আমতা করে গাড়ি সম্পর্কে নানা কথা বলতে থাকেন। আখেরে মিস্টারের লাভ হতে থাকে।

এবার এক রঞ্জনরশ্মি প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রধানের কথা বলি। তিনি ব্রুকলীনের সবথেকে বড়ো হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তাঁর কোম্পানীর তৈরী ঐ রঞ্জনরশ্মি বিক্রি করার জন্য। তাঁর আসল নামটা আমরা সঙ্গত কারণেই উহ্য রাখছি। তাঁকে আমরা মিস্টার এক্স নামে ডাকবো। এবং হাসপাতালে যিনি রঞ্জনরশ্মি বিভাগের দেখাশোনা করতেন, তিনি হলেন ডঃ এল। তিনি ইতিমধ্যে পাগলের মতো অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। একের পর এক কোম্পানীর দালালরা এসে নিজস্ব ফার্মে তৈরী রঞ্জনরশ্মি সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে নানা গল্প কথা শোনাচ্ছেন। সত্যি সত্যি কারটা কেনা উচিত, ডঃ এল বুঝতে পারছেন না।

এবার আসরে এলেন মি. এক্স। মানব চরিত্র সম্পর্কে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি একটা নতুন ধরনের চিঠি লিখলেন। চিঠিটা ছিল এই রকম—

আমাদের কারখানা সম্প্রতি এক নতুন ধরনের এক্সরে যন্ত্র বানিয়েছে। এই মেশিনের প্রথম চালান সবেমাত্র আমাদের অফিসে এসে পৌঁছেছে। তবে সেগুলো সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। আমরা এখনো এই মেশিনটির উন্নতিসাধন করতে চাইছি। আমরা আপনাকে আহ্বান করছি, আপনি যদি আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা আমাদের হাতে তুলে দেন, তাহলে আমরা আমাদের এই নতুন মেশিনের কর্মকুশলতা আপনাকে দেখাতে পারি। আপনাকে আরো বেশী করে সেবা করতে পারি। যদি আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন। সেক্ষেত্রে আমরাই না হয় এখান থেকে গাড়ির বন্দোবস্ত করবো।

ডঃ এল এই চিঠিটা পেয়ে অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করলেন। এর আগে কোনো রঞ্জনরশ্মি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে এ ধরনের চিঠি পাঠাননি। কেউ তাঁর মতামতের গুরুত্ব দেননি। এতে নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। সপ্তাহের প্রতিটা মুহূর্তে তাঁকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি

একদিন রাতের ডিনার বাতিল করেছিলেন। ঐ যন্ত্রটা দেখার জন্য মি. এক্স-এর কারখানায় এসে পৌঁছলেন। যখনই যন্ত্রটা উনি দেখলেন, তার গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান হলো, উনি ভাবলেন, এর থেকে ভালো যন্ত্র পৃথিবীতে আর হতে পারে না।

তাহলে কী হলো? মি. এক্সকে আর হাত করতে ডঃ এলের সামনে এসে বসতে হলো না। ডঃ এলই তাঁর একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হয়ে গেলেন। অর্থাৎ যন্ত্রটাকে আর বিক্রি করতে হলো না। ডঃ এল সেটা নিজের তাগিদে কিনে নিয়ে গেলেন।

উড্রো উইলসন তখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে হোয়াইট হাউসে বসে আছেন। কর্নেল এডওয়ার্ড এল তাঁর ডান হাত হয়ে উঠেছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। উইলসন নানা বিষয়ে কর্নেলের ওপর নির্ভর করতেন। ক্যাবিনেটের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাঁর এতো সুন্দর সম্পর্ক ছিল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কর্নেল কীভাবে উইলসনের মতো একজন ধুরন্ধর মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন? সেই খবরটাও আমরা জানতে পেরেছি। কেননা তিনি নিজেই এইকথা আর্থার ডি হাউডেন স্মিথকে বলেছেন। স্মিথ সেটা দি স্যাটারডে ইভিনিং পোস্টে একটি প্রবন্ধ মারফত সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এডওয়ার্ড এম যা বলেছিলেন তা হলো এই রকম—প্রেসিডেন্টের সাথে মেলামেশা করে আমি তাঁর চরিত্রের একটা দুর্বল দিক আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলাম। সেটা হলো, প্রেসিডেন্টের মনের মধ্যে একটি ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে হবে। কথায় কথায় রঙ্গরসিকতায় তা করা সম্ভব।

এটা এমন ভাবে করতে হবে, যাতে প্রেসিডেন্ট কিছুতেই বুঝতে না পারেন, আমার আসল উদ্দেশ্যটা কী।

প্রথমবার একটি দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই অঘটনটা ঘটে গেল। আমি হোয়াইট হাউসে গিয়ে একটি বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাতিল করে দিলেন। আর ক'দিন বাদে ডিনারের টেবিলেই আমার দেওয়া উপদেশকে তিনি নিজের বলে চালিয়ে দিলেন।

আমি তখনো তাঁর বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলিনি। কেননা, আমি সে ধরনের মানুষ ছিলাম না। আমি আরো বেশী কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করলাম। আমি প্রশংসার জন্য লালায়িত ছিলাম না। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল, কীভাবে সাফল্যকে করায়ত্ত করা যেতে পারে। আমি উইলসনের সাথে ঝগড়া করলাম না। আমি বললাম—স্যার, এই মন্তব্যটা তো ভারী সুন্দর হয়েছে।

আমি আরো কিছু বেশী করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি সকলের সামনে উইলসনকে প্রশংসা করলাম।

এই কথা মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁদের বেশীর ভাগই উইড্রো উইলসনের মতো। তাঁরা আপনার কোনো একটি বাক্য শুনে প্রথমে দু'পাশে মাথা নাড়বেন। অর্থাৎ এমন ভাব দেখাবেন, তিনি এটা মেনে নিতে পারছেন না। তারপর হয়তো বন্ধু মহলে গিয়ে এই বক্তব্যের সমর্থনে গলা কাটাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার কী করা উচিত? আপনিও তার তালে তাল মিলিয়ে প্রশংসাবাণী ছড়াতে থাকুন। তাহলে মানুষকে সহজেই জয় করতে পারবেন।

এবার নিউব্রানস উইকের এক ভদ্রলোকের কথা বলা যাক। ক'বছর আগে তিনি এই কৌশলটা কাজে লাগিয়েছিল। তখন আমি নিউব্রানস উইকে গেছি মাছ ধরতে। ভাবছি এখানকার সুন্দর সুন্দর জেলে নৌকো বিহার করা যায় কিনা। ট্যুরিস্ট ব্যুরোর সাথে

যোগাযোগ করলাম। আমার নাম আর ঠিকানা ওদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করলাম। এর ফল হলো মারাত্মক। শ'য়ে শ'য়ে চিঠি আসতে আরম্ভ করলো। সকলেই এক একটি শিবির খুলেছে। কোনটি যে ভালো হবে তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমার তখন বিহ্বল অবস্থা। কোন্‌টিকে পছন্দ করবো কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না।

ইতিমধ্যে এক শিবিরের মালিক বুদ্ধি করে সুন্দর একটি কাজ করলেন। তিনি নিউইয়র্কের বেশ কিছু নামী মানুষের ফোন নাম্বার আর ঠিকানা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন, মহাশয়, এইসব বিখ্যাত মানুষদের সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তাই চিঠির সাথে ওনাদের নাম আর ঠিকানা পাঠালাম। ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম। আপনি যদি অনুগ্রহ করে একটু ফোন করেন তাহলে আমার কথার যথার্থতা বুঝতে পারবেন।

ঐ তালিকাতে এমন কয়েকটি নাম ছিল, যেগুলি আমার খুবই পরিচিত। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাদের টেলিফোন করলাম। এই শিবিরে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা কেমন, তা জানতে চাইলাম। তাঁরা সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

তাহলে কী দাঁড়ালো? আমি সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভদ্রলোককে ফোন করে ডেকে আনালাম। তারপর ব্রানস উইকের দিনগুলো আমি ওনার শিবিরেই অতিথি হয়েছিলাম।

এ থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি? আমরা সকলে যখন কোনো জিনিস বিক্রি করার চেষ্টা করি, তখনই পদে পদে আমাদের হোঁচট খেতে হয়। আর ঐ ভদ্রলোক কী করলেন? তিনি নিজেকেই আমার কাছে বিক্রি করলেন। আর কখন জিতে নিলেন আমার হৃদয়, আমার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, আমার সীমাহীন উচ্ছ্বাস এবং পকেট থেকে উপচে পড়া ডলারকে।

পঁচিশ শতাব্দী আগে বিখ্যাত চীনা ব্যক্তি লাওসে যা বলেছিলেন তা বোধহয় এখনো প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তিনি বলেছিলেন—নদী আর সাগর নীচে অবস্থান করে। পাহাড়ী নদীগুলো থাকে তাঁদের বুকের ওপর। তবুও কী হয়? নদী আর সাগর পাহাড়ী নদীর জলে পরিপুষ্ট হয়।

জ্ঞানী মানুষেরা একই ভাবে নীচে অবস্থান করেন। অজ্ঞানরা থাকেন পাহাড়ের উপর। এর ফলে কী হয়! অজ্ঞান মানুষের সমস্ত অজ্ঞানতা জ্ঞানী মানুষেরা ধারণ করেন। অথচ এই ভার বহনের আসল কৌশল কাউকে বলেন না।

অপরকে জয় করার সাত নম্বর নিয়মটি হলো—অপর ব্যক্তিকে ভাবতে দিন। এই কৌশলটা তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত।

সতের

এমন কিছু নিয়ম আছে যা আপনাকে অবাক করে দেবে

মনে রাখবেন, অপর ব্যক্তি হয়তো সম্পূর্ণ ভুল করতে পারেন। কিন্তু নিজের ভুল তিনি কখনো স্বীকার করবেন না। একথাটা আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, কেননা এর মধ্যেই মানুষের চরিত্রের একটা সূক্ষ্ম রহস্য লুকিয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে জগতের সবথেকে শ্রেষ্ঠ আর সেরা ব্যক্তি বলে ভাবতে ভালোবাসেন। বুদ্ধিমান সহনশক্তি সম্পন্ন

মানুষ থেকে গোঁয়াড় গোবিন্দ সকলেই। এই ব্যাপারে কেউ কাউকে অতিক্রম করতে পারেন না।

সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো? আমরা সততার মধ্যে দিয়ে পথ পরিক্রমণ করবো।

সবসময় নিজেকে অন্যের অবস্থানে রাখবেন। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করবেন। সে কোন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছে, সেটা বুঝতে না পারলে আপনি কখনোই তার সাথে সুব্যবহার করতে পারবেন না। আপনি ভাববেন, আমি যদি ঐ জায়গাতে থাকতাম, তাহলে কী কথা বলতাম।

এর ফলে আপনার মন আরো উদার হবে। আপনি আসল কারণটা খুঁজে বের করতে পারবেন। ঐ মানুষটির মন জয় করার উপায় মুঠোবন্দী করতে পারবেন। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা ক্রমশই বাড়তে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কেনেথ ইনগুডের লেখা হাউ টু ডান পিপল ইনটু গোল্ড বইয়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদের কথা বলতে পারি।

উনি লিখেছেন—এক মিনিট অপেক্ষা করে দেখুন, অন্য ব্যক্তিটির কাছে আপনার গুরুত্ব কতখানি আছে। এবার তুলনা করতে শুরু করুন। পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি নিজেকে এই অবস্থায় বসিয়ে রাখেন, তাহলে অতি সহজেই তিনি নিজের মূল্যায়ন করতে পারবেন। লিঙ্কন আর রুজভেল্টের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যখনই কোনো লোকের সাথে কথা বলবেন তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত পরিস্থিতির বিচার-বিবেচনা করবেন। তাহলেই আপনার কাজের মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগবে। আপনার আবেগ আরো অন্তঃস্পর্শী হয়ে উঠবে। আপনি সহজে ঈপ্সিত বিষয়টিকে করায়ত্ত করতে পারবেন।

এবার আসুন, আবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক।

বেশ কয়েক বছর ধরে আমি অবসর কাটাচ্ছি। আমার বাড়ীর কাছাকাছি একটি পার্কে ঘুরে বেড়াই। মাঝেমধ্যে ঘোড়ায় চড়ি।

ঘুরতে ঘুরতে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। আমি একটি ওক গাছকে দারুণ ভালোবেসে ফেললাম। বলা যেতে পারে মনে মনে গাছটিকে আমি পূজা করতাম। দেখতাম, প্রতি বছর গাছের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় আগুন লাগছে। ছোটো ছোটোগুলো পুড়ে যাচ্ছে। এই আগুন অবশ্য অসাবধানী ধূমপায়ীদের জন্যে লাগতো না। এটি লাগতো ছোটো ছেলেরা গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে ডিম ভেজে খেতো বলে। মাঝেমধ্যে এই আগুন বিরাট আকার ধারণ করতো। অনেক সময় ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকা হতো আগুন নেভানোর জন্যে।

পার্কের একটি কোণে নোটিস বোর্ড ঝোলানো থাকতো। সেখানে পরিষ্কার লেখা ছিল—কেউ যদি ঐ পার্কে আগুন জ্বালেন, তাহলে জরিমানা অথবা কারাদণ্ড হতে পারে। কিন্তু নোটিসটা পার্কের এমন একটা ঘুপচি কোণে লাগানো ছিল যে ছোটো ছেলেগুলো সেটা দেখতেই পেতো না।

একজন ঘোড়সওয়ার পুলিশ পার্কের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনিও তাঁর কর্তব্য গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন না। তাই প্রতিনিয়ত এই পার্কে আগুন জ্বলতো। বেশ কিছু গাছের অকাল মৃত্যু ঘটে যেতো। পোড়া গন্ধে বাতাস ভরে যেতো। আমার ভীষণ খারাপ লাগতো। আমি একবার আগুন লক্ষ্য করে ঐ পুলিশটির কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আগুন নেভানোর জন্যে এখনই দমকলে খবর দিতে হবে।

পুলিশটি অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিলেন—আগুন লাগলে খবর দেওয়াটা তাঁর কাজ নয়।

এরপর আমি কী করতাম? আমি তখন ঘোড়ায় চড়ে পার্কে এখানে-সেখানে ঘুরে

বেড়াতাম। যদি দেখতাম, কোনো ছেলেরা আগুন লাগাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়া করতাম। অবশ্য আমি পরে বুঝতে পেরেছি। আমার এই কাজের মধ্যে খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজেকে এক স্বনিয়োজিত আইনরক্ষক হিসাবে ঘোষিত করেছিলাম। আগুন জ্বলছে দেখলেই আমার মাথাটা গরম হয়ে যেতো। আমি বারবার বলতাম—ওহে ছেলেরা, তোমারা কি জানো, এই কাজের পরিণতি কী হতে পারে? দেখো, ঐ নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, এর জন্যে জেল এবং জরিমানা দুই-ই হতে পারে। ওদের গ্রেপ্তারের ভয় দেখতাম। এভাবে আমি কী প্রমাণ করার চেষ্টা করতাম?

কী হতো? ছেলেরা আমার কথা শুনতো। হয়তো অসন্তুষ্ট মনে ওখান থেকে চলে যেতো। আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে ওদের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলে ওরা আবার দল বেঁধে হৈ হৈ করে ফিরে আসতো। আবার আগুন জ্বালাতো। বোধহয় সমস্ত পার্কটা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার চেষ্টা করতো।

সময় কাটতে থাকে। আমি আমার আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠি। আমি কৌশল অবলম্বন করতে থাকি। আমি অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখার চেষ্টা করি। আমার বয়েসটাকে কমিয়ে আনি। আমিও এক সময়ে ঐ ধরনের কিশোর ছিলাম। তখনো এই অজানা আনন্দে মেতে উঠতাম। তাহলে? ওরা যে দল বেঁধে ডিম ভেজে খাচ্ছে, এর মধ্যে নির্মম আনন্দ লুকিয়ে আছে। আমি কেন চোখে চশমা এঁটে এই আনন্দের উৎসবটাকে নষ্ট করে দেবো? আমি কি ওদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার করছি না?

ক্রমশ আমার আচরণ বদলে গেল। আমি তখন এই ভাবে কথা বলতে আরম্ভ করতাম—কি ছেলেরা? সময় ভালো কাটছে তো? আজ কী রান্না হচ্ছে? তোমাদের মতো বয়সে আমরাও এই ভাবে আগুন জ্বেলে পিকনিক করতাম। এখনো খুব ভালোবাসি। কিন্তু তোমরা কী জানো, বাগানের ভেতর এইভাবে আগুন জ্বালাতে নেই। অবশ্য আমি জানি, তোমরা সব শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে। তোমরা এমন কোনো কাজ করবে না যাতে বাগানের কোনো ক্ষতি হয়। তবে দেখো সব ছেলেরাও তোমাদের মতো সাবধানী নয়। তোমরা আগুন জ্বালছো দেখে ওরাও আগুন জ্বালায়। যাবার সময় নিভিয়ে দেয় না। শুকনো পাতায় লেগে গাছ পুড়ে যায়। আমি কিন্তু তোমাদের আনন্দ মাটি করতে আসিনি। আমি চাই তোমরা আনন্দ করো। আর শুকনো পাতাগুলো আগুনের পাশ থেকে এখনই সরিয়ে নাও। যাবার সময় আগুনটা ধুলোয় চাপা দিও, কেমন। নাহলে আবার কাল এসে এখানে আনন্দ করবে কেমন করে? আর একটা কাজ তোমরা করতে পারো। পাহাড়ের ওপর যাও না কেন? সেখানে চারপাশে বালি আছে। সেখানেও তো আগুন ধরিয়ে আনন্দ করতে পারো। তাতে গাছেদের কোনো ক্ষতি হবে না।

আচ্ছা, এবার আসি। তোমরা আনন্দ স্ফূর্তি করো।

এই ধরনের কথায় ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। যেসব ছেলেরা আমার এপর চটে গিয়েছিল, তারাই আমার বন্ধু হয়ে গেল। বয়সের ব্যবসান কোথায় উড়ে গেল। এমনকি দেখা গেল, তারাও মাঝে মধ্যে তাদের এই পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বিরক্তি অথবা অসহিষ্ণুতাকে কেন্দ্র করে কোনো লাভ হয় না। সব সময় হুকুম করে আমরা কোনো একটি অন্যায় কাজকে বন্ধ করতে পারি না। সেক্ষেত্রে লুকোচুরি খেলা খেলতে থাকে। একটি মানুষকে বুঝতে দিতে হবে, তার বিবেকের দরবারে আঘাত করতে হবে। সে যখন সত্যি সত্যি নিজেকে অপরাধী বলে মেনে নেবে, তখনই আপনার জয় হবে। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

দেখা গেল, আগুন আর জ্বলছে না। বেশির ভাগ পিকনিক হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে।

আবার, কেউ যদি আগুন জ্বালাতো, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যেতো। আগুন নেভানোর ব্যাপারে আর তাকে বকাবকি করতে হতো না।

জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার করবেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, লোকটি এই কাজ কেন করছেন? এই প্রশ্নের যে উত্তর আপনি পাবেন, তার মধ্যেই সব কিছু লুকিয়ে আছে। এক্ষেত্রে আপনি আপনার মনটাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে পারবেন। প্রতি পদক্ষেপে নতুন বন্ধুর সন্ধান পাবেন। জুতোর তলাও একটু কম ক্ষইবে।

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের ডিন ডনহ্যাম একবার বলেছিলেন—কারো অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার আগে আমি অফিসের সামনে দু'ঘণ্টা পায়চারি করতে চাই। সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে সব কথা না জেনে আমি কিছুতেই তার মুখোমুখি হবো না। আমি কোনো প্রশ্ন করতে পারি এবং আমার সম্ভাব্য প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর তিনি দেবেন? সবই জানতে হবে। তা না হলে আমি কী করে তার মন জয় করবো?

কথাটা এতোটা দামি যে বারবার শুনতে ইচ্ছে করে।

এই বইটি পড়ার পর যদি আপনি ভাবেন, সত্যি একজন মানুষকে তার দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করবেন তা হলেই আমার বক্তব্য সফল হবে। অন্যের বিরক্তি বা অন্যায় উৎপাদনের চেষ্টা করবেন না। আসুন, চুপি চুপি আমরা জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার আট নম্বর নিয়মটি বলে দিই। তা হলো—আন্তরিকভাবে অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখার চেষ্টা করুন।

আঠার

সবাই যা করতে চায়

আপনি নিশ্চয়ই এমন একটি মন্ত্র শিখতে চান, যাতে পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে। সকলের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। সকলে আপনার কর্তৃত্ব মানতে পারে। তাই নয় কি?

এই মন্ত্রটা কিন্তু সহজেই শেখা যেতে পারে। এই মন্ত্র শিখতে গেলে আপনাকে কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। যদি আপনি এইভাবে শুরু করেন, তাহলে কেমন হয়—আপনার মনোভাবের জন্যে আপনাকে আমি দোষারোপ করছি না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, যদি আমি আপনার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে আমার মনটা এমন খিট খিটে আর শুকনো হয়ে যেতো।

এই ধরনের উত্তর পেলে সব নীরস মানুষও বোধহয় সরস হয়ে উঠবেন। যদি আপনি শতকরা একশো ভাগ আন্তরিকতা নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেন, তাহলে যে কোনো মানুষের মনোভাব পাল্টাতে বাধ্য।

আসুন ব্যাপারটা একটু গোড়া থেকে বুঝিয়ে বলি।

অল ক্যাপনের কথাটাই ধরা যাক। অল ক্যাপনের মতো যদি আপনার শরীর, মেজাজ এবং মন হতো, আর যদি তাঁর মতোই পারিপার্শ্বিকতা আর অভিজ্ঞতা আপনি পেতেন তাহলে কী হতো? তাহলে আপনি অল ক্যাপনের আসল দুঃখটা বুঝতে পারবেন।

আপনি যে কোনো ঝুমঝুমি বা র‍্যাটল সাপ না, তার একমাত্র কারণ কী? আপনার বাবা-মা ঝুমঝুমি সাপ নয়!

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? আমরা একটা বংশ পরম্পরার উত্তরাধিকার বহন করছি। এর

জন্য আপনি খুব একটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারবেন না। মনে রাখবেন, যে সহায় সম্বলহীন লোকটি আপনার কাছে পরামর্শ চাইবার জন্যে আসবেন, আপনার দশাও ঠিক তাঁর মতো হতে পারতো। এজন্য তাঁর প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ করবেন না। তাঁর দুঃখ দেখে হাসবেন না। মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। যে কোনো মুহূর্তে পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনার অবস্থা ওনার থেকেও করুণ হবে না, কে তা বলতে পারে। তাই সকলের প্রতি সহৃদয়তা দেখানো দরকার। আন্তরিক ব্যবহার করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা জন বিগায়ের কথা বলতে পারি। যখনই উনি রাস্তা দিয়ে টলোমলো ভাবে হেঁটে যাওয়া কোনো মাতালকে দেখতেন, তখন বলতেন, ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ, আমি ঐরকম হইনি।

'আগামীকাল যেসব মানুষেরা আপনার মুখোমুখি হবেন, তার চারভাগের তিনভাগই আপনার করুণা এবং সমবেদনার প্রত্যাশী। যদি আপনি সেই করুণা এবং সমবেদনা বিতরণ করেন, তাহলে অচিরেই তাঁরা আপনার বন্ধু হয়ে উঠবেন। আমি একবার লিটল উইমেন নামের জনপ্রিয় বইটির লেখিকা লুইজ সম্পর্কে একটি বেতার ভাষণ দিয়েছিলাম। আমি জানতাম, তিনি ম্যাসাচুসেটসের কনকর্ডে বসে এই বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। কিন্তু আমি বলে ফেলেছিলাম, তাঁর আদি বাড়ী নিউ হ্যামশায়ারের কনকর্ডে। নিউ হ্যামশায়ার কথাটি যদি মাত্র একবার বলতাম তাহলে মনে করার কোনো কারণ থাকতো না। সকলেই ভাবতেন, আমি ভুলবশত এটা উচ্চারণ করেছি। কিন্তু আমি দু-দু'বার এই শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছিলাম। এটাই আমার দুর্ভাগ্য।

সঙ্গে সঙ্গে কী হলো? রাশি রাশি চিঠি এলো। টেলিগ্রাফ এলো। আমার মাথা গরম হয়ে গেল। অনেক শ্রোতা নানাভাবে আমাকে আক্রমণ করেছেন।

মনে হলো, হাজার মৌমাছি যেন আমাকে দংশন করেছে। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করেছে। কেউ করেছে অপমান। একজন মহিলা যিনি ম্যাসাচুসেটস কনকর্ডে জন্মেছিলেন, তিনি আমার ওপর তাঁর সব রাগ উজাড় করে দিয়েছিলেন। আমি যদি মিস অ্যালকটকে নিউগিনির নরখাদিকা বলতাম, তাহলেও বোধহয় তিনি এতোখানি রেগে যেতেন না। তাঁর চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি ভেবেছিলাম, ভাগ্যিস এই বদরাগী মেজাজের মহিলা আমার স্ত্রী নন। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, মহিলাকে লিখে জানাবো, ভূগোলের জ্ঞান আমার নাও থাকতে পারে। কিন্তু আমি ওনার মতো অভদ্র নই—এই ভাবেই শুরু করবো ভেবেছিলাম। জামার হাতা গুটিয়ে রেখেছিলাম। কোন্ কোন্ কঠিন শব্দ আমার কলমের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে, তার একটা আগাম নক্সা করে রেখেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। আমি ভাবলাম, যে করেই হোক মাথা গরম করবো না। মাথা গরম করলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। শরীরটা আরো খারাপ হবে। মন ভারাক্রান্ত হবে।

আমি ভাবলাম, বোকাদের ওপর কীভাবে প্রভুত্ব চালানো যায় সেই কৌশলটা আমাকে শিখতেই হবে। আমি ঐ মহিলাকে আমার বন্ধুতে পরিণত করবো। এটাই হবে আমার জীবনের সবথেকে বড়ো উদ্দেশ্য। এটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ। এই খেলাটায় আমাকে জিততেই হবে।

আমি নিজেকে বললাম—ওনার কী দোষ আছে? উনি এই মিথ্যাভাষণ সহ্য করতে পারেননি। ওনার অবস্থানে আমি থাকলে কী করতাম?

আমি ওনার মনোভাবের সাথে একাত্ম হতে চাইলাম। আমি যখন ফিলাডেলফিয়ায় গেলাম, তখন তাঁকে টেলিফোনে ডাকলাম। আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল—

আমি মিসেস অমুক। আপনি কয়েক সপ্তাহ আগে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তার জন্যে আপনাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাইছি।

তিনি (একটু কাটাকাটা মার্জিত কণ্ঠস্বরে)—আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি কি?

—আমি আপনার অপরিচিত। আমার নাম ডেল কার্নেগী। কয়েক রোববার আগে রেডিওতে আমি অ্যালকট সম্পর্কে একটি কথিকা বলেছিলাম। আপনি সেই কথিকাটি শুনেছিলেন। আমি তখন বোকার মতোই বলেছিলাম যে অ্যালকট নিউ হ্যাম্পশায়ারের কনকর্ডে বাস করতেন। এই কথাটা বলা আমার মোটেই উচিত হয়নি। এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। আপনি যে সময় করে আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তিনি (গলার স্বর একেবারে পাল্টে গেছে)—আমি দুঃখিত মি. কার্নেগী। আমার প্রিয় লেখিকা সম্বন্ধে এমন একটি উক্তি আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চিঠির ভাষাগুলো খুব একটা ভদ্রজনক ছিল না। এজন্য আমিও ক্ষমা চাইছি।

আমি—না-না, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন। আমার তো সেটা করা উচিত। যে কোনো স্কুলের ছেলেও এমন ভুল করতে পারে না। পরের রবিবারে আমি রেডিওতে আমার এই ভুল সংশোধন করেছি। এখন আমি আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই।

তিনি (পর্বিত কণ্ঠস্বরে)—আমি ম্যাসাচুসেটসের কনকর্ডে জন্মেছিলাম। আমাদের পরিবার সেই রাজ্যের দুশো বছরের বাসিন্দা। এই রাজ্য নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। মিস অ্যালকট, নিউ হ্যাম্পশায়ারে জন্মেছিলেন বলায় আমার খুবই রাগ হয়েছিল। তাই আমি উত্তেজনার বশে ঐ চিঠিখানা লিখেছিলাম।

আমি—আমি আপনাকে জানাতে চাই, আমি এতোটুকুও দুঃখিত হইনি। আমার ভুলে ম্যাসাচুসেটসের কোনো ক্ষতি হয়নি। যা কিছু ক্ষতি তো আমারই হয়েছে। আপনাদের মতো শিক্ষিতা মহিলারা বেতার কথিকা শুনে চিঠি লেখার সময় বিশেষত পান না। আশা করি, ভবিষ্যতে কোনো বেতার কথিকায় যদি আমার এমন কোনো সাঙ্ঘাতিক ভুল হয়ে যায়, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে সংশোধন করে দেবেন।

তিনি (এবার বেশ হাসি হাসি গলায়)—আপনি যে এভাবে আমার সমালোচনা গ্রহণ করেছেন, তাতেই আমি খুশি হয়েছি। লোক হিসাবে নিশ্চয়ই আপনি চমৎকার। আপনাকে আমি আরো জানতে চাই।

তাহলে দেখলেন তো, কিভাবে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেল। আমি নিঃস্বার্থ ভাবে ক্ষমা চাওয়াতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে গেল। তাহলে? অপমানের বদলে আমি সফলতা প্রদর্শন করলাম। তিনি যে আমাকে পছন্দ করলেন, তার মানে কী হলো? চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণ করলাম, এবং এই চ্যালেঞ্জটা জিতে নিলাম। তাই নয় কী?

হোয়াইট হাউসে যাঁরা প্রেসিডেন্ট হিসাবে অধিষ্ঠান করতেন তাঁরা মানুষের সাথে ব্যবহার করতে গিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতেন। প্রথমেই ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটে যেতো। দ্বিতীয়ত, হোয়াইট হাউসে যাঁরা আসতেন, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন প্রেসিডেন্টের করুণাপ্রার্থী।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রেসিডেন্ট ট্যাফোর্ডের কথা বলি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর ধারাবিবরণী থেকে আমরা একটা সত্যি বুঝতে পারি, তা

হলো, মানবিক মূল্যবোধগুলিকে আরো উঁচুতে তুলে ধরতে হবে। সহানুভূতির রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। কীভাবে আমরা কড়া আর বিদ্রূপ পূর্ণ মনোভাবকে দূরীভূত করতে পারবো সেই সত্যটা না জানলে জীবনের সফলতা অর্জন করা যাবে না।

ট্যাফোর্ড তাঁর লেখা "এথিকস ইন সার্ভিস" বইতে এই সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন—কী ভাবে এক হতাশ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মায়ের বিরক্তি দূর করতে হবে।

ট্যাফোর্ডের ভাষাতেই বলা যাক—

...ওয়াশিংটনের এক মহিলা আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। তাঁর স্বামীর কিছুটা রাজনৈতিক পরিচিতি ছিল। তিনি কী বলছেন? তিনি বলছেন, তাঁর ছেলেকে কোনো একটি বিশেষ পদে নিয়োগ করতে হবে। প্রায় দেড়মাস ধরে উনি ধারাবাহিকভাবে আমার কাছে এই আবেদন নিবেদন করতে থাকলেন। আমি অত্যন্ত রেগে গেলাম। প্রথম দিকে তিনি সেনেটের আর কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন যোগাড় করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ঐ পদটির জন্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। আমি ঐ দপ্তরের প্রধানের কথা মেনে নিয়েছিলাম। আমি অন্য একজনকে ঐ পদে নিয়োগ করি। এরপর ঐ মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। সেখানে আমাকে অকৃতজ্ঞ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলেই ওনাকে খুশী করতে পারতাম।

তিনি আরো অভিযোগ করলেন, তিনি আমার হয়ে ভোট সংগ্রহে প্রচুর খেটেছেন। আর এইভাবে আমি ওনার প্রতিদান দিলাম?

এই ধরনের চিঠি পেলে প্রথমেই আপনার কী মনে হবে। মনে হবে, একটা কড়া জবাব লিখে দিই। বিশেষ করে, কেউ যদি এইভাবে অনধিকার চর্চা করতে চান? তাহলে মনটা অকারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আপনি হয়তো চিঠি লিখবেন। কিন্তু আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে চিঠিটা এখনই পোস্ট করবেন না। সেটি ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে রাখবেন। দু'দিন বাদে সেটি আবার বের করবেন। ইতিমধ্যেই আপনার মনের পরিবর্তন ঘটে গেছে। আপনি এখন আর চিঠিখানা পাঠাতে চাইবেন না।

আমি ঠিক সেই পথ অবলম্বন করলাম। আমিও মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলাম, ভদ্রমহিলা কী কিছু খারাপ করেছেন? ছেলের প্রতি সকল মায়ের অন্ধ স্নেহ থাকে। যদি আমি ওনার অবস্থানে থাকতাম, তাহলে কী করতাম? তাহলে আমিও তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে হাত করার চেষ্টা করতাম। নানা ভাবে তাঁকে প্রলোভিত করতাম।

তাহলে? আমি করে কি জানাবো যে এই ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না, কেননা ঐ পদটির জন্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষার দরকার ছিল। আমার দুর্ভাগ্য, আপনার ছেলের মধ্যে তা নেই।

সবক'টি পয়েন্ট পর পর লিখে ফেললাম। এবার আমি একখানা বিরাট চিঠি লিখলাম। সেই চিঠির মধ্যে আমার অসহায়তার কথা তুলে ধরলাম। আমি আরো জানালাম, আমি আশাকরি, তাঁর ছেলে এখন যে পদে কাজ করছে, সেখানেই তার উন্নতি হবে।

এই চিঠি পেয়ে ভদ্রমহিলা একেবারে পাল্টে গেলেন। তিনি আবার আমাকে একখানি চিঠি লিখলেন। তিনি আগের চিঠিতে আমাকে যে ভাবে আক্রমণ করেছেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ব্যাপারটার কিন্তু এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। এবার মহিলার স্বামীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম। অবশ্য হাতের লেখাটা আগের মতো ছিল।

ভদ্রলোক লিখেছেন—তাঁর স্ত্রী হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। তিনি স্নায়বিক রোগের শিকার হয়েছেন। তিনি এখন শয্যাশায়ী। সম্ভবত তাঁর পাকস্থলীতে ক্যানসার রোগ হয়েছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে ঐ চাকরীতে কী তাঁদের ছেলেকে বহাল করা যায় না? এটি এক মানবিক আবেদন।

আমি আবার চিঠি লিখলাম, তাঁর স্বামীকে সরাসরি আমি লিখলাম—আশাকরি এই রোগটা মারাত্মক হবে না। যদিও এই রোগের জন্যে আমি সমবাথী। আমি আমার অক্ষমতার কথা আবার জানালাম। যে ভদ্রলোক ঐ পদে কাজ করছেন, তাঁকে বাতিল করা সম্ভব নয়।

এরপরের ঘটনাটি আরো অবাক করা। দু'দিন বাদে হোয়াইট হাউসে একটি সঙ্গীতের আসর বসানো হয়েছিল। প্রথমেই যে দম্পতি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে সম্ভাষণ জানিয়ে ছিলেন তাঁরা হলেন ঐ স্বামী স্ত্রী। যদিও স্ত্রীর নাকি তখন সাংঘাতিক রোগ।

এস হুরক হলেন আমেরিকার এক সঙ্গীত সংগঠনকারী। বিশ বছর ধরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনোদন জগতকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে রেখেছেন। যে সব বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইসাডোরা ডানকান, চ্যালিয়া পিন, পাবলোভা প্রমুখ।

মিঃ হুরক পরবর্তীকালে আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। সে কথা শুনতে শুনতে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। সত্যিই তো, যেসব মানুষদের সাথে তিনি ওঠাবসা করেন, তাঁরা খামখেয়ালী মনের অধিকারী। এঁদের সাথে পায়ে পা ফেলে চলতে গেলে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রচণ্ড সহানুভূতি আর মানবিক মূলবোধ না থাকলে শিল্পীদের সাথে মানিয়ে চলা যায় না।

তিন বছর ধরে তিনি ছিলেন থিওডোর চ্যালিয়া পিনের সঙ্গীত সংগঠক। চ্যালিয়া পিন ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিল্পী। যখনই আসরে গিয়ে উপস্থিত হতেন, হাজার হাজার মানুষ সমবেত হাততালির মাধ্যমে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতেন। তবে চ্যালিয়া পিন ছিলেন এক জীবন্ত সমস্যা। ঠিক অল্প বয়সের দুষ্টু ছেলের মতো। মাঝে মধ্যেই কেমন যেন আচরণ করতেন।

হুরকের ভাষায়—সবথেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জঘন্য স্বভাবের।

উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো।

মনে করুন, আজ সন্ধ্যায় চ্যালিয়া পিনের একটি অনুষ্ঠান হবে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নামে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। অনেক লোক টিকিট কেটেছেন।

দুপুরবেলায় মিঃ হুরকের কাছে একটি ফোন এলো। চ্যালিয়া পিন বললেন—আমার গলা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যেবেলা আমি কিছুতেই গান গাইতে পারবো না। আমার খুব শরীর খারাপ।

মিঃ হুরক কী করবেন? তিনি কি তর্ক জুড়ে দেবেন? তিনি জানেন, তর্ক করে চ্যালিয়া পিনকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ বাতিল করে চ্যালিয়া পিনের হোটেলে ছুটে যেতেন। তিনি বলতেন, কী দুঃখের কথা, বুঝতে পারছি, আপনার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নয়। আমি এখনই অনুষ্ঠান বাতিল করছি। অবশ্য এতে আপনার বেশ কয়েক হাজার ডলার ক্ষতি হবে।

যাক, কী আর করা যাবে, আপনার খ্যাতির তুলনায় ডলার তো কিছুই নয়।

চ্যালিয়া পিনের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন সূচিত হবে। তিনি বলবেন—ঠিক

আছে, একবার বিকেলের দিকে এসো তো, দেখি, আমি কেমন থাকি।

হরক জানতেন, এবার কী হবে। তিনি বিকেলে আবার হোটেলে ছুটবেন। একই রকম সহানুভূতির বাক্য বর্ষণ করবেন। আবার চ্যালিয়া পিনের সামনে গিয়ে বলবেন—স্যার, অনুষ্ঠানটা শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিই।

চ্যালিয়া পিন আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। তিনি বলবেন—ঠিক আছে। আধ ঘণ্টা পরে এসো। তখন হয়তো ভালো হয়ে যেতে পারি।

শেষ পর্যন্ত সাড়ে সাতটায় চ্যালিয়া পিন গান গাইতে রাজী হবেন। তবে একটা শর্ত তিনি জুড়ে দেবেন, মিঃ হরক সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করবেন—সমবেত শ্রোতা বন্ধুরা, আজ চ্যালিয়া পিনের গলাটা ভালো নেই।

মিঃ হরক তাই করার প্রতিশ্রুতি দেবেন। এভাবেই চ্যালিয়া পিনকে তিনি সামলাতে পারবেন।

ডঃ আর্থার আইগেটস তাঁর এডুকেশনাল সাইকোলজি বইতে বলেছেন—সারা পৃথিবীর মানুষ সহানুভূতি প্রত্যাশা করে থাকে। শিশু তার শরীরের যে কোনো আঘাত মা-বাবাকে দেখায়। সে চায় মা-বাবা যেন ঐ আঘাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। বয়স্করাও তাই করে থাকেন। তাঁদের আঘাত, দুর্ঘটনা, অথবা রোগের কথা সব সময় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেন। এর একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। তা হলো, সকলের কাছ থেকে অতিরিক্ত সহানুভূতি আদায় করা।

সফল মানুষ যে নিজেকে করুণা করতে চায়, আর এভাবেই অপরকে জয় করার চেষ্টা করে তাদের জন্য ন-নম্বর নিয়মটি বলতে পারি। তা হলো—অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন।

উনিশ

সকলের পছন্দসই আবেদন করার নিয়ম

আমি আমেরিকার মিসৌরীতে জে সি জেমসের খামারের কাছে মানুষ হয়েছিলাম। আমি কিয়ারশীতে জে সি জেমসের খামার দেখেছি। সেখানে এখনো তাঁর ছেলে বসবাস করে থাকেন। জেমসের স্ত্রী আমাকে অনেক গল্প বলতেন। তিনি বলতেন, জেসি কিভাবে ট্রেন লুট করতেন। মাঝে মধ্যে তিনি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতেন। লুট করা টাকা পয়সা চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কেন? চাষীরা যাতে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারে।

অনেকে হয়তো জে সি জেমসকে আদর্শবাদী হিসাবে চিহ্নিত করবেন। ঠিক সেভাবে ডাচ সুলজ দুই বড় ক্লাবকে আর অলক্যাপন ভেবে এসেছেন। আসল কথাটা হলো, প্রতিটি মানুষ যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান, তখন নিজের সম্পর্কে একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তিনি ভাবেন, আয়নাতে প্রতিফলিত ঐ মুখটি আমার গর্বিত মুখের প্রতিফলক। আমি একজন অহঙ্কারী আত্মপ্রবঞ্চক লুটেরা অথবা প্রতারক হই না কেন, আমার ধমনীতে আভিজাত্যের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

জে পিয়েরেবন মরগ্যান তাঁর একটি বিশ্লেষণে বলেছেন, একজন মানুষ কেন কোনো কাজ করেন? এই কাজ করার পেছনে দুটো অর্থ আছে। এক, যা শুনতে ভালো, এমন কাজ করতে হবে। এবং দুই, যে কাজের মধ্যে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে সেই কাজ করতে হবে।

একজন মানুষ কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কোনো কাজ করতে চায় না। এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমরা সবাই কি আদর্শবাদী হয়ে উঠতে পারি? এক্ষেত্রেও আমাদের একটু কৌশল করতে হবে। মানুষকে পরিবর্তিত করতে হবে। মহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে করমর্দন করতে হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এখন কি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে? এখন কি আরো বেশী আদর্শবাদী কাজ দেখা যাচ্ছে? মানুষ কি শুধু পয়সার পেছনে ছুটে যাচ্ছে না? আসুন, কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক। তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো, সত্যি সত্যি মানুষের মনোজগতে তেমন কোনো পরিবর্তন সঠিক হয়েছে কিনা।

এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই হ্যামিলটন জে মিচেলের কথা বলবো। তিনি হলেন পেনসিলভেনিয়ার গ্রেনডেনের হ্যারেল নিক্রেল কোম্পানীর প্রধান।

মিঃ হ্যারেলের এক অসন্তুষ্ট ভাড়াটে বাড়ী ছেড়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছিলেন। ভাড়ার মেয়াদ তখনো চার মাস বাকি ছিল। প্রতি মাসে উনি পঞ্চাশ ডলার করে ভাড়া দিতেন। তা সত্ত্বেও একটি নোটিশ দিলেন।

মিস্টার পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটা আমাকে এইভাবে কল্পনা করেছিলেন।

—এইসব ভাড়াটে আমার বাড়িতে সমস্ত শীতকাল বসবাস করেছে। এই সময়টা বছরের সবথেকে বেশী খরচের সময়। আমি তাই জানতাম, আগামী শীতের আগে আর ভাড়া দিতে পারবো না। আমি বুঝলাম, দুশো কুড়ি ডলার জলে যেতে বসেছে। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

আমি কী করবো? ঐ ভাড়াটেকে পুরোনো লীজের চুক্তি আর শর্ত দেখাবো? আমি কি তাঁকে জানাবো তিনি যদি এখন ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান, তাহলেও তাঁকে চুক্তি মতো দুশো কুড়ি ডলার মেটাতে হবে?

আমি ঠিক করলাম, ভাড়াটের সাথে কোনো গোলমালে ফেঁসে যাবো না। আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে। আমি এইভাবে কথা বলতে শুরু করলাম—মি. দো, আপনার কথা শুনলাম। আমি সত্যি সত্যি ভাবতে পারছি না, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। এই ভাড়া খাটানোর ব্যাপারে আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতা আছে। তার থেকে আমি মানবচরিত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি হলেন এককথার মানুষ। এ ব্যাপারটায় আমি সুনিশ্চিত।

এখানে আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাই। আপনি আপনার চিন্তাটা ক'দিন ধামাচাপা দিয়ে রাখুন। তারপর না হয় আবার ভাববেন। আপনি আগামী মাসে যখন আমাকে ভাড়া দিতে আসবেন, তখন যদি এই ইচ্ছে আবার প্রকাশ করেন, তখন আমি আর না বলবো না। আমি বুঝবো, সত্যি সত্যি আপনি এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। আমি এখনো বিশ্বাস করি আপনি এককথার মানুষ এবং চুক্তি মেনে চলবেন। যদি এই বিশ্বাস কোনোদিন ভেঙে যায়, তাহলে আমি আমার অক্ষমতাকে স্বীকার করে নেবো।

দেখা গেল, নতুন মাস পড়তেই এই ভদ্রলোক এসে ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী, দু'জনে আলোচনা করেছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন, তাঁদের উচিত সম্মানের সঙ্গে চুক্তির শর্তটা মেনে চলা।

প্রয়াত লর্ড নর্থ ক্লিফের একটি ছবি একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এটা তিনি মোটেই চাননি। নিজের ছবি ছাপা হোক, এবং সকলে তাঁকে চিহ্নিত করে ফেলুক, ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই অপছন্দের বলে মনে হয়েছিল।

তিনি কী করলেন? তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠি লিখলেন। তিনি কী

বললেন—দয়া করে ঐ ছবি আর ছাপাবেন না? এটা আমি খুবই অপছন্দ করছি?

তিনি তা করলেন না। তিনি বললেন—আমার মায়ের পছন্দ নয় আমার কোনো ছবি খবরের কাগজে ছাপা হোক।

উনি জানতেন, এইভাবে মায়ের নাম করে আবেদন করলে, সম্পাদক আর না বলতে পারবেন না।

জন ডি রকফেলার জুনিয়ারের একটি কথা বলি। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের ছবি কাগজে ছাপাতে দেওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি কখনোই বলতেন না—আমি চাই না যে ওদের ছবি ছাপা হোক। তিনি যা চাইতেন তা হলো, ছেলেমেয়েদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

তিনি বলেছিলেন—আপনারা তো জানেন ছেলেমেয়েরা কেমন। এইভাবে ছবি ছাপা হলে ওরা অহঙ্কারী হয়ে পড়বে। আপনাদেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। ছোটো বয়সে বেশী প্রচার পাওয়াটা মোটেই উচিত নয়।

সাইরাস এইচ কে কার্টিস মেইনের সেই দরিদ্র ছেলেটিকে মনে পড়ে? যিনি পরবর্তীকালে দি স্যাটারডে ইভিনিং পোস্ট এবং লেডিস হোম জার্নালের মতো জনপ্রিয় দুটি খবরের কাগজের মালিক হয়েছিলেন। তিনিও যখন গোড়াতে কাজ শুরু করেন, তখন লেখার জন্যে টাকা দিতে পারতেন না। তাহলে তিনি কী করতেন? তিনি বড়ো বড়ো লেখকদের হৃদয়ের কাছে আবেদন রাখতেন।

এখানেও একটা গল্প বলা যাক। অমর সাহিত্য লিটল উওমেনের লেখিকা লুইস অ্যালকটের কাছে তিনি আবেদন রেখেছিলেন। তখন লুইস তাঁর খ্যাতির মধ্য গগনে পৌঁছে গেছেন। তবুও তিনি ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে লেখা পাঠিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি অবশ্য ঐ ভদ্রলোক আর একটি কাজ করেছিলেন। তিনি অ্যালকটের পছন্দমতো জায়গাতে একশো ডলার দান করেছিলেন।

এখানে অবশ্য আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন, নর্থ উইক বা রকফেলারের মতো অর্থবান মানুষদের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু যেসব মানুষ কাঠখোট্টা শক্ত হৃদয়ের, তাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করার আর কোনো উপায় আছে কী? এক্ষেত্রে বোধহয় আঙুল বেঁকিয়ে ঘি তুলতে হবে!

ব্যাপারটা হয়তো আপনি গুলিয়ে ফেলেছেন। সর্বক্ষেত্রেই আমরা এই মতবাদ প্রয়োগ করতে পারি। হয়তো প্রথমবার আপনি সফল হবেন না। কিন্তু দ্বিতীয়বার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? সেবারও যদি বিফলতা হয় তাহলে তৃতীয়বার। আমি জানি, সহৃদয় ভাবে কোনো কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আপনি সফল হবেন। আজ অথবা আগামীকাল। অবশ্য আপনাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

আমার এক প্রাক্তন ছাত্র জেমস এল টমাসের বলা সত্য কাহিনীটা শোনাবো নাকি?

গল্পটা হলো এইরকম—কোনো মোটর গাড়ি কোম্পানীর ছ'জন ক্রেতা সাফাই বা সারানোর টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা পুরো বিলটা ভুল বলে দাবি করেনি। তবে তারা বলেছিল, বিলের একটি অংশ অতিরঞ্জিত। প্রত্যেক ক্ষেত্রের প্রতিটি অংশে তাঁরা সই করেছিল। কোম্পানী জানতো, এরকম ঘটনা কখনোই ঘটবে না। কিন্তু সেটা ঘটে গেল।

এবার কী হবে? কোম্পানীর টাকা আদায়কারী দপ্তর এখন কী করবে? তারা কী করে বকেয়া টাকাটা পাবে?

অনেকগুলো পন্থা বলা হলো। দেখা যাক, কোনটি গ্রহণযোগ্য হয়।

১. তাঁরা প্রত্যেক খরিদ্দারের বাড়িতে যাবে। তারা বলবে, মহাশয়, অনেকদিন টাকাটা পড়ে আছে। এবার সেটা আদায় করতে এসেছি।

২. তারা পরিষ্কার করে জানাবে, কোম্পানী সম্পূর্ণ ঠিক। আর তাঁরা ভুল করেছেন।

৩. তারা জানাবে, কোম্পানী গাড়ির ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। তাহলে এখন তর্কাতর্কি করা কেন হচ্ছে?

এসবের ফলাফল কী হবে? তর্কাতর্কি শুরু হবে।

তাহলে কোন্ অবস্থা গ্রহণ করা হবে? কোম্পানী তখন কী আইনগত ব্যবস্থা নেবে? ঠিক এই সময় কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সব ব্যাপারটার ওপর দৃকপাত করলেন। ম্যানেজার এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলেন। তিনি জানতে পারলেন, ক্রেতাদের সাথে কোম্পানীর ভালোবাসার সম্পর্ক আছে। ক্রেতারা অনেকদিন ধরেই যাতায়াত করছেন। আগে তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনো করা হয়নি। অর্থাৎ, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সেই ভুলটা চিহ্নিত করতে না পারলে সমাধানের পথ জানা যাবে না।

তিনি জেমস এল টমাসকে ডেকে টাকা আদায়ের দায়িত্ব দিলেন।

মিঃ টমাস নীচের পদ্ধতি গ্রহণ করলেন—

১. প্রত্যেক ক্রেতার কাছে যাওয়ার পর তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে এই বিলটা অনেক দিনের পাওনা। তবে আমি এ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাইছি না। আমি একটি বিষয় জানতে এসেছি। তা হলো, আমাদের কোনো কাজে আপনি কী বিরক্ত হয়েছেন?

২. আপনার মতামত না শুনে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না। আমি কখনোই বলছি না, কোম্পানীর সমস্ত দাবি নির্ভুল।

৩. গাড়ি সম্পর্কে আমার চেয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। কেননা আপনারাই তো গাড়িতে চড়েন।

৪. আপনাদের কথা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে।

৫. যদি আপনারা মনে করেন, তাহলে থেপে থেপে বিলের টাকা শোধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও আমরা তা গ্রহণ করবো।

এই পদক্ষেপগুলিতে কী হয়েছিল? দেখা গেল যেসব ক্রেতারা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, তারা ক্রমশ আরো শান্ত এবং সংযত হচ্ছেন। এভাবে কারোর সাথে ঝগড়া টিকিয়ে রাখা উচিত কী—তারা তা বুঝতে পারছেন। টমাস প্রতি ক্ষেত্রেই আগে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন আমি প্রথমেই আপনার কাছে কিছুটা সময় চেয়ে নিচ্ছি। আপনি ব্যস্ত মানুষ। তবুও বিলটা নিয়ে একবার হিসাবপত্র করতে চাই। আমার অনুরোধ যদি কোথাও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। আপনি যা বলবেন, সেটাই আমরা মেনে নেবো।

এর ফল কী হয়েছিল? সবাই কি টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন? না, তা কখনোই সম্ভব নয়। ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন দেড়শো থেকে পাঁচশো ডলার দিয়েছিলেন। একজন পরিষ্কার বলেছিলেন, আমি কোনো টাকাই দেবো না। তবে আসল কথাটা হলো, দুবছরে আবার তাদের নতুন গাড়ি বিক্রি করা সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে টমাস বলেছেন—ক্রেতাদের চরিত্র আমার জানা আছে। তারা সকলেই যে সৎ সত্যবাদী এবং দাম মিটিয়ে দিতে উদগ্রীব হবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে ঠিকমতো বোঝাতে পারলে আশি শতাংশ ক্ষেত্রে আপনি সফল হবেন।

তাহলে? দশ নম্বর নিয়মটা কি তখন উচ্চারণ করা যেতে পারে—অপরের মহত্বের প্রতি আবেদন রাখুন, আন্তরিক ভাবে, দেখবেন, কিছু আশ্চর্য ফল ফলে যাচ্ছে।

কুড়ি

চলচ্চিত্রে যা হয়ে থাকে, রেডিওতে যা শোনানো হয়ে থাকে—আপনি তা করবেন না কেন!

কয়েক বছর আগের কথা, দি ফিলাডেলফিয়া ইভনিং বুলেটিনের বিরুদ্ধে একটি নিন্দার গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল।

বলা হয়েছিল, এই কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন থাকে। এখানে খবর বিশেষ কিছু ছাপা হয় না। তাই সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা আর এই বুলেটিন পড়তে চাইছেন না।

বিশেষ করে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী একটি জরুরী সভা ডাকেন। তাঁরা স্থির করেন, কীভাবে এই গুজবের মোকাবিলা করা যায়।

তাঁরা কী করলেন? তাঁরা বুলেটিনের বিভিন্ন সংস্করণ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে একটি সঙ্কলন প্রকাশ করলেন। বইটির নাম দেওয়া হলো 'একদিন'। এখানে ৩০টি পাতা ছিল। এর দাম হতে পারতো দু-ডলার। তা সত্ত্বেও এর দাম রাখা হলো মাত্র দু'সেন্ট।

এই সঙ্কলনটি সকলের কাছে পাঠানো হলো। বিশেষ করে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে। এটি এমন সুন্দরভাবে সাজানো ছিল, যে কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারতেন, ফিলাডেলফিয়া ইভনিং বুলেটিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। হয়তো কেউ ষড়যন্ত্র করার জন্যই এমন কাজটি করেছে।

শুধু সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বোঝালে সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারতো না। বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিরাও তাদের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করতেন। কিন্তু এমন সুন্দরভাবে সব কিছু এই বুলেটিনে তুলে ধরা হলো, ফিলাডেলফিয়া ইভনিং বুলেটিন আবার তার স্বস্থানে আসতে পারলো।

এই যুগটাই হলো নাটকীয়তার যুগ। কেবল সত্য প্রচার করলে কাজ হবে না। সত্যকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সিনেমাতে যেমনটি করা হয়ে থাকে। আকাশবাণীতে যেমনটি করা হয়। মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গেলে আপনাকেও এই ধরনের চমক সৃষ্টি করতে হবে।

তাইতো দোকানের জিনিসগুলি কাচের শো-কেসের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হয়। যে কোম্পানী ইঁদুর মারার বিষ তৈরি করে, তারা তাদের শো-কেসে দুটি জ্যান্ত ইঁদুর প্রদর্শন করে। তার ফলে কী হয়। বিক্রি পাঁচ গুণ বেড়ে যায়।

জেমস বি কটন হলেন দি আমেরিকান উইলির এক প্রধান কর্তা। একবার তিনি একটি মার্কেট রিপোর্ট বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি কী করলেন? তিনি কারো সাথে তর্ক করলেন না। তিনি অন্যকে স্বমতে নিয়ে এলেন।

এবার বোধহয় আমরা এই সংক্রান্ত এগারো নম্বর নিয়মটা উচ্চারণ করতে পারি। তা হলো, আপনার ভাবনাকে নাটকীয় এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

একুশ

যখন অন্য কিছুতে কাজ হবে না, তখন একবার শেষ চেষ্টা করাই যাক

চার্লস সোয়াবের কথা আবার বলি। তাঁর কারখানাতে একজন ম্যানেজার ছিল। সেই ভদ্রলোকের সমস্যা ছিল, কর্মচারীরা ঠিকমত কাজ করতো না।

সোয়াব একদিন ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি জানতে চাইলেন—কী ব্যাপার, আপনার মতো একটা পাকা মানুষও প্রতি পদক্ষেপে হেরে যাচ্ছেন? কারখানার উৎপাদন এতো কমে গেছে? আসল ব্যাপারটা কী আমাকে খুলে বলুন তো?

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে জবাব দিলেন—তা জানি না স্যার। আমি সকলকে চাপ দিচ্ছি। নানা ভাবে চেষ্টা করছি। মাঝে মধ্যে ভয় দেখাচ্ছি। অনেক সময় বলেছি, চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শ্রমিকেরা একেবারে বেঁকে বসেছে। আমার সামনে হ্যাঁ, হ্যাঁ করছে। কিন্তু আমি চলে গেলেই কাজে ঢিল দিচ্ছে। কীভাবে যে কী হবে বুঝে উঠতে পারছি না।

তখন দিনের কাজ শেষ হয়েছে। রাতের শিফট শুরু হতে চলেছে। সোয়াব বললেন—ঠিক আছে, আমাকে একটুকরো চক খড়ি দিন তো।

তারপর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক কর্মীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের শিফটে কত উৎপাদন করেছো?

সে জবাব দিলো—ছয়।

আর কোনো কথা না বলে সোয়াব মেঝের ওপর বড়ো বড়ো করে ছয় সংখ্যাটি লিখলেন।

রাতের শিফট শুরু হলো। কর্মীরা এসে ছয় সংখ্যার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে চাইলো।

ঐ শ্রমিক জবাব দিলো—বড়ো কর্তা নিজে এসেছিলেন। তিনি জানতে চান আমরা কত উৎপাদন করেছি। তিনি চকখড়ি দিয়ে সেটা লিখে রেখেছেন। পরদিন সকালে সোয়াব এসে দেখলেন, একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। রাতের শিফটের কর্মীরা ছয় সংখ্যাটি মুছে দিয়েছে। সেখানে তারা সাত সংখ্যাটি লিখেছে।

পরের দিন আবার আর একটি মজার ব্যাপার ঘটে গেল। দিনের শিফটের শ্রমিকেরা এসে সাত সংখ্যাটা লক্ষ করলো। তারা ভাবলো, ও রাতের শিফটের শ্রমিকেরা আমাদের থেকে আরো বেশি দক্ষ। মালিকের কাছে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে? ঠিক আছে, রাতের শিফটের শ্রমিকদের কিছু শিক্ষা দিতে হবে। তারা যাবার সময় মেঝের ওপর বড়ো বড়ো করে দশ সংখ্যাটি লিখলো।

এই ভাবে দিন কাটতে থাকে।

যে মিলটি এতোদিন নানা ঝঞ্ঝাটি ঝামেলাতে অর্থ ক্ষয় হয়েছিল সেখানে নতুন প্রাণের সঞ্চরণ ঘটে গেল। এখন অনেক বেশী উৎপাদন শুরু হলো।

এক্ষেত্রে কৌশলটি কী? আসুন, আমরা আবার চার্লস সোয়াবের শরণাপন্ন হই।

তিনি বলেছেন—কাজ করাতে হলে প্রথম প্রয়োজন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। টাকা আয় করছি বা টাকা আদায় করছি এমনটি ভাবলে চলবে না। বলতে হবে, তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। তুমি কেন অন্যকে হারাতে পারবে না। প্রতিটি মানুষ অপরকে হারানোর ইচ্ছে পোষণ করে। ছোট্ট বয়স থেকে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামতে চায়।

মানুষ সব সময় প্রতিযোগিতা ভালোবাসে। শুধু টাকা আনা পাইয়ের হিসাব নিকেশ করতে চায় না। এই প্রতিযোগিতা আছে বলেই মানুষ আজ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হতে পেরেছে। আমি আমার শ্রমিকদের মধ্যে শুধু এই প্রতিযোগিতার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তার ফল হয়েছিল আশাতীত।

প্রতিযোগিতার মনোভাব না থাকলে থিওডোর রুজভেল্ট কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। কিউবা থেকে ফিরে আসার পর তিনি সবে মাত্র নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর হয়েছিলেন। তখন বিরোধিরা একটি বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করতে শুরু করে দেন। তাঁরা বলেন, রুজভেল্ট এই রাজ্যের আইনসম্মত অধিবাসী নন।

রুজভেল্ট কী করলেন? তিনি ভয় পেয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। এবার আসরে এলেন টমাস কলিয়ার। তিনি থিওডোর রুজভেল্টকে দেখে চিৎকার করে বললেন—সানডুয়ান পাহাড়ের বীর কী কোনো কাপুরুষ?

রুজভেল্ট লড়াই করার মনস্থ করলেন। এরপর যা ঘটেছিল, তাকে তো আমরা এক ইতিহাস বলে বর্ণনা করতে পারি। এই চ্যালেঞ্জ রুজভেল্টের সমস্ত জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল। শুধু তা নয়, জাতির জীবনে চিরন্তন ছাপ ফেলেছিল।

চার্লস সোয়াব এই প্রতিযোগিতার কথা জানতেন। তিনি জানতেন, কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষের সুপ্ত আকাঙ্খাগুলির জন্ম দেয়। আবার অলস্টিথও এই ঘটনার কথা জানতেন।

তিনি এক সময়ে নিউইয়র্কের গর্ভনর ছিলেন। তখন তাঁকে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে, পশ্চিম ডেভিন আইল্যান্ডের সিঙসিঙের ব্যাপারটি তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। এখানে যে জেলখানা ছিল, তার সম্পর্কে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। স্মিথের দরকার ছিল সিঙসিঙকে শাসন করার উপযোগী একজন কড়া মানুষের সন্ধান করা। কিন্তু কাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে?

অনেক ভাবতে ভাবতে তিনি হ্যাম্পটনের উইলকি লজকে ডেকে পাঠালেন।

লজকে প্রশ্ন করলেন—সিঙসিঙ কারাগারের দায়িত্ব নিতে কেমন লাগবে? ওখানে আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষ দরকার।

লজ অবাক হলেন। সিঙসিঙের বিপদের কথা ইতিমধ্যেই তাঁর কানে এসেছে। কাজটার সাথে রাজনীতি জড়িয়ে আছে। আছে জীবনের নানা সূক্ষ্ম ওঠা পড়া। ওয়ার্ডেনরা সেখানে টিকতে পারে না। একজন এসেছে, একজন চলে গেছে। শেষ জন মাত্র তিন সপ্তাহ কাজ করেছিল। এই অবস্থায় তিনি কী ঝুঁকি নেবেন?

স্মিথ লক্ষ করলেন, উনি যেতে চাইছেন না। লজের এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন—আপনার মতো মানুষ যেতে ভয় পাচ্ছেন। এর জন্য অবশ্য আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। জায়গাটা সত্যিই কঠিন। যাক, আমি ভেবেছিলাম আপনি হবেন আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। যখন চাইছেন না তখন আপনার থেকে যোগ্যতর কারোর সন্ধান করতে হবে।

এখানেই আঘাত লাগলো, লজ বুঝতে পারলেন, তাঁর যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। লজ তাই ঘাড় নেড়ে বললেন—না, স্যার, আমি ওখানেই যাবো। এই কাজটাতে আমাকে সফল হতেই হবে।

এর ফল কী হয়েছিল? তিনি সেখানে গেলেন। বহু বছর কাজ করলেন। জীবিত কারারক্ষীদের মধ্যে সবথেকে খ্যাতিমান পুরুষ হিসাবে বিবেচিত হলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বল করে সিঙসিঙ কারাগারে 'কুড়ি বছর' নামে একটি বই লেখেন। এই বইতে কারাগারের জীবন্ত বর্ণনা আছে। এই বইটি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। বেতারে তিনি এই সংক্রান্ত অনেক ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর কারাগারের অভিজ্ঞতা

নিয়ে অনেক চলচ্চিত্র হয়েছে। তাছাড়া, অপরাধীদের সংশোধন করার ব্যাপারে তিনি কয়েকটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই ভাবনা চিন্তার ওপর ভিত্তি করে মার্কিন দেশে ব্যাপক কারাসংস্কার হয়েছিল।

তাহলে? এতো সব ঘটনা ঘটতো না যদি ঐ ভদ্রলোকের গোপন অভিসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে দেওয়া হতো। এই কাজটি সুন্দরভাবে করেছিলেন অলস্মিথ। সেজন্য আমরা তাঁকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাবো।

ফায়ারস্টোন নামে একটি বিখ্যাত রবার প্রতিষ্ঠান আছে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন হারভে এস ফায়ারস্টোন। তিনি বলেছেন—শুধু মাইনে দিয়ে বিখ্যাত আর ভালো মানুষদের ধরে রাখা যায় না। আমার মনে হয়, সকলের মনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক সফল মানুষ একটি জিনিস ভালোবাসেন। তা হলো, আত্মপ্রকাশের সুযোগ মুঠোবন্দী করা। নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে বিজয়ী হওয়া।

তাই বোধহয় ছোট্ট বেলা থেকে আমরা খেলার মাঠে যেতে ভালোবাসি। খেলার মাঠে অনায়াসে একে অপরের মহড়া নিতে পারে। যে কোনো খেলার এটাই হলো মূল কথা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া। সকলের সামনে মাথা উঁচু করে হেঁটে যাওয়া। গলায় সোনার পদক ঝোলানো। আত্মগুরুত্বের এটাই একমাত্র পথ।

অতএব, যদি আপনি শক্তিশালী মানুষদের হৃদয় জয় করতে চান তা হলে তাদের সামনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে, কিছুতেই আপনি জয়ী হতে পারবেন না।

সারাংশ—এতোক্ষণ আমরা মানুষকে স্বমতে আনার বারোটি নিয়ম বলেছি। আসুন, তাঁর একটি সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করা যাক।

প্রথম নিয়ম—কোনো তর্কে জিততে হলে প্রথমেই আপনি কী করবেন? তর্কটাকে দূরে ঠেলে দেবেন। তর্কে যোগ দেবেন না।

দ্বিতীয় নিয়ম—অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। কখনো অপরের ভুল ধরবেন না।

তৃতীয় নিয়ম—যদি কোনো কারণে আপনার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আন্তরিকতার সাথে সেই ভুল স্বীকার করবেন।

চতুর্থ নিয়ম—বন্ধুত্বপূর্ণ পথে যে কোনো আলাপ আলোচনা শুরু করবেন। জানবেন, আলোচনার টেবিলে যে কোনো সমস্যার সমাধা হতে পারে।

পঞ্চম নিয়ম—অপর পক্ষকে হ্যাঁ বলতে দিন। তাহলেই সব সমাধান আপনার হাতের মুঠোয় বন্দী হবে।

ছ'নম্বর নিয়ম—অন্যকেই বেশী কথা বলতে দেবেন। নিজে কখনো বকবক করবেন না।

সাত নম্বর নিয়ম—অপরকে ভাবতে দেবেন। এই প্রয়োগ কুশলতা তার মাথাতেই প্রথম এসেছে।

আট নম্বর নিয়ম—আন্তরিকতার সাথে অপরের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবকিছু বিচার করার চেষ্টা করুন।

ন'নম্বর নিয়ম—অপরের ধারণার প্রতি আরো বেশি আন্তরিক হোন।

দশ নম্বর নিয়ম—অপরের মহত্তের প্রতি আবেদন রাখুন।

এগারো নম্বর নিয়ম—আপনার ভাবনার মধ্যে চমক সৃষ্টি করুন।

বারো নম্বর নিয়ম—সব সময় প্রতিযোগিতার মনোভাব বজায় রাখুন।

বাইশ

যদি কখনো অন্যের দোষ ধরতে চান তাহলে এইভাবে শুরু করতে হবে

এবার আমার এক বন্ধুর কথা বলি। তখন ক্যালভিন পুলিজ ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সেই সময় আমার ঐ বন্ধু ক'দিন হোয়াইট হাউসে অতিথি হিসাবে বাস করেছিলেন।

একদিন তিনি প্রেসিডেন্ট পুলিজের ব্যক্তিগত অফিসে এলেন। দেখলেন, পুলিজ তাঁর সেক্রেটারীকে বলছেন—আজ সকালে তুমি খুব সুন্দর পোশাক পরেছো তো? তোমাকে ভারী ভালো দেখাচ্ছে।

সেক্রেটারী লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। স্বয়ং ক্যালভিন তাকে এতো প্রশংসা করছে? ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারলো না।

পুলিজ আবার বললেন, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। সত্যি সত্যি তোমাকে দেখতে দারুণ সুন্দর লাগছে। এখন থেকে তুমি একটা কাজ করবে কী? ব্যাকরণের দিকে নজর দেবে?

এবার আমার বন্ধু বুঝতে পারলেন, প্রেসিডেন্ট এইভাবেই ভদ্র মহিলাকে শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো উনি কথায় কথায় ব্যাকরণগত ভুল করে ফেলতেন। ডিকটেসান নেবার পর যখন টাইপ করতেন, তখন কমা, ফুলস্টপ কোথায় হবে ইত্যাদি বিষয়ে ঠিক ধারণা রাখতে পারতেন না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সুনিশ্চিত, আজকের পর আর কখনো ওনার কাছ থেকে এই ধরনের ভুল হবে না।

তাহলে? আমরা কী দেখলাম? আমরা দেখলাম, প্রেসিডেন্ট পুলিজ মানুষ সম্পর্কে অশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর টুক করে সেটা প্রয়োগ করে কেমন কাজ হাসিল করলেন।

নাপিত দাড়ি কামাবার আগে কী করে? সে জল দিয়ে ঘষে গালটাকে নরম করে নেয়। কেন? দাড়ি কামানোর সুবিধা হবে বলে তো?

১৮৯৬ সালে ম্যাকিনলে ঠিক এই কাজ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে।

তখনকার একটি বিখ্যাত রিপাবলিকান একটি বক্তৃতার খসড়া তৈরী করেছিলেন। মনে হয়েছিল এর মধ্যে টিনোরাবা ব্যাথিরিক হেনরী ড্যানিয়েল ওস্টোরে বক্তব্য জুড়ে গেছে। তিনি সেটা ম্যাকিনলেকে পড়ে শোনালেন। বক্তৃতাতে ভালো ভালো জিনিস ছিল। তবে ম্যাকিনলে বুঝতে পারলেন, এটা সকলের সামনে বললে হয়তো হাততালির ঝড় উঠবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। ম্যাকিনলে কাউকে আঘাত করতে চাইলেন না। এমন কি ঐ বন্ধুকেও তিনি চটালেন না। দেখুন, কেমন কৌশলে তিনি কাজ হাসিল করেছিলেন। কি করেছিলেন?

তিনি বললেন—প্রিয় বন্ধু, এই বক্তৃতাটা চমৎকার। একথা আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি আরো স্বীকার করছি, এর থেকে ভালো আর কেউ লিখতে পারতো না। অনেক ক্ষেত্রে এটা ঠিক যোগ্য হবে। তুমি যদি মনে করো আমি বক্তৃতা দেবার যোগ্য মানুষ, তাহলে আমার মুখে এইসব শব্দগুলো বসাতে পারো। কিন্তু আমি তো নিজেকে তা মনে করছি না। আমার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। আমার মুখ থেকে যদি এইসব কথার ফুলঝুরি ঝরতে থাকে তাহলে শ্রোতারা কী ভাববে? তারা ভাববে আমি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছি। তাই হে বন্ধু, তুমি আমার মুখে যেমন কথা

শুনলে সেগুলিই লিখে নিয়ে এসো। তাহলে আমি অনেক সহজ সরলভাবে মেঠো বক্তৃতা দিতে পারবো।

বন্ধু নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি যে ওপর চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, এই বোধটাও তার মধ্যে হলো। তিনি আবার বাড়ি চলে গেলেন। ছোটো ছোটো শব্দ দিয়ে সাজিয়ে একটি বক্তৃতা লিখে নিয়ে এলেন। ম্যাকিনলে সেটাই ভাষণ দিলেন। আর, অচিরেই তিনি অসংখ্য মানুষের মন জয় করার কৌশল শিখে ফেললেন।

এখানে আর একটি চিঠি উল্লেখ করছি। এই চিঠিটি লিখেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। চিঠিটা সম্ভবত তিনি বারো মিনিটের মধ্যে লিখেছিলেন। ১৯২৬ সালে এটি নীলামে বারো হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছিল। সেই টাকা লিঙ্কন অর্ধ শতাব্দীর কঠিন পরিশ্রমে সঞ্চয় করতে পারেননি।

তাহলে স্বভাবতই আমাদের মনের ভেতর প্রশ্ন জাগে লিঙ্কনের এই চিঠির কী বৈশিষ্ট্য ছিল যা তাকে মহার্ঘ্য করে তুলেছিল?

চিঠিটা লেখা হয়েছিল ১৮৬৩ সালের ২৬ এপ্রিল। তখন সমস্ত আমেরিকাতে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলছে। যে কোনো সময়ে মহান এই দেশটা দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে। এমন একটা সম্ভাবনা আতঙ্ক ও ত্রাস সকলের মনকে গ্রাস করেছে। আঠারো মাস ধরে লিঙ্কনের সেনাপতিরা ইউনিয়ান বাহিনীকে পরিচালনা করছেন। কিন্তু একটির পর একটি বিষাদময় পরাজয় ঘটে যাচ্ছে। মুখের মতো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। সমস্ত দেশ শিহরিত হচ্ছে। হাজার হাজার সৈন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এমন কি রিপাবলিকান সদস্যরাও সেনেটে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁরা লিঙ্কনকে হোয়াইট হাউস থেকে বিতাড়িত করতে চাইছেন।

লিঙ্কন সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে—মনে হচ্ছিল আমরা যেন একটি ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আমি কোথাও আশার কণামাত্র আলো দেখতে পাচ্ছি না।

অন্ধকারে মাখা এমন এক দিনেই ঐ চিঠিখানা লেখা হয়েছিল।

এই চিঠিটা ছেপে দেওয়া হচ্ছে, কেননা, এর মধ্যে দিয়ে আমরা লিঙ্কনের অনমনীয় মনোভাব দেখতে পাবো। দেখতে পাবো, লিঙ্কন কী করে একজন দুর্দান্ত সেনানায়ককে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ জেনারেলের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক ভাগ্য নির্ভর করছিল।

প্রেসিডেন্ট হবার পর আব্রাহাম লিঙ্কন বোধহয় এই-ই একমাত্র চিঠিতে কড়া ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, তিনি জেনারেল হুকারকে তাঁর মারাত্মক ভুল দেখিয়ে দেবার আগে কীভাবে প্রশংসা করেছিলেন। এইভাবেই হুকারের মন জয় করার চেষ্টা করেছিলেন।

ভুলগুলো মারাত্মক ছিল। এর ফলে আমেরিকাতে আরো বেশী সমস্যা দেখা দিতে পারতো। লিঙ্কন কিন্তু ভুলগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেননি। লিঙ্কন ছিলেন রক্ষণশীল। কূটনৈতিক বুদ্ধিতে সবার সেরা।

তিনি লিখেছিলেন—এমন কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে, হয়তো আপনার অনিচ্ছাকৃতভাবে, যাতে আপনার ওপর আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।

একেই কৌশলের রণনীতি বলা যেতে পারে।

এবার চিঠিখানা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

আপনাকে আমি পটোম্যাকের সেনা বিভাগের প্রধানের আসনে বসিয়েছি। অবশ্য এর

মধ্যে আমার কোনো করুণা বা দয়া প্রদর্শন ছিল না। আপনি নিজেও যোগ্যতা বলে এই অত্যন্ত ঈন্সিতপদে আসীন হয়েছেন। আপনার চরিত্রের মধ্যে বিরলতম কয়েকটি গুণের আশ্চর্য সমাহার ঘটে গেছে। কিন্তু, আপনাকে একটি কঠিন সত্য শুনিয়ে রাখি। আপনার সাম্প্রতিক কাজে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, আপনি একজন দক্ষ এবং সাহসী সৈনিক। রণক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে পারেন। এ ব্যাপারটাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আর একটি ব্যাপার আপনার মধ্যে আছে, সেটিও আপনার চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা হলো, আপনি কখনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খার সাথে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলেন না। নিজের ওপর অগাধ আস্থা আছে আমার। এটি প্রতিটি মানুষের জীবনের অত্যন্ত দামী গুণ।

আপনি উচ্চাকাঙ্খী। একজন সব সময় ভালো পথে থাকার চেষ্টা করেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার ভুল হয়ে যায়। জেনারেল বানসাইট যখন সেনাপতি ছিলেন, তখন আপনি আপনার উচ্চাকাঙ্খার ওপর নির্ভর করে তার পরিকল্পনা বানচাল করতে চেয়েছিলেন। সেটা করতে গিয়ে পরোক্ষে দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এবং এর পাশাপাশি আপনি একজন সহ অফিসারেরও ক্ষতিসাধন করেছেন।

আমি শুনেছি, এই বিষয়ে আপনি অনুতপ্ত। সম্প্রতি একটি মন্তব্যে আপনার এই মনোভাবের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আপনি বলেছেন, সেনাবাহিনী এবং সরকার, এই দুয়ের একজনই অধিনায়ক থাকা দরকার। অবশ্য, এটা জানার পরেও আপনার পদোন্নতি ঘটে গেছে। তার অন্তরালে আমার পরোক্ষ সহানুভূতি এবং সমর্থন ছিল।

আমি জানি, একমাত্র সেইসব জেনারেলরাই সফল হন, যাঁরা একনায়ক হতে পারেন। সামরিক সাফল্যের জন্যে আমি তাই একনায়কত্বকেই বেছে নেবো।

সরকার আপনাকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে। কিন্তু তাঁর বিনিময়ে সরকার আপনার কাছ থেকে কী আশা করবে?

এতো পর্যন্ত শুনে আপনি হয়তো মন্তব্য করবেন, আমি তো পুলিজ, ম্যাকিনলে বা লিঙ্কন নই। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এই দর্শন প্রয়োগ করা যাবে কী?

আসুন, আমরা ফিলাডেলফিয়ার ওয়ার্ণওয়ার্ক কোম্পানীর ডবলিও পি গগের সঙ্গে দেখা করি।

মনে রাখবেন, গগ কিন্তু আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি একবার আমার ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। তখনই এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।

ওয়ার্ক কোম্পানী একটি বিরাট বাড়ি তৈরির কাজে যোগ দিয়েছিল। বাড়ির কাজ ঠিকমতো এগিয়ে চলেছে। কাজটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ এক সরবরাহকারী এসে জানালো, সে কারুকাজ করা ব্রোঞ্জের জিনিসগুলো বাইরে লাগাবার জন্য সময় দিতে পারবে না।

তার মানে? বাড়ির কাজটা অসম্পূর্ণ থাকবে। অনেক জরিমানা হবে। কোম্পানীকে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। একজনের জন্যে কোম্পানীর সুনাম ভূলুণ্ঠিত হবে।

এবার কী হলো? দূরভাষ ঝঙ্কৃত হলো। দূরগামী টেলিফোনে কথোপকথন শুরু হলো। তর্কাতর্কি বেঁধে গেল। কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত, মি. গগ আসরে নামলেন। তিনি সব ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলেন।

তাঁর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যে কোম্পানী ঐ ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরী করে, সেই কোম্পানীর সর্বময় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

গগ ঠিক সময়ে তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

তিনি বললেন—স্যার, আপনি কী জানেন ব্রুকলিনে আপনার নামে আর কেউ নেই?

প্রেসিডেন্ট একটু অবাক হলেন—না, এটা জানতাম না তো।

মি. গগ গদ গদ হয়ে বললেন—টেলিফোন বইয়ে আপনার ঠিকানা দেখছিলাম। দেখলাম, এই নামের মানুষ আর কেউ ব্রুকলীনে নেই।

টেলিফোন বইটা প্রেসিডেন্ট দেখলেন। সাগ্রহের সঙ্গে বললেন—যাক, এটা তো আমার জানা ছিল না। তবে আমার নাম আর পদবীটা একটু অসাধারণ। হল্যান্ড থেকে আমাদের পরিবার দুশো বছর আগে নিউইয়র্কে এসেছিল।

এবার তিনি অতীতের স্মৃতিচারণায় ডুবে গেলেন। গগ চুপটি করে শুনতে থাকলেন। তাঁর কথা শেষ হলো, গগ এবার কারখানাটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন—এই জাতীয় যতগুলো কারখানা আমি দেখেছি এটি সর্বোত্তম। এটা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই।

প্রেসিডেন্ট বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। জানেন কত বিনিদ্র রজনীর প্রয়াসে এই কারখানাটিকে আমি গড়ে তুলেছি। এই কারখানাটা নিয়ে আমার মনে একটা চাপা গর্ব আছে।

গগ এবার জিনিসপত্র তৈরীর কৌশল দেখে আরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। গগ মেশিনগুলো দেখলেন। প্রেসিডেন্ট জানালেন, এইসব মেশিনের অধিকাংশই তাঁর আবিষ্কার।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে গগের সাথে আলোচনা করলেন। গগকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণও করলেন।

প্রেসিডেন্ট জানতেন, গগ ওখানে কেন গেছেন। এবার সোজাসুজি কাজের কথায় এসে গেল।

প্রেসিডেন্ট বললেন—আমি বুঝতে পারছি, কী জন্য আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি ভাবতে পারিনি, আমাদের সাক্ষাতকার এতো সুন্দর হবে। আপনার মতো একটা খোলা মনের মানুষের সাথে দেখা হবে। আপনি ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে যান। কোনোরকম চিন্তা করবেন না। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা ব্রোঞ্জের প্যানেলগুলো পাঠিয়ে দেবো।

তাহলে কী হলো? না চাইতেই গগ সবকিছু পেয়ে গেলেন। সময় মতো জিনিসপত্র পৌঁছে গেল। চুক্তি মতো বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হলো।

তাহলে? গগ কি অসাধারণ কেউ? তিনি যদি এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করে থাকেন, তাহলে আমি কেন পারবো না?

তাহলে? প্রশংসা আর আন্তরিকতা দিয়ে যে কোনো কাজ শুরু করতে হবে। দেখবেন, অভাবিত ফল হাতেনাতে পাচ্ছেন।

তেইশ

ঘৃণার সৃষ্টি না করে কীভাবে সমালোচনা করা যায়

অনেক সময় দেখা গেছে, কোনো কাজের জন্যে সমালোচনা করতে হয়। তা না হলে, কাজটি ত্রুটিযুক্ত থেকে যায়।

এই প্রসঙ্গে আমি আবার চার্লস সোয়াবের কথা বলবো। তিনি একবার তাঁর কারখানা

পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। দেখলেন, কিছু শ্রমিক কর্মচারী ধূমপান করছে। অথচ, কারখানার ওপর পরিষ্কার লেখা আছে—ধূমপান নিষেধ।

সোয়াব কি লেখাটা দেখিয়ে বলবেন—তোমরা কী পড়তে জানো না?

সোয়াব এমনটি ছিলেন না। তিনি কর্মচারীদের কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে চুরুট ধরিয়েছিলেন। বললেন—আমি বুঝতে পারছি, যারা ধূমপায়ী, নেশা না করলে তাদের মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা ফ্যাক্টরীর বাইরে গিয়ে চুরুটটা খেয়ো।

যারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে, কাজটা কত অন্যায়, তারা আর চুরুটটা ধরাতে পারলো না। কেননা, সোয়াব কারো আত্মঅহমিকাতে আঘাত করেননি। এমনকি তিনি কাউকে জোর করে ধূমপান থেকে বিরত করার চেষ্টা করেননি। এমন লোককে আপনি ভালো না বেসে থাকতে পারবেন না।

জন ওয়ানামেকার একই পদ্ধতি নিয়েছিলেন। তিনি ফিলাডেলফিয়াতে তাঁর বিরাট দোকান ঘুরে ঘুরে দেখলেন। একদিন তিনি দেখলেন, একজন ক্রেতা কোনো একটি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বিক্রেতার পাত্তা নেই। তারা এক পাশে জটলা করে হাসিঠাট্টায় মত্ত। ওয়ানামেকার কোনো কথা বললেন না। তিনি নিঃশব্দে কাউন্টারের পেছনে গেলেন। মেয়েটির যা দরকার ছিল তা এনে দিলেন।

ইতিমধ্যে কর্মচারীরা তাঁকে দেখতে পেল। তারা নিজের কাজে দুঃখ প্রকাশ করলো। ব্যাপারটার সন্তোষজনক সমাধান ঘটে গেলো।

১৮৮৭ সালের ৮ই মার্চ। হেনরি ওয়ার্ড রিচার্ড মারা গেলেন। জাপানীদের ভাষায় তিনি একটি নতুন জগতে প্রবেশ করলেন। পরের রবিবার লিমান অ্যাবেটকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আবেদন করা হলো।

লিমান ট্রয়বারের মতোই ঘষামাজা করে দারুণ সুন্দর একটা বক্তৃতা লিখলেন। এটা তাঁর স্ত্রীকে পরে শোনালেন। স্ত্রীর যদি বুদ্ধি কম থাকতো, তাহলে তিনি বলতেন, লিমান, লেখাটা একদম ভালো হয়নি। শ্রোতারা এটা শুনলে ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী তা করলেন না। তিনি কী করলেন? তিনি বললেন—এই লেখাটা তুমি নর্থ অ্যামেরিকান রিভিউতে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু এটা বক্তৃতার মতো হয়নি।

লিমান অ্যাবট ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি বক্তৃতাটা ছিঁড়ে ফেললেন। কিছু না লিখে টানা ভাষণ দিয়ে গেলেন। ভাষণ শেষ হতে দেখলেন, সমবেত সকলের চোখে অশ্রুর উদ্গত ইশারা।

তাহলে? মানুষের দোষ ঘোরানো পথেই দেখাতে হবে। ঘৃণার সৃষ্টি না করে সমালোচনা করতে হবে।

চব্বিশ

আগে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করুন

কয়েক বছর আগের কথা। আমার ভাইঝি জোসেফাইন কার্নেগী কানসাস সিটির বাড়ি থেকে নিউইয়র্কে এলো। সে আমার সেক্রেটারীর কাজ করতে চাইছে।

তার তখন বয়স উনিশ বছর। তিন বছর আগে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাতক হয়েছিল। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার ঝুলি ছিল একেবারে শূন্য।

আজ কী হয়েছে? আজ সে সুয়েজ খালের পশ্চিম এলাকায় সবথেকে সেরা একজন

সেক্রেটারী। অথচ প্রথম দিকে সে কিছুই জানতো না।

আমি তার কাজের সমালোচনা করতাম। একদিন আমি নিজেকেই বললাম—দাঁড়াও, তোমার বয়সে জোসেফাইনের দুইগুণ। তোমার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি। তুমি কি করে আশা করছো, সে এতো তাড়াতাড়ি তোমাকে ধরে ফেলবে? তুমি কি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারবে না? ডেল, চোখ বন্ধ করে তোমার ফেলে আসা উনিশ বছরের কথা ভাবো তো? তোমার কী মনে পড়ে না সেদিনের সেই দিনগুলো? যার জন্যে তুমি এখন নিজেকে তিরস্কার করো। বোকার মতো সেইসব ভুল?

বেশ কিছুক্ষণ আমি মাথা ঠাণ্ডা করে এসব কথা চিন্তা করলাম। নিরপেক্ষতার সাথে গোটা পরিস্থিতিটার ওপর আলোকপাত করলাম। আমি শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এলাম, জোসেফাইন-এর ব্যাটিং-এর গড় আমার উনিশ বছরের ব্যাটিং-এর গড়ের থেকে অনেক ভালো। আর, আমি কিনা তাকে তার প্রাপ্য প্রশংসা দিতে চাইছি না?

অতএব, আমি জোসেফাইনের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য আরো আন্তরিক হলাম। আমি বললাম, জোসেফাইন, এটা তোমার ভুল হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এই ভুলটা তোমার আর হবে না। তুমি এখন খুব বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারোনি। তবে একটা কথা আমি স্বীকার করছি, তোমার বয়সে আমি যতটা অনভিজ্ঞ ছিলাম, তুমি কিন্তু তেমনটি নও। আমি তখন যা তা ভুল করতাম। তুমি কিন্তু অতটা ভুল করো না।

এটাই হলো সহজ কথা। কাউকে ভুল ধরিয়ে দিতে গেলে আগে নিজের ভুলের কথা বলতে হবে।

১৯০১ সাল। হ্রিস ফনবুলো এই জাতীয় ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ছিলেন জার্মান। ইম্পেরিয়াল চ্যান্সেলার। সিংহাসনে তখন আসীন ছিলেন রাজা দ্বিতীয় উইলহেলম। তিনি ছিলেন অহঙ্কারী আর বদমেজাজী। এই উইলহেলম ছিলেন জার্মান কাইজারদের মধ্যে সর্বশেষ মহাশক্তিশালী সেনাদলের অধ্যক্ষ। তিনি একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই বাহিনী নিয়ে তাঁর অহঙ্কারের অন্ত ছিল না।

তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। কাইজার এমন এক কথা বলতে লাগলেন যে সমস্ত ইউরোপে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সারা পৃথিবী জুড়ে তার রেশ ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা আরো খারাপ দিকে এগিয়ে গেল। কাইজার আবার অহঙ্কারী ভাষণ দিতে থাকলেন। জনসাধারণের সামনে অদ্ভুত ঘোষণা করতে থাকলেন।

ইংল্যান্ডে গিয়েও তিনি এসব কথা বললেন। আর এইসব ভাষণ ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হতে থাকলো।

উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, তিনি বলেছিলেন—জার্মানদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি ইংল্যান্ডের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি জাপানের বিপদের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী গড়ে তুলেছেন। তিনিই একমাত্র লোক, যিনি রাশিয়া আর ফ্রান্সের হাতে ইংল্যান্ডের হেনস্তা আটকাতে পারবেন। একমাত্র তাঁরই পরিকল্পনায় ইংল্যান্ডের মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

একশো বছরের শান্তির মধ্যে কোনো ইউরোপীয় রাজার মুখ থেকে এই ধরনের আত্মগর্বী ভাষণ বেরিয়ে আসেনি। সারাদেশে এই নিয়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হলো। ইংল্যান্ডের সকলে ক্ষেপে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। জার্মানি রাজনীতিকেরা ভয় পেলেন। কাইজারও ভয় পেলেন। ইম্পেরিয়াল চ্যান্সেলার ফনবুলোকে বললেন—তিনি যেন সকলকে জানিয়ে দেন, কাইজার যা কিছু কথা বলেছেন, তার দায়-দায়িত্ব ফনবুলোকে গ্রহণ করতে হবে। তিনি সম্রাটকে ঐসব অদ্ভুত কথা বলার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

ফনবুলো প্রতিবাদ করলেন তিনি বললেন। মহান সম্রাট, জার্মানি বা ইংল্যান্ডের কোনো মানুষ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমি আপনাকে এমন উপদেশ দেবো? আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে?

ফনবুলোর মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরিয়ে এলো। পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি ভীষণ ভুল করেছেন। কাইজার ক্ষেপে গেলেন।

কাইজার চিৎকার করে বললেন—তুমি কি আমাকে গাধা বলে মনে করো? তুমি যে ভুল করতে পারো না বলে ভাবো, আমি সেই ভুল করবো?

ফনবুলো বুঝলেন, সমালোচনার আগে উচিত ছিল, কাইজারের প্রশংসা করা। তবে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তিনি আবার প্রশংসা করতে শুরু করলেন। এতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল।

ফনবুলো বলতে থাকলেন—আমি কখনোই তা বলছি না। অনেক ব্যাপারেই আপনার শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবীর মানুষ মেনে নিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনার অনুসন্ধিৎসার কথা সকলেই জানে। আমি কতবার শুনেছি, আপনি কী চমৎকার ভাবে ব্যারোমিটার, বেতার টেলিগ্রাফ বা রঞ্জন রশ্মি সম্পর্কে আলোচনা করছেন। রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যায় আমার কোন জ্ঞানই নেই। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কেও আমি একটা কথা বলতে পারবো না।

ফনবুলোর কথা শুনে কাইজার অবাক হলেন। সত্যিই তো, তাঁর এতো জ্ঞান আছে, অথচ সকলে তাঁকে আত্মগর্বী বলে ভুল করছে।

কাইজার খুশি হলেন। ফনবুলোর প্রশংসা তাঁর মনকে একেবারে পাল্টে দিলো। ফনবুলো তাঁকে আকাশে তুলে দিয়েছেন। এরপর কাইজার ফনবুলোর যে কোনো অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন।

তিনি উৎসাহের সাথে বলে উঠলেন—তোমাকে বলিনি যে আমরা দু'জনে দু'জনের পরিপূরক?

তিনি ফনবুলোর সাথে বারবার করমর্দন করলেন। শুধু তাই নয়। তিনি চিৎকার করে বললেন, আজ থেকে যদি কেউ প্রিন্স ফনবুলোর বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে আমি তার নাকে একটা ঘুষি মারবো।

এভাবেই একজন কুশলী কূটনীতিকের মতো ফনবুলো নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কোনো মানুষকে সমালোচনা করতে গেলে আগে প্রশংসা করা উচিত। এইভাবে সমালোচনার পথ প্রশস্ত করা দরকার।

তাহলে? আমরা এই নিয়মটা অবশ্যই পালন করবো। তা হলো— অপরের সমালোচনা করার আগে তার প্রশংসা করুন।

পঁচিশ

কেউ হুকুম পছন্দ করে না

সম্প্রতি আমি আমেরিকার বিখ্যাত জীবনী লেখিকা ডিন মিস ইডা টারবেলের সঙ্গে একটি ডিনারে অংশ নিয়েছিলাম।

তিনি আমাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছিলেন। আমায় তিনি জানালেন তখন তিনি ওয়েল ডি ইয়ং-এর জীবনী রচনা করছিলেন। ইয়ং-এর ছোটো ভাইকে তিনি তিন ঘণ্টা ধরে

সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক একটি ভালো কথা জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, ইয়ং কাউকে সরাসরি কোনো হুকুম করেননি। তিনি কেবল উপদেশ দান করতেন। ইয়ং জি কখনোই বলতেন না, এটা করো বা সেটা করো না। সব সময় তিনি বলতেন, এটা করলে বোধহয় তোমার ভালো হবে। ওটা করলে তুমি হয়তো কিছুটা সফল হবে।

কোনো চিঠি লিখতে গিয়ে শেষ হলে তিনি বলতেন—এটা তোমার কী রকম মনে হয়? তুমি যদি মনে করো তাহলে চিঠির ভাষাটা আর একটু মোলায়েম করতে পারি।

তিনি প্রায়ই লোকের ভুল ধরতেন। অথচ কেউ তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হতো না।

এই হলো মানুষের আর একটি স্বভাব। কেউই সরাসরি শোধিত হতে পছন্দ করে না। তাই কখনোই কাউকে হুকুম করবেন না!

সুতরাং, এই নিয়মও আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো, কাউকে অসন্তুষ্ট করলে আমরা কখনোই ইপ্সিত ফল লাভ করতে পারবো না।

ছাব্বিশ

অপরকে মুখরক্ষা করতে দিতে হবে

আসুন, এবার চার্লস স্টাইনমেজের কথা বলা যাক। তিনি ছিলেন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর ডিপার্টমেন্টের প্রধান। হিসাবরক্ষা দপ্তরের সর্বময় কর্তা হিসাবে দারুণ কাজ করতেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ। কোম্পানী তাঁকে কোনো ভাবে আঘাত দিতে চায়নি। কোম্পানীর কাজে সাথে তিনি নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছিলেন। তাই তারা স্টাইনমেজকে একটি পদবী দিলেন। বলা হলো, তিনি হবেন কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার। এই নতুন পদে তিনি ভালোই কাজ করছিলেন। অন্য একজনকে ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

জেনারেল ইলেকট্রিকের অফিসাররাও তাঁর পদোন্নতিতে খুব খুশী হয়েছিলেন। কেননা, তিনি কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি না করে যে কোনো বড়ো বড়ো কাজ চোখের নিমেষে করতে পারতেন।

তাহলে, এখানে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, চার্লস স্টাইনমেজকে মুখরক্ষা করতে দেওয়া হলো।

আমরা সাধারণত এই ব্যাপারটা ভেবেই দেখি না। অন্যের মান অপমানের দিকে তাকাই না। এতে কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। আমরা যদি আর একটু সহানুভূতির সঙ্গে অন্যের মন বোঝাবার চেষ্টা করি, তাহলে সেই মানুষটিকে দিয়ে অনেক আপাত অবিশ্বাস্য কাজ করা যেতে পারে।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, কোনো কর্মচারীকে পদচ্যুত করার আগে দু'বার ভাবা প্রয়োজন। কেননা, এই পথ অবনতি তার মানসিকতাকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করতে পারে। তিনি আগের মতো আর কর্মক্ষম নাও থাকতে পারেন।

আমার এক বন্ধু এ গেজার বলেছেন—মানুষকে কর্মচ্যুত করাটা তামাশার ব্যাপার নয়। বরখাস্ত হওয়া তো আরো নয়। তিনি হলেন এক পাবলিক অ্যাকাউনটেন্ট।

এখানে তাঁর একটি চিঠির উল্লেখ করছি—আমাদের ব্যবসা বছরের সব সময় চলে

না, তাই মার্চ মাসে অনেককে ছেড়ে দিতে হয়। আমাদের ব্যবসাতে একটা চলতি কথা আছে। কেউ কুড়ুল চালিয়ে আনন্দ পায় না। তার ফলে এখানে একটা অলিখিত নিয়ম গড়ে উঠেছে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হাতের কাজ শেষ করতে হবে।

তাই যখন আমাদের কাউকে বরখাস্ত করা হয়, তখন বড়কর্তা বলেন—মি. স্মিথ, মরশুম কেটে গেছে। এখন তো আপনাকে আর দরকার নেই।

যাদের কথাগুলো বলা হয়, অবশ্যই তাদের কানে এগুলো শ্রুতিমধুর লাগে না। তারা ভাবতেই পারে, এভাবে তাদের ঠকানো হচ্ছে।

আমি সম্প্রতি ঠিক করলাম, কর্মচারীদের সাথে একটু বুদ্ধি করে কথা বলতে হবে। আমি প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকদিন কথা বলবো। তারপর বলবো, মি. স্মিথ, আপনি চমৎকার কাজ করেছেন। সেবার যখন আপনাকে নিউইয়র্কে পাঠাই তখন একটা কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আপনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে সেই কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তুলে দিয়েছিলেন। আপনার এই কাজের জন্য আমরা খুব গর্বিত। কিন্তু আপনি তো জানেন, কোম্পানী বারো মাস কাজ পায় না। আপাতত আপনাকে আমরা কাজে বহাল করতে পারছি না। তবে যখনই আবার কাজের চাপ পড়বে, তখন সবার আগে আপনাকেই ডেকে আনা হবে। আমরা চাই, আপনি আমাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

এর ফলে কী হলো? এর ফলে কর্মচ্যুত কর্মচারীরা কখনো আমাদের বৈরীভাবাপন্ন হলো না। তারা বুঝতে পারলো, নেহাৎ নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছে। কিন্তু পরে আবার তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

ডোয়াইট মরো ছিলেন এক বিশিষ্ট মানুষ। তিনি কায়দা করে দুই শত্রুর মধ্যে মিলনের সরণী রচনা করতেন। কীভাবে সেটা করতেন? তিনি জানেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু কিছু গুণ আছে, যার জন্যে সে প্রশংসা পেতে পারে। আবার কিছু দোষ আছে, যার জন্যে তাকে নিন্দা করা উচিত। তিনি কায়দা করে দুই বন্ধুকে এক টেবিলে বসাতেন। প্রথমে প্রশংসাযোগ্য গুণগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। দেখা যেতো, পরস্পর পরস্পরকে তারিফ করতে শুরু করেছে।

১৯২২ সাল। তিক্ততা শত্রুতার শত শত বছর পর তুর্কীরা গ্রীকদের তুর্কীস্থান থেকে চিরকালের মতো তাড়াবার জন্যে চেষ্টা করলো।

মুস্তাফা কামাল একবার তাঁর সেনাদলের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন—আমাদের লক্ষ্য হলো ভূমধ্যসাগর।

তখন গ্রীক এবং তুর্কীদের মধ্যে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। দু'দলই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে বদ্ধপরিকর ছিল। এই যুদ্ধে তুর্কীরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। দু'জন গ্রীক সেনাপতি—ক্রিকুপিস এবং সেয়োনিস কামালের সদর দপ্তরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যান। পরাজিত শত্রুদের ভীষণভাবে অভিশাপ দেওয়া হতে থাকে।

কামালের ব্যবহারে কিন্তু বিজয়ীর অহঙ্কারের ছাপ ছিল না।

তিনি এই দুই পরাজিত গ্রীক সেনাপতিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে রাজদরবারে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বুঝতে পারছি, আপনারা এখন পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত, যুদ্ধ হলো একটা খেলার মতো। শ্রেষ্ঠ সেনার দল অনেক সময় পরাজয় বহন করে।

তাহলে কী হলো? উনি চরম সঙ্কিক্ষণে দাঁড়িয়েও মনে রেখেছেন—অপরকে মুখরক্ষা করতে দিতে হবে।

সাতাশ

মানুষ কীভাবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে

আমি বিগ বার্লোকে চিনতাম। বিগ বার্লো কুকুর আর ঘোড়ার খেলা দেখাতে ভালোবাসতেন। তিনি সার্কাস নিয়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

বিগ নতুন নতুন কুকুরকে শিক্ষা দিতেন। রাস্তার হিংস্র বন্য কুকুরেরা তাঁর অত্যন্ত অনুগামী হয়ে উঠতো। আমি লক্ষ্য করতাম, কোনো কুকুর একটু উন্নতি করলেই বিগ তাঁকে প্রশংসা করতেন। তাকে বড়ো মাংসের টুকরো খেতে দিতেন। কুকুরটার মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন।

পশুদের এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। কখনো খাবারের লোভ দেখিয়ে। কখনো গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে।

কুকুরদের শিক্ষার কেত্রটা আমরা কি মানুষদের প্রতি প্রয়োগ করতে পারবো না?

চাবুকের বদলে মাংস দিলে কেমন হয়? সমালোচনার বদলে যদি প্রশংসা করা হয়।

ওয়ার্ডেন লুইস ই লজ দেখেছেন—সামান্য প্রশংসাতে অসামান্য কাজ হয়। তিনি ছিলেন সিংসিং কারাগারের এক রক্ষী। আমি যখন এই পরিচ্ছেদটা রচনা করছিলাম তখন তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম।

সেই চিঠির মধ্যে লেখা ছিল, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অপরাধীদের যদি প্রশংসা করা হয়, তাহলে তাদের অপরাধ প্রবণতা অনেকখানি কমে যায়।

আমাকে এখনো সিংসিং-এ ভর্তি করা হয়নি। অন্তত এখনো নয়। তবুও নিজের অতীতটাকে যখন মনের পর্দায় দেখি, তখন দেখতে পাই, এক-একটি কথা কেমনভাবে জীবনের পথ পাল্টে দেয়।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আগে নেপলসের বারো বছরের একটি ছেলে কোনো কারখানায় কাজ করতো। তার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল, বড়ো হয়ে সে একজন গায়ক হবে। কিন্তু তার প্রথম শিক্ষক এই ব্যাপারে তাকে মোটেই উৎসাহ দিতেন না। তিনি বলতেন—তুমি গাইতে পারো না। তোমার গানের কোনো গলা নেই। তোমার গলার স্বর জানলার খড়খড়ির শব্দের মতো।

কিন্তু ছেলেটির মা চাইতো, সে যেন এক নামকরা সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক। মা ছিল গরীব চাষীর মেয়ে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারতো না। শেষ পর্যন্ত মা অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যেও ছেলের গাইবার ব্যবস্থা করে। গরীব চাষী মার উৎসাহ এবং প্রশংসা ছেলেটির জীবনধারা একেবারে পাল্টে দিয়েছিল।

তার নাম শুনে আপনারা হয়তো চমকে উঠবেন। তিনি হলেন কারুসো।

এবার লণ্ডন শহরের এক তরুণের গল্প বলি। সে লেখক হতে চাইছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তার সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করেছিল। চার বছরের বেশী স্কুলে পড়ার সুযোগ তার হয়নি। দেনা শোধ করতে না পারার জন্যে তার বাবার জেল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটিও দারিদ্রের কষাঘাতে বারবার জর্জরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও, মন থেকে এই আশার আলোটিকে সে নিভিয়ে ফেলতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত সে কোথায় চাকরি পেলো? ইঁদুরের বিষ তৈরীর একটি ফ্যাক্টরীতে। তার কাজ ছিল, বোতলে লেবেল আটকানো। রাতের বেলায় সে চিলেকোঠায় ঘুমোতো। জায়গাটা ছিল লণ্ডনের এক ঘিঞ্জি বস্তি এলাকা।

তখনো তার লেখার চিন্তাটা মাথা থেকে যায়নি। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতো। সারারাত জেগে জেগে গল্প লিখতো। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অফিসে পাঠাতো। একটির পর একটি গল্প অমনোনীত হতে থাকে। অবশেষে হলো সেই বিরাট দিন। সেদিন তার প্রথম লেখাটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলো। এজন্য সে এক শিলিংও পারিশ্রমিক পায়নি। কিন্তু তার মনোজগতে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। সম্পাদক তার লেখাটিকে প্রশংসা করে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটি এতো বিচলিত বোধ করলো। সে রাস্তার উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো। আর চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়লো।

এই গল্প ছাপা হওয়াতে তার জীবনটা নতুন একটি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ালো। যদি এই ঘটনাটি না ঘটতো, তাহলে বিশ্বসাহিত্য একজন অমর লেখককে হারাতো। এবার কি আপনারা সেই ছেলেটির নাম শুনবেন? তিনি হলেন স্বয়ং চার্লস ডিকেন্স।

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। লন্ডনের একটি গুদামে আর একটি ছেলে কাজ করতো। সকাল পাঁচটায় তাকে উঠতে হতো। গুদাম পরিষ্কার করতে হতো। সারাদিন দাঁতে দাঁত চেপে চোদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হতো। দুঃখের এই জীবনকে সে ঘৃণা করতো। দু'বছর পর আর এটা তার সহ্য হলো না।

সে একদিন সকালবেলা পনেরো মাইল হেঁটে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেল। মা একটি বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করেন।

ছেলেটি প্রায় উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে কেঁদে কেটে মাকে নানাভাবে বোঝালো। সে বললো—ঐ গুদামে থাকলে সে আত্মহত্যা করবে।

তারপর সে তার আগের স্কুল শিক্ষককে একটি লম্বা চিঠি পাঠালো। তার বুক ভেঙে গেছে। তার আশা জলাঞ্জলি হয়ে গেছে। সে আর এক মুহূর্ত পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে চায় না।

পুরোনো শিক্ষক এই চিঠি পেয়ে সত্যি সত্যি আহত হলেন। তিনি ছেলেটিকে প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। তিনি বললেন—এখনই ভেঙে পড়ো না। তোমার অনেক কাজ বাকি আছে। আমি তোমাকে একটা শিক্ষকের চাকরী দেবো।

এই প্রশংসা ছেলেটির জীবনকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরাজী সাহিত্যের বুকে চিরস্থায়ী নাম করেছিলেন। তিনি সাতাত্তরটি বই লিখেছিলেন। কলমের জোরে দশ লক্ষ ডলার আয় করেছিলেন। তিনি হলেন এইচ. জি. ওয়েলস।

১৯২২ সাল। এক তরুণ ক্যালিফোর্নিয়াতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রচণ্ড কষ্টে বাস করছেন। তিনি গীর্জায় প্রতি রবিবার গান গাইতেন। পাঁচ ডলারের মতো আয় করতেন। মাঝেমধ্যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়তো।

হাতে পয়সাকড়ি কিছুই ছিল না। তিনি থাকতেন শহরের উপকণ্ঠে আঙুর ক্ষেতের মাঝখানে নড়বড়ে এক বাড়ীতে। এরজন্য মাসে সাড়ে বারো ডলার খরচ হতো। সেই টাকাও তিনি দিতে পারতেন না। দশমাস বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল। অনেক সময় আঙুর খেয়ে দিন কাটাতে হতো। তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, আর গান গাইবেন না। লরী বিক্রির কাজে যোগ দেবেন।

তখনই লিউপার্ট হিউজেসের একটি ছোট্ট প্রশংসা তাঁর জীবনের গতিপথ একেবারে পাল্টে দিয়েছিল।

লিউপার্ট বলেছিলেন—তোমার গানের গলা চমৎকার। তোমার তাল জ্ঞান খুব সুন্দর। তুমি কেন নিউইয়র্কে গিয়ে গান শিখছো না।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, ছোটো ছোটো প্রশংসা কীভাবে আমাদের জীবনকে একেবারে পাল্টে দিতে পারে।

এবার আমরা সেই ছেলেটির জীবনের বাকি গল্প বলি।

ঐ কথায় তিনি এতো উৎসাহিত হয়েছিলেন যে আড়াই হাজার ডলার খরচ করে পূর্বদিকে রওনা হলেন। এখন উনি জগৎ বিখ্যাত একটি সঙ্গীত প্রতিভা। ওনার নাম লরেন্স টিবেট।

প্রত্যেকদিন আমরা যাঁদের সংস্পর্শে আসি, তাঁদের অনেকেই হলেন ছাইচাপা আগুন। আমাদের কাজ হলো ঐ ছাইটাকে সরিয়ে দেওয়া।

আমি কিন্তু কোনো কথা বাড়িয়ে বলছি না। হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমসের জ্ঞানগর্ভ ভাষণটা একবার শুনবেন নাকি? তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবসেরা মনোস্তত্ত্ববিদ এবং দার্শনিক বলা হয়ে থাকে।

তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন—আমাদের কীরকম হওয়া উচিত? আমরা অর্ধেকটা সম্পর্কে সচেতন। মানসিক এবং শারীরিক সম্পদের সামান্য অংশ কাজে লাগাই। বলতে গেলে আমরা সব সময় দাসত্বের সীমারেখার মধ্যে বাস করি। মানুষ অমিত শক্তির অধিকারী। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য নিজের এই তেজ সম্পর্কে সে বিশেষ কিছুই জানে না।

আমরা অবশ্যই বলতে পারি, সামান্য উন্নতিকেই প্রশংসা করুন। মনে রাখবেন, প্রশংসা বাক্য মানুষের মনের বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। ভোরের সূর্য আলো ছড়াতে শুরু করে।

আঠাশ

আবার প্রশংসা করুন

প্রশংসার পর্বটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। এবার আমার জনৈক বান্ধবী আরনেস জেন্টের কথা বলি। তিনি নিউইয়র্কে তাঁর বাড়ীতে এক পরিচারিকাকে নিয়োগ করেছিলেন। পরের সোমবার থেকে ঐ মেয়েটিকে কাজ করতে বলেন।

ইতিমধ্যে মিসেস জেন্ট তার আগেকার নিয়োগ কর্তাকে ফোন করলেন। মেয়েটি সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাইলেন।

তিনি পূর্ণ প্রশংসাপত্র পেলেন না।

সোমবার মেয়েটি কাজ করতে এলো। মিসেস জেন্ট বললেন—নেলি, তুমি আগে যে বাড়ীতে কাজ করেছিলে, সেখানে ফোন করেছিলাম। তোমার আগেকার গৃহকর্ত্রী বলছেন, তুমি সৎ আর বিশ্বাসী। ভালো রান্নাও করো। আর বাচ্চাদের যত্ন করো। কিন্তু তুমি ভালো পোশাক পরো না। বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখো না। আমার মনে হয় তিনি মিথ্যে বলেছেন। তুমি যে ভালোভাবে নিজেকে সাজাতে জানো, তা তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। আমি বাজি ধরতে পারি, পোশাকের মতোই তুমি বাড়ী পরিষ্কার রাখো। কী নেলি, রাখো না?

নেলি এই কথা শুনে একেবারে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, তার আগের দিদিমনি তার সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছেন। তবু সে কুণ্ঠিতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এতে কী হলো? বান্ধবী হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন—বাড়ী পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তার আর কোনোদিন সমস্যা হয়নি।

বলডুইং মোটর কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্যামুয়েল হাউপ্লেইন। তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, সাধারণ গুণের মানুষকেও অসাধারণ করা যেতে পারে। যদি সঠিক সময়ে তাকে প্রশংসা করা হয়।

তার মানে? কোনো মানুষের কোনো গুণকে আকাশ উন্নীত করতে হলে সেখানে প্রশংসা করতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে শেক্সপীয়ার বলেছিলেন—কোনো গুণ না থাকলেও এমন ভাব করবেন, যেন ঐ লোকটির মধ্যে অনেক গুণ আছে।

আর গুণ থাকলে তো কথাই নেই। প্রশংসা করে করে সেই গুণটিকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলবেন।

জর্জেস সেভল্যান তাঁর স্মৃতিনিয়রস মাই লাভ উইথ মেটারলিং বইতে এক বেলজিয়ান মেয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনের কাহিনী লিখেছেন।

গল্পটা শোনানোর লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

...কাছাকাছি একটি হোটেলের একটি পরিচারিকা মেয়ে আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসতো। সকলে তাকে ডিম ধোয়া মেরী বলে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো। যেহেতু সকাল থেকে রাত অব্দি তাকে ডিম ধুতে হতো। মেয়েটির শরীরে কতগুলো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তার চোখ ছিল ট্যারা। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতো। বেচারী সব দিক থেকেই প্রতিবন্ধী হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সে আমার কাছে এলো। তার হাতে ম্যাকরোনির প্লেট। আমি সোজাসুজি বললাম—মেরী, তুমি কি জানো, তোমার মধ্যে কত গুণ আছে?

সে নিজের আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করলো। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো। আমার আগে কেউ তার সাথে এমন আবেগপূর্ণ স্বরে কথা বলেনি।

সে প্লেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো—মাদাম, কথাটা বিশ্বাস করতাম না।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, রান্নাঘরে গিয়ে এখন সে নিজের সাথে নিজেই মোকাবিলা করবে। সকলের কাছে ঠাট্টা আর বিদ্রূপ পেতে পেতে সে মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সে চেয়েছিল কেউ একজন তাকে আন্তরিক ভাবে সম্মান জানাল।

পরে সে যখন আমাকে নৈশ আহার দিতে এলো, তার চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করলাম। তার উপোসী যৌবন ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো।

দু'মাস পরে আমি যখন চলে যাচ্ছি, মেরী এসে বললো—মাদাম, শেফের ভাইপোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি একজন লেডি হবো তো?

আমার ছোট্ট কথাই প্রতিবন্ধী মেরীর জীবনধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছিল।

জর্জেস সেভল্যান ডিম ধোয়া মেরীকে সম্মানের পথের পথিক করতে পেরেছিলেন—এর জন্যে তাঁকে কি একটা প্রশংসা করা যেতে পারে না?

হেনরী পল বিসনার ফ্রান্সের আমেরিকান সেনাদলের চরিত্র সংশোধন করার জন্যে একটি নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। সৈনিকদের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ছিলেন জেনারেল জেমস জি হারবার্ট। তিনি বিসনারকে বলেন—তাঁর মতে ফ্রান্সে ২০ লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের সকলেই আদর্শবাদী। এদের মতো সৎ এবং শোভন চরিত্রের কাউকে তিনি জীবনে দেখেননি।

এটি কি অতিরিক্ত প্রশংসা? হয়তো তাই। বিসনার এই প্রশংসাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন বলুন তো?

বিসনার বললেন—ঠিকই বলেছেন। আপনার প্রশংসার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু এই কথাটা সৈন্যদের সামনে বারবার বলবেন।

এই বারবার বলার আশ্চর্য ফল হয়েছিল। সৈন্যরা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারেনি। যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পেরেছিল, সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন থেকেই তারা নিষ্কাবান জীবনধারণে অভ্যাসী হয়ে ওঠে।

ধনী, দরিদ্র, ভিখারী বা চোর, সকলকে যদি আমরা বারবার সৎ বলি, তাহলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে কী ভাবে সৎ হয়ে ওঠা যায়।

সিং সিং কারাগারের ওয়ার্ডেন লজ বলেছিলেন—কোনো দুর্বৃত্তের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তার মনের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। তার সাথে এমন ব্যবহার করুন, যাতে সে নিজেকে একজন সম্মানীয় নাগরিক বলে মনে করতে পারে। সব সময় মনে রাখবেন, ভাগ্য দোষে আজ হয়তো তাকে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু সবদিক থেকে সে আপনার সমান।

অতএব, যদি কাউকে আঘাত বা অসম্মান না করে তার মনোজগতের পরিবর্তন ঘটাতে চান, তাহলে এই নিয়মটা আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে। লোককে ভালো করে প্রশংসা করুন তাহলে সে সত্যি সত্যি ভালো হতে চাইবে।

ঊনত্রিশ

ভুল সংশোধনের পন্থা সহজ করুন

কিছুদিন আগের কথা। আমার বছর চল্লিশের এক অবিবাহিতা বন্ধু বিয়ে করবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু যাকে সে ভালোবাসতো সে তাকে নাচ শিখতে বললো।

বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমার কি সত্যি সত্যি নাচ শেখার দরকার আছে?

কুড়ি বছর আগে সে যখন প্রথম নতুন নাচতো, তখন তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

বন্ধু বলেছিল, প্রথম শিক্ষক বোধহয় আমাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। এখন মনে হচ্ছে। জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

আমি বন্ধুকে বলেছিলাম—জীবনে কখনোই কোনো মুহূর্তকে তুমি শেষ মুহূর্ত বলে ভাববে না। সারাজীবন তুমি এক শিক্ষার্থী হয়ে দিন কাটাতে পারো। অবশ্য তোমার মধ্যে যদি সেই জেদ এবং আগ্রহ বজায় থাকে।

আমি আবার বললাম—তোমার স্বাভাবিক ছন্দ আছে। তুমি নাচিয়ে হওয়ার জন্যে জন্মেছো।

অথচ, আমি জানতাম, সে একজন চতুর্থ শ্রেণীর নাচিয়ে। তা সত্ত্বেও তাকে বারবার উৎসাহিত করলাম।

শেষ পর্যন্ত সে আবার নাচের বিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। কিছুদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করলো।

কোনো দিন কোনো শিশু, স্বামী বা কর্মচারীকে বলবেন না, সে বোকা বা অপদার্থ। কোনো কাজে তার কোনো দক্ষতা নেই। সে সব ভুল করছে। সেক্ষেত্রে কী হবে? উন্নতি করার আন্তরিক ইচ্ছেটেই কর্পূরের মতো উবে যাবে।

বরং যদি আপনি এক আহম্মক কর্মচারীকে বলেন, এই ব্যাপারটা তুমি ভালোভাবে করতে পারবে, হয়তো এমন করে উঠতে পারছো না। ভবিষ্যতে আবার চেষ্টা করে দেখো।

তাহলে কী দেখবেন? তাহলে দেখবেন, শত সহস্র বাধার মধ্যে থেকেও সে কাজটা ভালো ভাবে করার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টা করাটাই হলো আসল। এর থেকেই আপনি শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করতে পারবেন।

লাওয়েল টমাস এই কৌশলটাই কাজে লাগিয়েছিলেন। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁকে একজন যাদুকর বলা হয়ে থাকে। আপনার মধ্যে যদি সামান্যতম সুপ্ত প্রতিভা থাকে, তাহলে তিনি সেখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেন।

আমি সম্প্রতি নিস্টার এবং মিসেস টমাসের সাথে এক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। শনিবার রাতে টুল্লির সামনে বসে আমাকে একটা ব্রিজে খেলায় যোগ দেবার জন্যে ডাকা হলো। আমি ব্রীজ খেলতে পারি না। এই খেলাটা আমার কাছে চিরদিনই রহস্যময় থেকে গেছে।

লাওয়েল বললেন—কেন, এতে তো কোনো কৌশল নেই। শুধু নিজের বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতে হয়। কয়েকটা সংখ্যা স্মরণে রাখতে হয়। তুমি তো স্মৃতিশক্তির ওপর গোটা একটা পরিচ্ছেদ লিখেছো। দেখো, এই খেলাতে অনায়াসে তুমি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, কিছু বোঝার আগেই আমি ব্রীজ খেলার টেবিলে বসে গেলাম। কেননা আমাকে বারবার বলা হয়েছিল, এই খেলাতে আমার সহজাত প্রবৃত্তি আছে। সহজেই আমি খেলাটা শিখে ফেললাম।

এই প্রসঙ্গে আমার এলি কালবার্টসনের কথা মনে পড়ছে। তাঁর নাম তো ঘরে ঘরে। যেখানেই ব্রীজ খেলা, সেখানেই এলির নাম। ব্রীজ খেলা সম্পর্কে তাঁর একটা বই আছে সেই বইটি পৃথিবীর বারোটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। অথচ, তিনি আমাকে বলেন, কোনোদিনই তিনি ব্রীজ খেলাকে জীবিকা বলে গ্রহণ করতেন না, যদি না একজন তরুণী তাঁকে জানাতো, তার মধ্যে খেলার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।

১৯২২ সাল। তিনি আমেরিকাতে এসে দর্শন এবং সমাজবিদ্যা শেখানোর কাজ খুঁজে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তারপর তিনি কী করলেন? তারপর তিনি কয়লা বিক্রির চেষ্টা করেন। এ কাজে তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়।

তারপর তিনি কফি বিক্রি করতে গেলেন। এতেও তিনি সফলতা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি হয়তো একমাত্র ব্রীজ খেলাতেই সফল হবেন। তাই তিনি অচিরেই ব্রীজ খেলা খেললেন। ধীরে ধীরে এই খেলাতে এক কিংবদন্তী খেলোয়াড় হিসাবে পরিণত হলেন।

কিন্তু, এর একটি পটভূমিকা আছে। তিনি এক সুন্দরী ব্রীজ খেলোয়াড়ের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম ডিলন। শেষ পর্যন্ত তিনি ডিলনকেই বিয়ে করেছিলেন। ডিলন দেখলেন। রবার্টসন সতর্ক ভঙ্গীতে তার বিশ্লেষণ করতে থাকেন। ডিলনই প্রথম বলেছিলেন যে রবার্টসনের মধ্যে ভবিষ্যতের এক পাকা ব্রীজ খেলোয়াড় লুকিয়ে আছে।

তার প্রশংসাই রবার্টসনকে ব্রীজ খেলার দিকে টেনে এনেছিল।

অতএব, কাউকে না-চটিয়ে তার দক্ষতা বের করতে গেলে কী করবেন? তাকে বারংবার প্রশংসা করবেন এবং তার সব কাজে উৎসাহ দেবেন। তাহলে দেখবেন নিভে যাওয়া উনুনের আঁচ আবার কেমন গনগনে হয়ে উঠেছে।

ত্রিশ

আনন্দে যা চান অন্যকে দিয়ে তাই কীভাবে করাবেন

১৯১৪ সাল। আমেরিকা প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঘটে চলেছে। মানুষ মানুষকে অকারণে হত্যা করছে। একটি দেশ অন্যদেশের ভূমিখণ্ড দখল করছে।

এই অবস্থায় আসরে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহান প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন। তিনি ভাবলেন, আমি কি যুদ্ধ উন্মাদ জাতির মধ্যে শান্তি দূত হয়ে দাঁড়াবো? পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হলো, এ অতি কঠিন কাজ। যদি তাঁর এই শান্তির বার্তা কেউ না শোনে। তাহলে রাজনীতির দিক থেকে তিনি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন। বিরোধী পক্ষের সকলে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করবে। তবুও উইলসন দমলেন না। তিনি ভাবলেন, কাউকে শান্তির দূত হিসাবে ইউরোপে পাঠাবেন।

উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান ছিলেন সেক্রেটারী অফ স্টেটস। তাঁকে শান্তির প্রবক্তা বলা হতো। ব্রায়ানের ইচ্ছে ছিল, তিনি উইড্রো উইলসনের প্রতিনিধি হয়ে ইউরোপে যাবেন। মানুষের সেবা করবেন। কিন্তু উইলসন তাঁকে পাঠালেন না। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্নেল হাউসকে এই দায়িত্বটা দিলেন।

হাউসের ওপর আর একটি গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাউসকে বলা হয়েছিল, তিনি যেন ব্রায়ানের কাছে গিয়ে এই দুঃখজনক সংবাদটা তাঁকে শুনিয়ে দেন।

কর্নেল হাউস তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন—আমার কাছ থেকে এই খবরটা শুনে ব্রায়ান হতাশ হয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, দেখুন, আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। আপনি ইউরোপে গেলে চারদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে। বিরোধী পক্ষরা চেপে ধরবে। কিন্তু আমি তো আপনার মতো এতো জনপ্রিয় নই। আমি নিঃশব্দে ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরে আসতে পারবো।

আমার কথার মধ্যে এমন যুক্তি ছিল, দেখা গেল, তিনি মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং তাঁর পদমর্যাদা নিয়ে প্রেসিডেন্ট এতোখানি চিন্তিত, এই গোপন খবরটা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তাহলে কী হলো? কীভাবে একজন মানুষের কাছে দুঃখজনক খবরটা শোনানো হলো?

কর্নেল হাউস ছিলেন দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে এক অভিজ্ঞ মানুষ। মানবিক সম্পর্কের কঠিন রীতি-নীতিগুলো তিনি ভালো ভাবে রপ্ত করেছিলেন। তিনি সমাজেই যে কোনো মানুষকে পরিবর্তিত করতে পারতেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের একটা আশ্চর্য গুণ।

উইড্রো উইলসন সব সময় এই নীতি মেনে চলেছিলেন। তিনি সকলকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিতেন। একবার উইলিয়াম গিবন ম্যাকাডোকে তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্য করে নিয়েছিলেন। এমন ভাবেই এই কাজটা করেছিলেন, যাতে ম্যাকাডো মনে করেছিলেন যে তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হলো।

ম্যাকাডো বলেন—উইলসন বললেন, আমি যদি তাঁর মন্ত্রীসভায় অর্থদপ্তরের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করি, তাহলে তিনি খুবই খুশী হবেন। যে কোনো বিষয়কে চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করার এক সহজাত দক্ষতা ছিল উইড্রো উইলসনের। তিনি এক-একটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত করতেন, মনে হতো এর মধ্যে বোধহয় কোনো কৌশল লুকিয়ে আছে।

উইলসন কিন্তু সবসময় এই কৌশল কাজে লাগাননি। যদি লাগাতে পারতেন তাহলে নতুন ভাবে আমেরিকার ইতিহাস লেখা হতো। যেমন, উইলসন আমেরিকাকে লীগ অব নেশন-এ নেবার ব্যাপারে সেনেট অথবা রিপাবলিকান দলকে সুখী করতে পারেননি।

উইলসন ইলি রুপ বা হিউজেস বা হেনরি ক্যাবট লজকে বা অন্য কোনো রিপাবলিক নেতাকে তাঁর শান্তির সভায় নিয়ে যাননি। এর বদলে তিনি তাঁর দলের অখ্যাত লোকজনকেই সঙ্গী করেছিলেন।

তিনি রিপাবলিকান সদস্যদের উপযুক্ত গুরুত্ব দিতেন না। তৈরির কাজে তারাও যে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, উইলসন এটাও মনে করতেন না। এইভাবে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল পদক্ষেপ তাঁর জনপ্রিয়তার পারদমাত্রাকে নীচে নামিয়ে এনেছিল। তিনি কর্মজীবনের অনেকগুলি প্রহর নষ্ট করেন। স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন। জীবনসীমা কমিয়ে আনেন। আমেরিকাকে লীগের বাইরে থাকতে বাধ্য করেন। বিশ্ব ইতিহাসের ধারাও বদলে দেন।

বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ডবলিউ পেজ সবসময় এই নীতিটি অনুসরণ করতেন। প্রকাশনটি এতো দক্ষ ছিল যে ও' হেনরীর মতো একজন সাহিত্যিক জানিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ঐ প্রকাশন সংস্থা থেকে বই প্রকাশ করা।

কীভাবে ডবলিউ পেজ এই জায়গাতে অবস্থান করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে ঐ সংস্থার প্রধানের বক্তব্য শোনা যাক—আমি একজন লোককে জানি, যিনি বক্তৃতা দানের অনেক আবেদন প্রত্যাখান করতেন। বন্ধুদের কাছ থেকে এই আবেদন আসতো। এমন সব লোকেদের কাছ থেকে অনুরোধ করা হতো, যাদের কাছে ঐ ভদ্রলোক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি এমন কৌশলে প্রত্যাখান করতেন, যে যাকে প্রত্যাখান করা হতো তিনি মোটেই দুঃখ পেতেন না। বরং তিনি আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারতেন।

কীভাবে এই কাজটি করা হতো? ভদ্রলোক আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ জানাতেন। অন্য একজন বক্তার নাম প্রস্তাব করতেন। তিনি কখনো অন্যকে আঘাত করতেন না। আর একজন বক্তাকে তাঁর বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিতেন। এতে চমৎকার কাজ হতো। অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না।

এবার জে. এ. ওয়ান প্রতিষ্ঠানের এক ভদ্রলোকের কথা বলি। এই প্রতিষ্ঠানটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখানকার এক মেকানিকের কাজ ছিল টাইপরাইটার এবং অন্যান্য মেশিনকে সারা বছর কর্মক্ষম রাখা। তাকে সারাদিন বারো ঘন্টা পরিশ্রম করতে হতো। তাঁর একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান জে. এ. ওয়ান তাকে কোনো সহকারী দিলেন না। তবুও তাকে সুখী করা হলো। কীভাবে? মেকানিকের ব্যবহারের জন্যে একটি ব্যক্তিগত অফিস দেওয়া হলো। দরজার ওপর তার নাম লিখে দেওয়া হলো—ম্যানেজার, সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। এখন সে আর সামান্য শ্রমিক নয়। যে কেউ তাকে নাম ধরে ডাকার সাহস করবে না। সে এখন একজন ম্যানেজার। সে শ্রেষ্ঠত্ববোধ অর্জন করলো। তাই নিজে থেকেই কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলো। এখন আর কেউ তাকে হাঁড়িমুখো হ্যাংলা বলতে পারবে না।

আপনি হয়তো ভাববেন, এটা একটা ছেলেমানুষী খেয়াল। কিন্তু নেপোলিয়ানও একথা বলেছিলেন। তিনি লিজিয়ান অব অনার নামে একটি সম্মাননার পুরস্কার সৃষ্টি করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর ১৫০০ জনকে পদক দিয়েছিলেন। ১৮ জন সেনাপতিকে ফ্রান্সের বীর আখ্যা দিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীকে গ্রাণ্ড আর্মি নামে ঘোষণা করেছিলেন। তাই দেখা গেল

নেপোলিয়ান একটির পর একটি যুদ্ধে জয়লাভ করছেন।

নেপোলিয়ান যে কৌশল নিয়েছিলেন, সেটি আপনি আমিও কাজে লাগাতে পারি। আমার এক বান্ধবী মিসেস জেন্টের কথা বলি। তিনি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। পাড়ার ছেলেরা দৌড়োদৌড়ি করে তাঁর বাড়ীর বাগান নষ্ট করেছিল। তিনি বারবার সমালোচনা করেছিলেন। বকাঝকা করেছিলেন। তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারপর তিনি কী করলেন? তিনি ঐ দুই ছেলেদের মধ্যে একজনকে একটি পদবী দিলেন। তাকে গোয়েন্দা হিসাবে কাজে লাগালেন। এতেই সমস্যার সমাধান হলো। ঐ গোয়েন্দা বাগানে আগুন জ্বালিয়ে একটা লোহার শিক গরম করলো। সেই শিক দিয়ে সামনে পেছনে ঘুরিয়ে সে বাকি ছেলেদের ভয় দেখালো। বললো, বাগানে যে পা দেবে, তার পায়ে গরম শিক ছ্যাঁকা দেওয়া হবে।

এটিই হলো মানুষের আসল চরিত্র।

অপরকে অসন্তুষ্ট না করে যদি কাজ হাসিল করতে চান, তাহলে খুশী মনে তার সাথে ব্যবহার করবেন। তার প্রাপ্য সম্মান তার হাতে তুলে দেবেন।

অপরের অসন্তোষ না জাগিয়ে তাকে পরিবর্তিত করতে হলে নিম্নলিখিত ন'টি উপায় পালন করতে হবে।

১. প্রশংসা আর আন্তরিক তারিফ করে কাজ শুরু করুন।
২. অপরের ভুল ঘুরিয়ে দেখান।
৩. অন্যকে সমালোচনা করার আগে নিজের ভুলের কথা অকপটে স্বীকার করুন।
৪. সরাসরি আদেশ না করে প্রশ্ন করুন।
৫. অপরকে মুখ রক্ষা করতে দিন।
৬. সামান্য উন্নতিতে প্রশংসা করুন। আন্তরিকভাবেই এটা করবেন।
৭. অন্যকে প্রশংসা করলে সে ভালো হবার চেষ্টা করবে।
৮. প্রশংসা করুন। ত্রুটি সংশোধন যে কঠিন নয় তো বুঝিয়ে বলুন।
৯. অপরকে খুশী মনে নিজের কাজ করতে দিন এবং তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দিন।

একত্রিশ

চিঠির রহস্য

আপনি এখন কী ভাবছেন? চিঠির আবার কোনো রহস্য আছে কি? মানুষ কেন চিঠি লেখে? দূরাগত বন্ধুকে সব খবর জানাবার জন্যে? প্রেমিকাকে আবেগ আর অভিমানের খবর পৌঁছনোর জন্যে?

তা তো নয়। অনেক কারণেই মানুষ চিঠি লেখে। এখন দেখা যাক, কীভাবে চিঠির মধ্যে যাদু জাগানো যেতে পারে।

আসল সত্যি হলো, চিঠি লেখার মধ্যে একটা কায়দা আছে। আমি যে সমস্ত চিঠি ছেপেছি এই বইটির মধ্যে সেগুলি পড়লেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন।

আমি আমেরিকার একজন বিক্রয় প্রতিনিধি কেন আর ডাইকের কথা বলি। তিনি বর্তমানে কলগেট-পামোলিভ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার।

অ্যাসোসিয়েসন অফ ন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজারের ডাইরেকটার বোর্ডের সভাপতি। মি. ডাইক বলেন, ডিলারদের কাছ থেকে খবরাখবর চেয়ে তিনি প্রায় চিঠি লেখেন। তার শতকরা ৫—৮ ভাগের বেশী জবাব পান না। আর আমায় একবার তিনি বলেছিলেন, শতকরা

১৫ ভাগ জবাব পেলেই তিনি যথেষ্ট বলে মনে করবেন। যদি ১০০টি চিঠির মধ্যে ২০টির উত্তর আসে, তাহলে আনন্দের আতিশয্যে সারারাত জেগে কাটাবেন।

মি. ডাইকের একটি চিঠির জবাব এলো সাড়ে ৪২ ভাগ। এটা কীভাবে হলো?

আসুন আমরা ডাইকের সাথে কথা বলি।

ডাইক বললেন—আমি, মি. কার্নেগীর সঠিক কথা বলা আর মানবিক সম্পর্ক নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম। আমি দেখলাম, এতোদিন আমি যে পন্থায় চিঠি লিখতাম, সেভাবে কারোর হৃদয়ে আঘাত করা যায় না। এবার নতুন করে চিঠি লিখতে হবে।

এখানে একটা চিঠি তুলে দেওয়া হলো।

মি. জন ব্লাঙ্ক,

ব্লাঙ্ক ফিল্ড অ্যারিজোনা

প্রিয় মি. ব্লাঙ্ক,

ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা আপনাকে জানাচ্ছি বলে আন্তরিক দুঃখিত।

এই ভাবে কোনো চিঠি শুরু হলে তার ফল কী হবে? যাঁকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখা হচ্ছে তিনি যদি কঠিন হৃদয়ের মানুষও হয়ে থাকেন তবুও গলে যাবেন। তাই নয় কি?

আর একটা উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক—আমি এবং হোমার একবার ফ্রান্সের ভেতর মোটর গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তখন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। গাড়িটা ছিল পুরোনো মডেলের ফোর্ড। আমরা একদল কৃষককে প্রশ্ন করলাম—কাছাকাছি বড়ো শহর কোনটা বলবে কি?

প্রশ্নের ফল হলো বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো। গ্রাম্য কৃষকেরা এই জাতীয় গাড়ী খুব কমই দেখেছে। আমেরিকানরা যখন ফ্রান্সে গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁরা নিশ্চয়ই কোটিপতি। হয়তো হেনরি ফোর্ডের দূর সম্পর্কের নাতজামাই হবে। তারা বোধহয় এইরকম ভাবছিল।

আমরা যখন কাছের শহরে যাবার রাস্তা জানতে চাইলাম, তখন তাদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। তারা একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো। প্রত্যেকেই নিজেকে সর্বোত্তমভাবে জাহির করার চেষ্টা করলো।

তাহলে? অচেনা জায়গাতে এই কাজটা আপনিও করতে পারেন। আপনাকে এইভাবে বলতে হবে—দয়া করে আমাকে অমুক শহরে যাওয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দেবেন কি? জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ, তবুও আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন একজন শত্রুকে এভাবেই তাঁর বন্ধু করে তুলেছিলেন। তখন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন মাঝবয়সী এক যুবক। তিনি একটি ছোটো ছাপাখানা খুলেছিলেন। তারপর ফিলাডেলফিয়ার জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে কেরানী নির্বাচিত হন। এটা পাওয়ায় তিনি সরকারী ছাপার কাজ করতে পারতেন। তাতে ভালোই লাভ হতো। কিন্তু একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। অ্যাসেমব্লির এক ধনী মানুষ ফ্রাঙ্কলিনকে অপছন্দ করতেন। সবার সামনে তাঁর নিন্দা করতেন।

ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক। ফ্রাঙ্কলিন ভাবলেন, কীভাবে শত্রুকে বশ করা যায়।

অনেকগুলি সমস্যার সৃষ্টি হলো। ভাবতে ভাবতে ফ্রাঙ্কলিন একটি পন্থা বের করলেন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি কিছুতেই শত্রুতার ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি শত্রুর কাছে কিছু সুবিধা প্রার্থনা করলেন।

ফ্রাঙ্কলিন কিন্তু দশ ডলার ধার চাননি। তিনি এমন কিছু চাইলেন, যাতে লোকটি খুশী হতে পারেন। তিনি চাইলেন, এমন মানবিক বোধ যাতে শত্রুর সম্মানবোধ জেগে উঠলো।

তার আত্মঅহমিকা আকাশচুম্বী হয়ে গেল। ফ্রাঙ্কলিন তার মনে শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করলেন।

বাকিটুকু আমরা ফ্রাঙ্কলিনের জবানবন্দীতেই শুনতে পারি।

যখন শুনতে পেলাম ভদ্রলোকের বাড়িতে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের একটি গ্রন্থাগার আছে—তখন তাঁকে অনুরোধ করে আমি একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখলাম। আমি কয়েকটি বই কয়েকদিনের জন্য ধার চেয়েছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই বইগুলি পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেই বইগুলি কয়েকদিন বাদে ফেরত দিলাম। সঙ্গে একটি চিরকুটে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এরপর যখন আমাদের দেখা হলো, তিনি ভদ্রভাবে আমার সাথে কথা বললেন। আগে কিন্তু কখনোই এমন ব্যবহার করেননি। ভবিষ্যতে আবার বই দিয়ে সাহায্য করবেন বলে জানালেন। এরপর আমরা বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সখ্যতার সম্পর্ক বজায় ছিল।

দেড়শো বছর আগে বেন ফ্রাঙ্কলিন মারা গেছেন। কিন্তু তিনি যে মনোতত্ত্ব কাজে লাগিয়ে ছিলেন, আমরা এখনো তা ব্যবহার করতে পারি। সেটি হলো, অপরকে কোন কিছু সাহায্য করতে বলার অনুরোধ।

এবার আমার এক ছাত্রের কথা বলি। তার নাম অ্যালবার্ট বি. অ্যামসেল। সে কয়েকবছর ধরে জলের পাইপ এবং ঘর গরম রাখার যন্ত্র বিক্রি করতো। ব্রুকলীনের একটি মানুষকে কিছুতেই সে যন্ত্র বিক্রি করতে পারেনি। ভদ্রলোকের অফিসে গেলে তিনি ডেস্কের পেছনে বসে চুরুট খেতে খেতে অ্যামসেলকে বলতেন—আমার ওসব কিছুই দরকার নেই। দয়া করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আপনি এখন বাইরে চলে গেলে আমি খুশী হবো।

অ্যামসেল এবার নতুন কৌশল ধরলো। তারপর সব বদলে গেল। তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেল। অ্যামসেল ভালো অর্ডার পেলো।

এটা কী করে সম্ভব হলো? আসুন সেই রহস্যটা খুলে বলা যাক।

অ্যামসেলের প্রতিষ্ঠান লঙ আইল্যান্ডের কুইন্স ভিলেজে একটি নতুন শাখা খুলবে বলে স্থির করেছিল। এই এলাকাটা সম্পর্কে ভদ্রলোকের ভালো জ্ঞান ছিল। অ্যামসেল একদিন তাঁর অফিসে গিয়ে বলল, মিস্টার, আমি আপনাকে কিছু বিক্রি করতে আসিনি। আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম। আপনি কি কয়েক মুহূর্ত সময় দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে বললেন—কী অনুরোধ? তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো?

আমাদের প্রতিষ্ঠান লঙ আইল্যান্ডে একটা শাখা খুলবে বলে মনস্থির করেছে। ঐ এলাকাটা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান দারুন। আপনার কাছে জানতে এসেছি, আমরা কি ওখানে শাখা খুলবো?

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। জ্বলন্ত চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখলেন। অবাক চোখে অ্যামসেলকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর কাছে এমন সাহায্য চাইতে এর আগে কেউ কখনো আসেনি।

ভদ্রলোক বসুন বলে সামনে চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তারপর লঙ আইল্যান্ডে দোকান খোলা উচিত কিনা, তা নিয়ে দীর্ঘ এক ঘন্টা বক্তৃতা দিলেন। তিনি জায়গাটার খবর দিলেন। কোথায় কার কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তাও গুছিয়ে বললেন। একটি বিরাট কোম্পানী যে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছে, এ ঘটনাটাই ভোজবাজির কাজ করেছিল।

তিনি অ্যামসেলের বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন।

অ্যামনেল কলল—এরপর সন্ধ্যেবেলায় যখন ফিরে এলাম, তখন অনেক টাকার অর্ডার পকেটস্থ করতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, ওনার মতো এক ভদ্রলোককে বন্ধু হিসাবে পেয়েছি। এখন আমি ওনার সাথে গলফ খেলি।

মনে রাখবেন, আমরা সকলেই প্রশংসা আর সুনাম চাই। এটা পাবার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারি।

বত্রিশ

দাম্পত্য জীবনে সুখ অন্বেষণের সাতটি পথ

পঁচাত্তর বছর আগের কথা। তখন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ান। তিনি সম্পর্কে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ভাইপো। তিনি মেরী ইউজিসের প্রেমে পড়লেন। মেরী ছিলেন বিশ্বের অন্যতমা সেরা সুন্দরী। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান তাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

নেপোলিয়ানের পরামর্শদাতারা তাঁকে জানিয়েছিলেন মহিলাটি এক অনামী স্পেনীয় কাউন্টের মেয়ে। তাঁর কোনো বংশমর্যাদা নেই।

নেপোলিয়ান জবাব দিয়েছিলেন—তাতে কী হয়েছে? ওর সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওর যৌবন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

রাজকীয় আসন থেকে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন—আমি এমন একজন রমণীকে বেছে নিয়েছি, যাকে আমি ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি।

নেপোলিয়ান আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক। ছিল স্বাস্থ্য, সম্পদ, ক্ষমতা খ্যাতি, সৌন্দর্য, ভালোবাসা এবং প্রেম।

কিন্তু হায়, সবকিছু একদিন নিভে গেল। পড়ে রইলো একমুঠো ছাই। নেপোলিয়ান ইউজিসকে সম্রাজ্ঞী করেছিলেন। কিন্তু প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেননি।

ভদ্রমহিলা ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হয়ে ওঠেন। সন্দেহের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠেন। নেপোলিয়ানের কোনো কথা তিনি শোনেননি। নেপোলিয়ানকে এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দেননি। এমন কি শাসনকাজ পরিচালনা করার সময় রাজসভায় ঢুকে পড়তেন। সব সময় তাঁর সাথে ঝগড়াঝাঁটি করতেন। ভদ্রমহিলা ভাবতেন, নেপোলিয়ান বোধহয় কোনো নরনারীর সাথে প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন।

ইউজিস তাঁর বোনের কাছে স্বামীর নামে অভিযোগ করতেন। কান্নাকাটি করতেন। ভয় দেখাতেন। পাঠাগারে ঢুকে স্বামীকে গালাগাল দিতেন।

এসব করে ইউজিসের কী লাভ হয়েছিল?

এই লাভের কথা জানতে গেলে আমরা নেপোলিয়ান ইউজিস নামে বইটিতে চোখ রাখবো। এটি লিখেছেন ই. এ. রাইনহার্ট।

শেষ পর্যন্ত এমন হলো, নেপোলিয়ান প্রায় রাত্রিবেলায় নিজের চোখ টুপীতে ঢেকে পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে প্রাসাদ ছেড়ে অন্য এক সুন্দরী মহিলার কাছে যেতেন। মহিলাটি তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। সারারাত নেপোলিয়ান পাথরের রাস্তায় একা একা হেঁটে বেড়াতেন। রূপকথাতেই এমন ঘটনা ঘটে। সম্রাট খালি ভাবতেন, হায়, আমার জীবন কেন দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

ইউজিসের জীবনেও একই ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু, সুখ-শান্তি পাননি। প্রাচীনকালের জনের মতো তাই সবসময় তাঁকে বিলাপ করতে হতো। হায় ঈশ্বর, যা ভয় করেছিলাম, আমার জীবনে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো।

নরকের শয়তান প্রেম, ভালোবাসা ধ্বংস করার জন্য যত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, সব সময় বকরবকর করা এবং কান্নাকাটি করা হলো তারই অন্যতম। এই দুটি আবেগ ভালোবাসাকে নষ্ট করে দেয়। গোখরো সাপের বিষের মতো জীবনটাকে নীল করে দেয়।

কাউন্ট লিও তলস্তয়-এর স্ত্রীও সেটি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তখন বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে তিনি মেয়েদের কাছে স্বীকার করেছেন—তোর বাবার মৃত্যুর জন্যে আমি অনেকাংশে দায়ী। মেয়েরা তখন অবশ্যই কথার জবাব দিতে পারেনি। মৃত্যু পথযাত্রিনী মায়ের শোকে তারা অভিভূতা হয়ে গিয়েছিল। তারা জানতো, মা ঠিক কথাই বলেছেন। সারা জীবন ধরে ঐ ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে দোষারোপ করেছেন। সমালোচনা করেছেন।

অথচ, কাউন্ট লিও তলস্তয় আর তাঁর স্ত্রী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সুখী হতে পারতেন। তলস্তয় ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক। তাঁর ওয়ার অ্যান্ড পিস এবং আনা কারনিনা চিরকালই বিশ্বের সাহিত্য আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে বিরাজ করবে।

তলস্তয় এতো বিখ্যাত ছিলেন যে শুরুকেরা তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন। তিনি যা বলতেন তাঁরা শর্টহ্যান্ডে তাই লিখে রাখতেন। তিনি যদি বলতেন—মনে হচ্ছে এবার শুতে যাবো, তাহলে এই অলিখিতকর শব্দগুলিও শর্টহ্যান্ডে লিখে রাখা হতো। যখন রুশ সরকার তাঁর বইগুলি প্রকাশিত করলো, দেখা গেল দশটি সঙ্কলনেও তাঁর রচনাবলী ধরানো সম্ভব হচ্ছে না।

আর কী ছিল তলস্তয়ের? ছিল অফুরন্ত সম্পদ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ছেলেমেয়ে। কোনো বিবাহই শেষ পর্যন্ত এতো সুখের হয় না। কিন্তু স্ত্রীর মনে শান্তি ছিল না। স্ত্রী সবসময় অতিরিক্ত কোনো কিছু পাবার লোভে চিৎকার করতেন।

মাঝে মধ্যে এমন আচরণ করতেন তলস্তয়ের চরিত্রে তার ছাপ পড়ে গেল। তলস্তয় ধীরে ধীরে বদলে গেলেন। তিনি শান্তি প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। যুদ্ধ এবং দারিদ্রতা বন্ধ করার জন্য একটি দল গঠন করলেন।

যে মানুষ যৌবনে একবার স্বীকার করেন সমস্ত রকম অপরাধ তিনি করেছেন, তিনিই আবার যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন। সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিলেন। মঠে কাজ করতেন। খড় কাটতেন। নিজের জুতো নিজেই বানাতেন। নিজেই নিজের ঘর ঝাঁট দিতেন। কাঠের পাত্রে খেতেন। শত্রুদের ভালো করার চেষ্টা করতেন।

লিও তলস্তয়ের জীবন যে বিয়োগান্ত অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল তার অন্তরালে ঐ মুখরা স্ত্রীটিকে দায়ী করা যেতে পারে। তাঁর স্ত্রী সামাজিক বিলাসিতা পছন্দ করতেন। অথচ লিও সেটাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর স্ত্রী চাইতেন, সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যেতে। লিও এই ব্যাপারটিকেও অন্তর থেকে অশ্রদ্ধা করতেন।

তাহলে? শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো? শ্রীমতী তলস্তয় পাগলিনীর মতো হয়ে গেলেন। একবার কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন।

তলস্তয়ের ঘটনাকে আমি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি বারবার বলছি, তাদের জীবনে সহস্র সুখের উপকরণ ছিল। কিন্তু আটচল্লিশ বছর পর এই সম্পর্কটা একেবারে বিষিয়ে গেল।

বিয়ের পঞ্চাশ বছর বাদে অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যে হারানো দিনগুলি মেঘ মেদুরতায় ভর করে ফিরে এসেছিল। একদিন ঐ ভগ্ন হৃদয়া বৃদ্ধা তলস্তয়ের সামনে হাঁটু গেড়ে

বসেছিলেন। তিনি কাতর হয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। তলস্তয় তাঁকে উদ্দেশ্য করে ডাইরীর পাতায় পাতায় যে সব উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রতিবেদন রচনা করেছেন, সেগুলি পড়ে শোনাতো।

তলস্তয় পড়তে শুরু করলেন। হারানো দিনগুলোর স্মৃতি ফিরে এলো। দু'জনের চোখে জল এসেছে।

শেষ পর্যন্ত তলস্তয় আর গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না। আশি বছরে পা দিয়ে তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ১৯১০ সাল। অক্টোবরের এক শীতার্ত রাত। কোথায় গেলেন, কাউকে জানালেন না।

এগারো দিন বাদে একটি রেল স্টেশনে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর মৃত্যুকালীন অনুরোধ ছিল ঐ মুখরা স্ত্রীটিকে যেন মৃতদেহ স্পর্শ করতে না দেওয়া হয়।

তাহলে কী হলো? শেষ পর্যন্ত কাউন্টেস তলস্তয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তখন অবশ্য অনেকটা দেরী হয়ে গেছে।

আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনের সবথেকে দুঃখময় ঘটনা কোনটি? আপনারা বলবেন, যখন তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু আমি যদি বলি, না, তা নয়। তাঁর বিয়ে, তাহলে কী চমকে যাবেন?

বুথ যখন গুলি করেন, লিঙ্কন বুঝতেই পারেননি, তাঁকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু তেইশ বছর ধরে তিনি বিবাহিত জীবনের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ ধরে মিসেস লিঙ্কন তাঁর জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিলেন।

তিনি সব সময় অভিযোগ করতেন। স্বামীকে সমালোচনা করতেন। তাঁর মতে, লিঙ্কনের কোনো কিছুই ঠিক ছিল না। তিনি অদ্ভুতভাবে হাঁটেন। হাঁটবার সময় ডান পা টা বেশি তোলেন। অনেকটা অসভ্য বন্য রেড ইন্ডিয়ানদের মতো। তিনি আরো অভিযোগ করতেন, লিঙ্কনের চলাফেরার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই। যেহেতু তিনি মাদাম মেন্টেলের স্কুলে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাই লিঙ্কনের সব কিছু তাঁর খারাপ লাগতো।

কাউন্টেস তলস্তয় স্বামীর বড়ো বড়ো কান পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে তলস্তয়ের নাকটা ছিল বড্ড খাড়া। ঠোঁট দুটো মোটা এবং উঁচু। তাঁকে দেখতে যক্ষ্মা রোগীর মতো লাগে। তাঁর হাত-পা বড্ড বড়ো বড়ো। মাথাটা আকারে ছোটো।

আব্রাহাম লিঙ্কন আর মেরী লিঙ্কনও সবদিক থেকে একেবারে আলাদা ছিলেন। শিক্ষাদীক্ষা, পরম্পরা, অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী, সব কিছুতেই।

সেনেটার অ্যালবার্ট জে বেভারিজ লিঙ্কন সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞ। তিনি লিখেছেন, মিসেস লিঙ্কনের গলার স্বর ছিল কর্কশ। বহু দূর থেকে তা শ্রুতিগোচর হতো। মনে হতো, একটা একটা ফাটা কাঁসি যেন বেজে চলেছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মিস্টার এবং মিসেস লিঙ্কন তাঁদের বিয়ের পর মিসেস জ্যাকব নামে এক মহিলার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিলেন।

একদিন সকালে শ্রী ও শ্রীমতী লিঙ্কন প্রাতঃরাশে বসে আছেন। কোনো কারণে লিঙ্কনের কথায় তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি স্বামীর মুখে গরম কফির কাপ ছুঁড়ে মারলেন। এটি তিনি করলেন সকলের চোখের সামনে।

লিঙ্কন লজ্জিত হয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন। গৃহকর্ত্রী একটি তোয়ালে এনে তাঁর মুখ আর পোশাক মুছিয়ে দিয়েছিলেন।

মিসেস লিঙ্কনের ঈর্ষা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তিনি আবার ছুটে এলেন। গৃহকর্ত্রীর সামনে শ্রীযুক্ত লিঙ্কনকে গালাগাল দিলেন।

শেষ অব্দি অবশ্য তিনি প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিলেন।

তাহলে? লিঙ্কনের জীবনকে কি এই ঘটনাগুলি প্রভাবিত করেছিল? কিছুটা তো বটেই। স্ত্রীর প্রতি তাঁর আচরণ পাল্টে গিয়েছিল। স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁর মোহ কেটে যায়। স্ত্রীকে তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন।

লিঙ্কন স্প্রিংফিল্ডে থাকতে চাইতেন না। বাড়ি যেতে তাঁর ভয় হতো। শীত আর বসন্তকালের তিনটি করে মাস তিনি অন্যত্র থাকতেন।

মিসেস লিঙ্কন, সম্রাজ্ঞী ইউজিন, আর কাউন্টেস তলস্তয়—সেই তিন ভদ্রমহিলার মধ্যে কোথায় মিল আছে? তাঁরা নিজেরাই তাঁদের জীবন বিষাদময় করে তুলেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সবথেকে কাছের মানুষটিকে দূরে সরিয়ে দেন।

এবার আমি বেমি হ্যানবার্জের কথা বলি। তিনি নিউইয়র্কের আদালতে পরিবারিক সম্পর্কিত মামলার প্রধান।

তিনি বলেছেন—অনেক স্ত্রী সবসময় ঘ্যানর ঘ্যানর করে বিবাহিত জীবনের সমাধি খুঁড়ে চলেছেন।

তাহলে, দাম্পত্য জীবনে সুখের অন্বেষণ করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখবেন—অযথা ত্রুটি ধরবেন না। এতে আপনি বা আপনার সঙ্গীর, কারোরই কোনো লাভ হবে না।

তেত্রিশ

নিজে ভালোবাসুন এবং অপরকে ভালোবাসতে শেখান

ডিজরেলি একবার বলেন—জীবনে আমি প্রচুর ভুল করতে পারি। তবে কখনো ভালোবাসার জন্যে বিয়ে করবো না।

ডিজরেলির এই কথা ঠিক। তা তিনি করেননি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত একা একাই দিন কাটিয়েছেন। তারপর, তাঁর থেকে পনেরো বছরের বড়ো এক বিধবাকে বিয়ে করেন। সেই বিধবার সমস্ত চুল ছিল সাদা। তিনি অনেকগুলি বসন্ত পার হয়েছেন। প্রেম, তা নয়, ভদ্রমহিলা পরিষ্কার জানিয়েছেন, ডিজরেলি তাঁকে ভালোবাসেন না। তিনি আরো জানিয়েছেন, এতো বছর ধরে ডিজরেলি তাঁর সাথে মেলামেশা করেছেন। তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন। তারপর, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

ব্যাপারটা খুবই হৃদয়হীন বলে মনে হচ্ছে কি? তা সত্ত্বেও একটা কথা শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। ডিজরেলির বিবাহিত জীবন ছিল অনন্ত ঐশ্বর্যে ভরা। কখনো তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি হয়নি।

তবে, ঐ ধনী বিধবা কিন্তু তরুণী, সুন্দরী বা দারুণ আকর্ষক ছিলেন না। মাঝে মধ্যেই তিনি এমন সব কথা বলতেন, হাসির উদ্রেক হতো সকলের মনে। গ্রীক অথবা রোমান, কারা পৃথিবীর বুকে আগে এসেছিল—সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধ্যান-ধারণা ছিল না। পোশাক সম্পর্কে তাঁর রুচি ছিল অত্যন্ত জঘন্য। বাড়িঘর সব সময় অপরিষ্কার করে রাখতেন। তবুও একটা বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই গুণী। পুরুষকে কীভাবে নাড়াচাড়া করতে হয়, সেই মন্ত্র যত্নে শিখেছিলেন। বিয়ের ব্যাপারেও তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

তিনি কখনোই তাঁর নির্বুদ্ধিতাকে ডিজরেলির ওপর চাপাতে চাননি। ডিজরেলি যখন চালাক চতুর ডাচেসদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন, তখন তিনি

স্ত্রীর সান্নিধ্যে আনন্দ লাভ করতেন। বাড়ির আবহাওয়া আরো বেশি তাকে সুখী করে তুলতো। স্ত্রীর আপ্যায়ন তাঁর সমস্ত শরীরকে প্রশান্ত করে তুলতো। বাড়িতে যতক্ষণ তিনি বয়স্কা ঐ স্ত্রীর কাছে সময় কাটাতেন, সেইটুকুকেই মনে হতো যেন স্বর্গসুখ।

তাঁর স্ত্রী সর্বার্থে ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী বিশ্বাসের পাত্রী এবং পরামর্শদাত্রী।

প্রতিদিন রাতে ডিজরেলি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতেন। সারাদিন কমন সভায় কী হয়েছে, খুঁটিনাটি সব গল্প বলতেন।

মেরী অ্যান কখনোই বিশ্বাস করতেন না, তাঁর স্বামী কখনো কোথাও কোনো ভুল পদক্ষেপ ফেলতে পারেন।

তিরিশ বছর ধরে মেরী অ্যান বেঁচে ছিলেন শুধু মাত্র ডিজরেলির জন্য। তাঁর অর্থ সম্পদ তাঁর কাছে দামি ছিল। কিন্তু তা ছিল শুধু স্বামীর জন্যে। তিনি ছিলেন সব অর্থে ডিজরেলির নায়িকা। মেরী মারা যাওয়ার পর ডিজরেলি আর্ল উপাধি পান। তিনি বলেছিলেন, আমার দুর্ভাগ্য ও আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এখন আমার পাশে নেই।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা দরকার, যখন ডিজরেলি একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন, তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন, মেরী অ্যানকে যেন একটি উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৬৮ সালে মেরীকে হাই কাউন্টেস বিকনসফিল্ড উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

সকলে মেরীকে বুদ্ধিহীনা বলতো। ডিজরেলি কিন্তু কখনো সর্বসমক্ষে তাঁকে হেয় করেননি। কখনো তাঁর সমালোচনা করেননি। মাঝে মধ্যে তিনি স্ত্রীর সাথে খুনসুটিতে মেতে উঠতেন। স্ত্রীর প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন বিশ্বস্ততা।

মেরী অ্যান ত্রুটিহীনা ছিলেন না। তিনটি দশক ধরে স্বামীর বিষয়ে কথা বলে কখনো ক্লান্ত হননি। সব সময় স্বামীর প্রশংসা করতেন। এর ফল কী হয়েছিল?

ডিজরেলি বলেছেন—তিরিশ বছর ধরে আমরা বিবাহিত জীবনযাপন করছি। অথচ, কখনো মনে হয়নি যে আমি একক অথবা নিঃসঙ্গ।

ডিজরেলি কখনো নিজের জীবনের কোনো কথা গোপন করেননি। তিনি বারবার বলেছেন, মেরী অ্যান আমার জীবনের অনেকখানি।

এর ফলে কী হতো? মেরী অ্যান তাঁর বান্ধবীদের বলতেন—আমার জীবনে শুধু আনন্দ আছে।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা ঠাট্টা চালু রেখেছিলেন। ডিজরেলি বলতেন—তোমার টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছি।

মেরী অ্যান হেসে বলতেন—তবে যদি আবার আমরা বিয়ে করি, তাহলে তুমি এই কথাটা প্রত্যাহার করে নেবে। তুমি বলবে, প্রিয়তমা মেরী, তোমার ভালোবাসার টানেই তোমাকে আর একবার বিয়ে করলাম।

ডিজরেলি হেসে উঠতেন। সত্যিই তো, ভালোবাসার টান ছাড়া এতো বছর পাশাপাশি থাকা যেতে পারে কী?

মেরী অ্যান আর ডিজরেলি, আমাদের কাছে আদর্শ দম্পতি।

হেনরী জেমস বলেছেন—ভালোবাসতে হবে এবং ভালোবাসতে শেখাতে হবে।

সেল্যাড ফস্টার উড তাঁর গ্রোয়িং টুগেদার ইন দা ফ্যামিলি বইতে বলেছেন—বিয়ের সাফল্য নির্ভর করে সঠিক সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে খুঁজে বের করার মধ্যে। অবশ্য তার জন্যে নিজেকে সঠিক হতে হবে।

তাহলে, দাম্পত্য জীবনে সুখের দ্বিতীয় সরণীটি হলো—সঙ্গী এবং সঙ্গিনীকে সত্যিকারের ভালোবাসার চেষ্টা করুন।

চৌত্রিশ

কখনো অকারণে কাউকে সমালোচনা করবেন না

জনজীবনে ডিজরেলির সবথেকে বড়ো প্রতিস্পর্ধী ছিলেন গ্ল্যাডস্টোন। সাম্রাজ্যের যে কোনো তর্কের বিষয়ে তাঁরা দু'জনে লড়াই করতেন। অথচ দু'জনের মধ্যে একটি মিল ছিল। তা হলো ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা দু'জনেই ছিলেন সুখী এবং সমৃদ্ধ।

উইলিয়াম এবং ক্যাথারিন গ্ল্যাডস্টোন প্রায় ষাট বছরের উজ্জ্বল বিবাহিত জীবন কাটিয়ে ছিলেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গ্ল্যাডস্টোন কোনোদিন তাঁর স্ত্রীর সামান্যতম সমালোচনা করেননি।

ক্যাথারিন দি গ্রেটও কখনো তাঁর স্বামীকে কারো সামনে ছোটো করেননি।

তাহলে? একটি কথা বারবার আপনাকে মনে রাখতে হবে, তা হলে, আমরা কখনো অকারণে কারোর সমালোচনা করবো না।

আমি রিডারস ডাইজেস্ট থেকে ফাদার ফরগেটস নামক কথিকা তুলে দিচ্ছি।

—ছোট্ট সোনা, আমি তোমাকে যখন বলছি, তুমি ঘুমোচ্ছো। আমি তোমায় বকাবকি করেছি। এখন আমি তোমার ঘরে চুপিচুপি একা এসেছি। তোমার একখানা হাত তোমার গলার তলায়। তোমার সোনালী চুল ঘামে ভিজে কপালের মধ্যে আটকে আছে। আমি দোষীর মতো তোমার কাছে এলাম।

আমি অনেক কথা ভেবেছি আজ সারাদিন ধরে। আমি তোমার প্রতি কত বিরক্ত বোধ করেছি। তুমি স্কুলে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে খুব বকেছিলাম। তুমি খাবারটা ছড়িয়ে ফেলেছিলে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছোনি। তোয়ালেটা মুখে ছুঁইয়েছিলে। তুমি তোমার জুতো পরিষ্কার করোনি।

সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের আসরে তোমাকে বকেছিলাম। তুমি খাবার ছড়িয়ে ফেলেছিলে। না চিবিয়ে কিছুটা গিলে ফেলেছিলে। তোমার চিবুক টেবিলে রেখেছিলে। রুটিতে খুব পুরু করে মাখন মাখিয়েছিলে। যখন তুমি আবার খেলতে যাও, তখন আমি ট্রেন ধরতে ছুটছিলাম। তুমি চেঁচিয়ে বলেছিলে—যাচ্ছি বাবা?

একই ব্যাপার ঘটেছিল বিকেলে। আমি তখন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। দেখছিলাম, তুমি রাস্তার মধ্যে হাঁটু রেখে খেলে চলেছো। তোমার মোজায় অনেক ফুটো।

তোমাকে তোমার বন্ধুদের সামনেই আমি বকেছিলাম। তোমাকে হাত ধরে হনহন করে টেনে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম, মোজার অনেক দাম। যদি তোমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হতো তাহলে এর কদর বুঝতে।

বাবার কাছ থেকে তোমাকে এই ভর্ৎসনা শুনতে হলো। কথাটা মনে রেখো।

পরের কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? আমি লাইব্রেরীতে বসে বসে পড়ছিলাম। তুমি ভয় জড়ানো বিষাদমাখা চোখে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলে। আমি কাগজ নামিয়ে রাখলাম। তুমি কেন এসেছো তা বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু বলতে পারনি। আমি শুধু বলেছিলাম, কী হলো? এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? পড়তে যাও।

তুমি কিছুই বলোনি। তুমি শুধু তোমার দুটি কচি কচি হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে। আমার গালে একটা চুমু খেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলে। তোমার হৃদয়ে ভগবান যে ভালোবাসা দিয়েছেন, এতো আঘাতেও তা শুকিয়ে যায়নি।

ছোট্ট সোনা, একটু পরেই আমার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল। একটা অদ্ভুত ভয়

চারপাশ থেকে আমাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করেছিল। এ আমার কীরকম অভ্যাস? আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধু তোমার দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছি? তোমাকে বকুনি দিচ্ছি। অবশ্য তোমাকে যে আমি ভালোবাসি না, একথা ঠিক নয়। আসলে তোমাকে বোধহয় একটু বেশি ভালোবাসি। তাই তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছি। তোমার কাছ থেকে আমি যা চাইছি, তা বিচার করেছি আমার বয়সের মাপকাঠিতে।

হায়, তোমার চরিত্রে কত ভালত্ব রয়ে গেছে। তোমার ছোট্ট হৃদয়। বিশাল পর্বতশিখরে ছড়িয়ে পড়া ভোরের আলোর মতই বিরাট। তার প্রমাণ, তুমি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেয়েছো। তাইতো আমি অন্ধকারে একা একা তোমার কাছে এসেছি। তোমার ঘুমন্ত শয্যার পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছি। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

এ আমার সামান্য অনুশোচনা মাত্র। তুমি জেগে থাকলে হয়তো এভাবে আমি এসে বসতে পারতাম না। আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমি এক ফোঁটা, একরত্তি এক ছেলে।

কাল থেকে আমি তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। বন্ধুর মতো। তোমার দুঃখের ভাগ আমি নেবো। তোমার আনন্দের অংশীদার হবো। তুমি কখনো রেগে কথা বললে আমি তোমায় শুধরে দেবো। ঠিক মন্ত্রের মতো আমি এই ক'টি শব্দ আওড়াবো—তুমি একটি ছোট্ট শিশু।

তোমাকে আমি কেন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ বলে ভুল করলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি, তুমি এক ছোট্ট শিশু। এখন ক্লান্ত হয়ে বিছানাতে শুয়ে আছো। হায় আর কখনো তোমাকে আমি এতোখানি বকবো না।

এই অধ্যায়ে কোনো উপসংহার নেই। এক ক্লান্ত রিক্ত বাবার অশ্রুমোচনের মধ্যে দিয়েই সেই শাশ্বতবাণী নির্গত হচ্ছে।

পঁয়ত্রিশ

কীভাবে সকলকে সুখী করবেন?

আসুন আমরা পল পোপিনোর কথা বলি।

তিনি হলেন লস এঞ্জেলসের একটি প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার। যে প্রতিষ্ঠান পারিবারিক সম্পর্ককে জোড়া লাগায়।

তিনি বলেছেন—বেশীর ভাগ পুরুষই এমন স্ত্রীর সন্ধান করেন, যিনি সব সময় একজন সঙ্গিনী হবেন। কথাটা একশো শতাংশ ঠিক। মানুষ কী চায়? মানুষ সকলকে সুখী করে জীবন কাটাতে চায়। তাহলে, আমরা কেন সকলকে সুখী করতে পারি না?

পুরুষের কী উচিত? স্ত্রীলোকের সুন্দর পোশাক আর রমণীয় সজ্জাকে তারিফ জানানো। সব পুরুষরাই একথাটা ভুলে যায়। তাদের জানা উচিত মেয়েরা নিজেদের রূপ সম্পর্কে সচেতন হবে। পোশাক সম্পর্কে আরো সাবধানতা অবলম্বন করবে। যেমন ধরুন, পুরুষের সাথে একটি নারীর পথে দেখা হয়ে গেল। তখন নারী কী পুরুষের দিকে তাকায়? কখনো না। বরং পুরুষ স্ত্রীলোকটিকে দেখে, সে কীরকম পোশাক পরেছে তা যাচাই করার চেষ্টা করে।

আমার ঠাকুরমা ক'বছর আগে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটানব্বই বছর। মৃত্যুর কিছু আগে তাঁকে পঁচাত্তর বছর আগে তোলা একটা ফটো দেখিয়েছিলাম। ঠাকুরমার চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে। তিনি কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন—হ্যাঁরে, আমি কী

পোশাক পরেছিলাম রে?

ব্যাপারটা একবার ভাবুন তো? এক বৃদ্ধা তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে এসে গেছেন। প্রায় শতবর্ষে পৌঁছে গেছেন। স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, তবুও জানতে চাইছেন, পঁচাত্তর বছর আগে তিনি কোন পোশাক পরে ছবিটা তুলেছিলেন।

ব্যাপারটা আমার মনের ভেতর গভীর দাগ কেটে গেছে। এই দাগ কোনোদিনই হারাবে না।

যে সমস্ত পুরুষ এই বইটা পড়ছেন, পাঁচ বছর আগে তাঁরা কোন্ পোশাক পরেছিলেন, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন। হয়তো মনে রাখার সামান্যতম ইচ্ছে পর্যন্ত নেই।

কিন্তু মেয়েদের কথা একেবারে আলাদা। ফরাসী ছেলেদের বারবার শেখানো হয় সান্ধ্য আসরে যখন তারা বান্ধবীর সাথে দেখা করবে, তখন প্রথমেই তার পোশাকের প্রশংসা করবে। মনে রাখবেন, পাঁচ কোটি ফরাসী কখনোই এই ব্যাপারে ভুল করে না।

আসুন, একটা গল্প শোনাই। এটা অবশ্য বানানো রূপকথা।

এক চাষীর বউ সারাদিন কাজের পর এক বোঝা খড় এনে জমা করলো। বাড়ীর পুরুষেরা সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তারা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো, সে পাগল হয়ে গেছে কিনা। চাষী বউ তার উত্তরে বললো—তোমরা লক্ষ্য করবে তা ভাবতেই পারিনি। গত বিশ বছর ধরে তোমাদের জন্যে খড় রান্না করছি, তোমরা অম্লান বদনে তারিফ করে খাচ্ছো। অথচ, একবারও জানতে পারলে না, ভাতের বদলে খড় খাচ্ছো।

মস্কো আর সেন্ট পিটার্সবার্গে অভিজাত ব্যক্তিদের মার্জিত ব্যবহার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ার জারেদের আমলে একটা প্রথা ছিল। অভিজাতরা চাইতেন, যে রাঁধুনী রান্নাটা করেছে, সে যেন খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে তাকে ভালোভাবে তারিফ করা যাবে।

এই ব্যাপারটা আমরাও কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করতে পারি না? এই যে সারাদিন আপনার স্ত্রী গরমে ঘেমে নেয়ে আপনার জন্যে স্যুপ তৈরি করে দিচ্ছে, একবারও তাঁর প্রশংসা করেছেন? একবার কি বলেন, আঃ, তুমি না থাকলে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে যেতো।

ডিজরেলি ছিলেন বিশ্বের এক অন্যতম সেরা রাজনীতিক। তিনি সকলের কাছে বারবার বলতেন, আমার স্ত্রীর সান্নিধ্য আমার জীবনটা কত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

এন্ড্রি ক্যার্নেগি বলেছিলেন—আমার জীবনের সবকিছুর জন্যে আমি আমার স্ত্রীর কাছে ঋণী। সে-ই আমাকে সোজা রাস্তায় চলতে সাহায্য করেছে। আমাকে পাঁচটি সন্তানের পিতা করেছে। অতএব, সব প্রশংসাই তার প্রাপ্য।

তাহলে? জীবনকে সুখী করতে হলে আন্তরিক প্রশংসা করুন।

ছত্রিশ

মেয়েরা কী কী ভালোবাসে?

মেয়েরা কী ভালোবাসে? ভালোবাসে ফুল। ভালোবাসে কবিতা। ভালোবাসে গান।

কিন্তু, মরশুমী ফুল আমরা কী আমাদের প্রেমিকা অথবা স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারি না? আমরা কী সামান্য ক'টা পয়সা খরচ করতে পারি না?

আপনি একটা কাজ করবেন। আজ সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফেরার সময় ফুটপাথে

বসে থাকা বিক্রেতার কাছ থেকে একগোছা গোলাপ কিনবেন। পরীক্ষাটা একবার করেই দেখুন না।

জর্জ এনকোবান তখন ব্রডওয়েতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি কিন্তু প্রত্যেকদিন নিয়ম করে মাকে দু'বার ফোন করতেন। মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এটা করে গেছেন। প্রতিবারই কি তিনি আশ্চর্য খবর দিতেন? মোটেই না। ফোন করার অর্থ হলো, মাকে জানানো, মাগো, শত কাজের মধ্যেও আমি তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারিনি।

ছেলের কাছ থেকে এই ফোন পাওয়ার জন্যে মায়ের হৃদয় উদগ্রীব হয়ে থাকতো। মা ভাবতেন, ঠিকই তো, আমার ছেলে মস্ত ব্যস্ত। কিন্তু আমাকে ভোলেনি!

মেয়েরা তার জন্মদিনে কী চায়? স্বামী অথবা প্রেমিকের কাছ থেকে একটুকরো উপহার। এটাই তাদের রহস্য। গড়পড়তা পুরুষ কিন্তু কোনো তারিখ মনে রাখতে পারে না। তারিখটার যে একটা আলাদা মানে আছে, বছরের অন্যান্য দিনগুলি থেকে এটি একদম আলাদা, তা মনে রাখতে হবে বৈকি।

শিকাগোর একজন জজ জোসেফ সারাত। তিনি চল্লিশ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার নিষ্পত্তি করেছিলেন। দু-হাজার স্বামী-স্ত্রীকে আবার মিলিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—বিবাহিত জীবনের যত গণ্ডগোলের মূল লুকিয়ে আছে ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে। স্বামী যখন অফিসের কাজে রওনা হন, তখন স্ত্রী তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান না। যদি স্ত্রীরা এটি করেন, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ডিভোর্সের মামলাকে রুখে দেওয়া সম্ভব।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং আর রবার্ট ব্রাউনিং-এর বিবাহিত জীবন স্বর্গীয় সুখময় ভরা ছিল। রবার্ট ব্রাউনিং কখনোই স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। তাঁর পঙ্গু স্ত্রীকে কখনো তিনি অপমান করতেন না। এলিজাবেথ তাঁর বোনকে লেখেন—আমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝি সত্যি সত্যি রূপকথার এক পরী।

তাহলে? পারিবারিক জীবনে খুশী হতে গেলে কী করতে হবে? জীবনের আপাত অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ বিষয়গুলির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

সাঁইত্রিশ

সুখী হতে গেলে এটাকে কখনো অবহেলা করবেন না

এবার আমরা ওয়াল্টার ড্যামোরসের কথা বলি। তিনি বিয়ে করেছিলেন আফ্রিকার শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী এবং প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেমস জি ব্লেইনের কন্যাকে। বিয়ের পর থেকে তাঁরা আন্ড্রু কার্নেগীর বাড়িতে সুখে জীবন কাটান।

তাঁদের দাম্পত্যের জীবনে সুখের রহস্য কী?

মিসেস ড্যামোরস বলেন—কোনো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সময় দেখতে হবে, সেখানে ভদ্রতার স্থান আছে কিনা। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি ভদ্রতা দেখায়, তাহলে আর কোনো কিছু দরকার লাগে না।

ভালোবাসাকে শেষ করতে কড়া কথা হলো ক্যানসারের মতো। কড়া কথা থেকেই অবিশ্বাস্যের জন্ম হয়।

ডরোথী ডিক্স বলেন—আমরা বাড়ীর লোকেদের সাথেই সবথেকে খারাপ ব্যবহার করি।

হেনরী ক্লেরিমনীর বলেছেন—ভদ্রতা হলো হৃদয়ের একটি গুণ। যেটি ভাতা সদরের বাইরে ফুটে ওঠা মনোলোভা ফুলকে আকর্ষণ করে। অথচ, ঘরের মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপকে

অবহেলা করে।

আমরা এক বিখ্যাত নায়ক অলিভার অরোভেল হোমসের কথা বলি। তিনি কোনো কারণে বিষাদগ্রস্ত বা হতাশায় আচ্ছন্ন হলে, পরিবারের কারোর কাছে তাঁর দুঃখবোধ জ্ঞাপন করতেন না।

এটি তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। সাধারণ মানুষ কী করে থাকেন? অফিসের কাজে গোলমাল হলে স্ত্রীর ওপর সেই ঝাল ঝাড়েন। বস যদি তাঁকে ডেকে গালাগাল দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ছোটো ছেলেকে আচ্ছা করে মেরে মনের উষ্মা প্রকাশ করেন।

এটা কি ঠিক?

হল্যান্ডে নিয়ম আছে বাড়িতে ঢোকার আগে বাইরের সিঁড়িতে জুতো খুলে রাখতে হবে।

ডাচদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এর অর্থ কী? বাইরের সব ঝামেলা বাইরেই থাকবে। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তাদের ঢুকতে দেবো না।

উইলিয়াম জেমস একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত অজ্ঞতা আছে। এই দোষে আমরা সকলেই দুষি।

দেখা যায়, বাইরে আমরা ধীরে ধীরে কথা বলছি। অথচ, স্ত্রীর সঙ্গে যখন কথা বলি, চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করি।

এমন কেন হবে?

যাদের বিবাহিত জীবন সুখে পরিপূর্ণ তারা কিন্তু কখনো এমনটি করেন না। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক বলেছিলেন—আমি আমার সব কৃতিত্ব এবং সব বই অনায়াসে দিয়ে দেবো, যদি কোনো মেয়ে আমাকে সস্নেহে প্রশ্ন করেন—আজ ডিনারে আসতে তোমার এতো দেরী হলো কেন?

তাহলে? বিয়ের মধ্যে আমরা কতটা সুখ সঞ্চয় করতে পারবো? ডরোথী ডিক্স বলেছেন—বিয়েতে পুরুষের সাফল্যের সম্ভাবনা শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। আর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা শতকরা ৩০ ভাগ।

আসুন, আমার শতাংশের হিসেব নিকেশ ভুলে যাই। আমরা ভাবি, একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি হলে তবেই দাম্পত্য জীবন সুখী হয়ে উঠতে পারবে।

বিবাহিত জীবনে সুখী হতে হলে, যা করতে হবে—

১. কখনো বকবক করবেন না।
২. সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে অধিকার করার চেষ্টা করবেন না।
৩. অযথা সমালোচনা করবেন না।
৪. আন্তরিক প্রশংসা করবেন।
৫. আপাত তুচ্ছ বিষয়গুলির প্রতি নজর দেবেন।
৬. সঙ্গিনীর প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন।
৭. বিয়ে সম্পর্কে ভালো ভালো বই পড়বেন।

স্বামীদের জন্যে একগোছা উপদেশ—

১. মাঝে মধ্যে স্ত্রীর জন্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ নিয়ে আসবেন।
২. তার জন্মদিন অথবা বিবাহ বার্ষিকীর তারিখটিকে আলাদা করে মনে রাখবেন। সেদিন বাইরে কোনো কাজ রাখবেন না।
৩. অন্যের সামনে স্ত্রীকে অযথা সমালোচনা করবেন না।
৪. তার হাতে যথেষ্ট টাকাকড়ি তুলে দেবেন। যাতে সে ছোটোখাটো খরচ ইচ্ছে মতো

করতে পারে।

৫. তার মানসিক অবস্থাটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।
৬. অবসর সময়টা সম্পূর্ণ তাকে দেবেন।
৭. তার রান্নার প্রশংসা করবেন।
৮. তার বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করবেন।
৯. ছোটোখাটো ব্যাপারেও তাকে সম্মান জানাবেন।

স্ত্রীদের জন্য—

১. স্বামীকে কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
২. গৃহটিকে সাজিয়ে রাখবেন।
৩. স্বামী যখন অফিসে যাবে অবশ্যই তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবেন।
৪. স্বামীর ব্যবসা বা চাকরীকে সাধ্যমতো সাহায্য করবেন।
৫. অর্থকরী ব্যাপারগুলি সহজভাবে মেনে নেবেন।
৬. স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সাথে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করবেন।
৭. স্বামীর পছন্দমতো পোশাক পরবেন।
৮. সারাদিন বাইরে স্বামী কী করেছেন, তা জানার চেষ্টা করবেন।

Kaukuria ... Library (Sponsored)
P.O. Kaukuria
Dt. Murshidabad
ESTD-1961